ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যক্ষ

আমার সাহিত্য-শিক্ষাগুরু খাঁ বাহাদুর

ডাঃ মাহ্‌মুদ হাসান, ডি-ফিল (অক্সন্)

মহাশয়ের করকমলে —

ভূমিকা

সাহিত্য-সন্দর্শনের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। সহৃদয় সাহিত্যানুরাগী, শিক্ষাব্রতী ও ছাত্রছাত্রীগণ ইহাকে যে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

এই সংস্করণে আমি গ্রন্থখানি বিশেষ সতর্কতার সহিত বহুলাংশে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছি এবং কতকগুলি নূতন বিষয় সংযোজিত করিয়াছি। ইহার সাহায্যে ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্য পঠন-পাঠন ও আলোচনার যথেষ্ট সহায় হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। বাংলা সাহিত্য বলিতে আমরা বিশেষ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর গৌরবময় যুগের সাহিত্যের কথাই স্মরণ করিতেছি। এই সাহিত্য যে সম্পূর্ণভাবে ইংরেজী সাহিত্য প্রভাবিত, এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্য আলোচনায় শুধু সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের প্রবর্ত্তিত রীতিপদ্ধতির কণ্ঠলগ্ন হইয়া থাকিলে চলিবেনা। বাংলা সাহিত্যবিচারের রীতিপদ্ধতি পাশ্চাত্ত্য অলঙ্কারশাস্ত্র হইতেই অনেকটা গ্রহণ করিয়া বাংলা সমালোচনাশাস্ত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে।

স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের দৃষ্টি অনেকখানি নিজের ঘরের দিকে, আত্ম-আবিষ্কারের দিকে পড়িয়াছে। ইহা অত্যন্ত সুখের কথা। কিন্তু সাহিত্যের জগত দেশ বা জাতির ঐতিহ্যানুগ হইলেও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য চিরদিনই দেশ ও কালাতীত। কাজেই আমি সর্ব্বকালের বিদগ্ধজনসম্মত সাহিত্যিক রুচিকেই সম্মুখে রাখিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি। অনেক স্থলে আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-বিচারের মূলতত্ত্বগুলির সমন্বয়সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। বিতর্কমূলক বিষয়ে আমি নিজস্ব মত দিতে গিয়াও যুক্তিবাদের উপর নির্ভর করিয়াছি। শ্রেণীবিভাগ ও উদাহরণ সংগ্রহ ব্যাপারে আমাকে যে সকল গ্রন্থের নাম করিতে হইয়াছে, উহাদের সকলই যে সাহিত্য-বিচারের মাপকাঠিতে উৎকৃষ্ট বা আমার নিজস্ব সাহিত্যিক মতামতের চরম পরিচায়ক, তাহা যেন কেহ মনে না করেন। উৎকৃষ্টতর গ্রন্থ সুলভ নয় বলিয়াই আমাকে এইরূপ করিতে হইয়াছে।

সম্প্রতি বাংলা দেশে বাংলা সাহিত্যের প্রতি সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হইয়াছে। এমতাবস্থায় বাংলা সাহিত্য আরও গভীরভাবে পঠন-পাঠনের ও আলোচনার সৌকর্য্যার্থেই এই গ্রন্থখানা রচিত হইয়াছে। ইহার সাহায্যে যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অনার্স ও এম্-এ, এবং ইংরেজীর এম্-এ ক্লাশের ছাত্রছাত্রীগণ সমালোচনা শাস্ত্রের মূল তত্ত্বগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, সেইদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি।

এই গ্রন্থ রচনায় যাঁহাদের নিকট আমি ঋণী, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্য-সরস্বতী এবং যাঁহাদের পদপ্রান্তে বসিয়া আমি যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষালাভের সুযোগ পাইযাছি, তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি। বাংলা দেশের অসংখ্য সহৃদয় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকের নিকট হইতে আমি মৌখিকভাবে অথবা পত্রযোগে এই গ্রন্থখানির পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ বাহির করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছি। তাঁহাদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাখালবন্ধু নিয়োগী, বি-এস্‌সি প্রুফ দেখা ব্যাপারে এবং বিশেষ করিয়া কয়েকটি ভুল সংশোধনে আমাকে যে অকুণ্ঠ সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

এলিট প্রেসের শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু যত্নের সহিত বইখানি ছাপাইয়াছেন, এইজন্য তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

শ্রীশচন্দ্র দাশ

সূচীপত্র

আর্ট

পরিদৃশ্যমান জগতে আমরা সৌন্দর্য্যের যে চিরচলিষ্ণু লীলা নিরীক্ষণ করি, তাহা আর্ট নয়, প্রকৃতি। প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দে সৌন্দর্য্যের অবিরাম স্রোত চলিয়াছে। বিশ্বের প্রথম মানবসন্তান এই বিরাট সৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই অপরূপকে প্রেম-বিমুগ্ধ অন্তরে, বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে বরণ করিয়া লইয়াছিল এবং সেই অবধি কত প্রশ্ন তাহার মনে ভিড় করিয়া আসিতেছে। সে জানিতে চায়, বুঝিতে চায়, হইতে চায়। বিশ্বের সৌন্দর্য্যকে সে আপনার মধ্যে পাইতে চায়। এইজন্যই, সে বাতাসের মর্ম্মরধ্বনিকে, সাগরের কল্লোলকে, বিহঙ্গের কলরবকে, আকাশের নীলিমাকে নিজের মত করিয়া পাইতে চায়, রূপ দিতে চায়। মনীষী Tolstoy বলেন* যে (শিল্পীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত অনুভূতি রং রেখা শব্দ বা রূপকের সাহায্যে অন্যের মনে সঞ্চারিত করাই আর্টের উদ্দেশ্য।) সুতরাং তাঁহার মতে আর্টের উদ্দেশ্য শুধু অনুভূতি সঞ্চার। কিন্তু কোন্ জাতীয় অনুভূতি, সেই সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছু বলেন নাই। ইহার ফলে, অনুভূতির ইতরবিশেষের জন্য শিল্পের শ্রেষ্ঠত্বের তারতম্য হইতে পারে, এই প্রশ্নেরও মীমাংসা তাঁহার উক্তিতে ধরা পড়ে নাই। (এই কথা অবশ্য সত্য যে, আর্টের মধ্যে অনুভূতির প্রকাশ থাকে, কিন্তু অনুভূতি সঞ্চারই আর্টের উদ্দেশ্য নয়। বরং সেই অনুভূতি আর্টের মাধ্যমে এমনভাবে প্রকাশিত হয় যেন উহাতে শিল্পীমন ও দ্রষ্টার মনের পরিচয় নিবিড়তর হইয়া ওঠে—পরস্পর পরস্পরকে ভাল করিয়া, গভীর করিয়া পরিচয় করিয়া লয়।

আর্ট ও প্রকৃতি—আর্ট কাহাকে বলে

---

*'To evoke in oneself a feeling one has experienced, and having evoked it in oneself then by means of movement, hues, colours, sounds, or forms expressed in words so to transmit that feeling that others experience the same feeling—this is the activity of art'—*Tolstoy*.

ইহাকে অনুভূতি-সঞ্চার না বলিয়া 'transmission of understanding' বা পরিচয়বোধ-সঞ্চার বলিলে বরং সমীচীন হয়। কারণ, কোন শিল্প-সৌন্দর্য্যের প্রভাবে মনে যে অনুভূতির সঞ্চার হয়, উহার মধ্যে উদ্বেলতা থাকে না, অনুভূতি যেন ধীর স্থির শান্ত পরম বিস্ময় বা শ্রদ্ধায় আনত হইয়া পড়ে। এই জন্যই এই অবস্থাকে বর্ণনা করিতে গিয়া Herbert Read বলেন—'It is a state of wonder or admiration, or more coldly but more exactly, a state of recognition'. শিল্প-সৌন্দর্য্য দেখিয়া দ্রষ্টা সহসা শিল্পী-মনের এত কাছে আসিয়া বসেন যে, তিনি যেন শিল্পের মধ্যে আত্মপরিচিতি আবিষ্কার করেন—তাঁহার দৃষ্টি খুলিয়া যায়।

মানুষের এই যে শিল্প-সৃষ্টির প্রয়াস—মানুষ যে শিল্পের মধ্যে নিজেকে পাইতে চায়, বুঝিতে চায়, বুঝাইতে চায়—কেন? সাধারণভাবে বলা হয় যে, ইহার কারণ, মানুষ একান্তভাবে অনুকরণ-প্রিয়। তাহার এই অনুকরণ প্রবৃত্তি (*Imitation*) হইতে আর্টের জন্ম। বাহিরের সৌন্দর্য্যকে সে নিজের করিতে চায়—বিশ্বকে সে স্ব-এর মধ্যে বন্দী করিতে চায়। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, মানুষের অনুকরণ প্রবৃত্তি হইতে আর্টের জন্ম হইলেও গ্রীক দার্শনিক Plato-র মত আর্ট মাত্রই অনুকরণাত্মক বলা সঙ্গত হইবে না। কারণ, মানুষ শুধু অনুকরণ করে না, অনুকরণ তো ক্যামেরাও করে—কিন্তু সেই অনুকরণকে আমরা শিল্প আখ্যা দিতে পারি না। যে অনুকরণে শিল্পীর মনের স্পর্শ নাই—তাহা যান্ত্রিক ব্যাপার মাত্র। অনুকৃত জিনিষকে মানুষ যখন নিজের মনের মত করিয়া স্বকীয় মানস-দৃষ্টির আলোতে মূর্ত্ত করে, তখনই উহা **আর্ট** বা ললিত-কলা।* Realকে, বাস্তবকে সে মানস-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়া কায়া-কান্তি-ময় করিতে চায়। তাই, আকাশের পরিব্যাপ্ত নীলিমা তাহার চিত্রপটে সুসীম হইয়া উঠে, সমুদ্রের অশান্ত কল্লোল তাহার তুলির লিখনে জীবন্ত হইয়া উঠে, ঝর্ণার 'রামধনু আঁকা'

---

*1. Art is objectified pleasure—*Santayana.*
2. Art is Intuition—*Croce.*
3. Art is emotion cultivating good form—*Read.*

গতি-মূর্চ্ছনা তাহার কবিতায় বাঙ্ময় হইয়া উঠে, পাখীর কলকণ্ঠ তাহার সুর-যন্ত্রে বন্দী হইয়া উঠে। এই ভাবে বাহিরকে সে যেমন বন্দী করে, তেমনই আবার তাহার অন্তরকে বাহির করে। এই যে অন্তরকে বাহির করিবার (Projection of Self) ও বাহিরকে ভিতরের করিবার কামনা, ইহাই আর্টের মূল কথা। যাহা অদৃশ্য ও অনধিগম্য, তাহাকে দৃশ্যমান ও অধিগম্য করাই আর্টের কাজ। আমাদের জীবন চঞ্চল—চঞ্চলতার স্রোতকে ক্ষণ-সৌন্দর্য্যের মধ্যে বন্দী করিয়া মুহূর্ত্তকে চিরত্ব দান করাই আর্টের ধর্ম্ম। জীবনে চলিষ্ণুতা আছে, আর্টে স্থিতি আছে। ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া জীবন অভাবনীয় পরিণতি লাভ করিতে পারে; কিন্তু আর্ট জীবনের ক্ষণ-সৌন্দর্য্যটিকে সমাহিত শান্ত-শ্রী দান করিয়া চিরদিনের করিয়া রাখে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

সে নব জগতে কালস্রোত নাই, পরিবর্ত্তন নাহি

Lessing বলেন—'It is to a single moment that the material limits of art confine its limitations'* সুতরাং আর্ট চলিষ্ণু জীবনের স্থিতিমান মুহূর্ত্তের প্রকাশ। এই জন্যই বিশ্বের চিরচঞ্চল প্রবাহ লক্ষ্য করিয়া রূপকার Goethe-এর ভাষায় বলেন—

Ah, still delay, thou art so fair !

রবীন্দ্রনাথও মৃত্যুকে তেমনই ক্ষণসৌন্দর্য্যের পটভূমিকায় দেখিয়া গাহিয়াছেন—

হে মহাসুন্দর শেষ, হে বিদায় অনিমেষ,
হে সৌম্য বিষাদ।
ক্ষণেক দাঁড়াও স্থির মুছায়ে নয়ননীর
করো আশীর্ব্বাদ।

বলা বাহুল্য, এই মৃত্যুস্তুতি আর্টের ক্ষণ-মহিমায় অভিষিক্ত হইয়া চিরকালের সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়াছে। আর্ট এইভাবে জীবনের ক্ষণ-সৌন্দর্য্যকে চিরত্ব দান করে, এই তথ্যটি কীটস্‌ও বলিয়াছেন। তাঁহার *Ode on a Grecian Urn*

---

*Laocoon : Ch. IV.

কবিতায় যে শব্দ-চিত্র অঙ্কন করা হইয়াছে, উহা যেন জীবনের চলিষ্ণুতা ও ব্যাধি-বিপত্তির ঊর্দ্ধে সমাসীন ভাস্কর্য্য-মহিমা লাভ করিয়াছে, সেই জগতে পরিবর্ত্তন নাই, আছে শুধু মুহূর্ত্তের কালবিজয়ী অভিব্যক্তি—

Bold Lover, never, never canst thou kiss,
Though winning near the goal—yet, do not grieve ;
She cannot fade, though thou hast not thy bliss,
For ever wilt thou love, and she be fair !

আর্ট বিশেষ ও নির্ব্বিশেষ

অতএব আমরা বলিতে পারি যে, দৃশ্য বা অদৃশ্যকে শিল্পীর চিত্তরসে রসায়িত করিয়া যে স্থিতিশীল রূপ-মহিমা দান করা হয়, উহাই আর্ট,* বা ললিত কলা বা চারুশিল্প এবং যিনি এই সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করেন, তাঁহাকে আর্টিষ্ট বা শিল্পী বলা হয়। Art is not representation but interpretation. শিল্পী রূপ-বিলাসী, রূপকার এবং রূপই আর্ট। বলা বাহুল্য, বস্তু বিশেষের কঠিনতা বা কোমলতা, যাহা প্রায় সকলের কাছেই এক, তেমন কোন বহির্গত গুণের সাহায্যে রূপকে বুঝানো যায় না। দ্রষ্টা যখন কোন সৌন্দর্য্যকে অন্তরের বাহু বাড়াইয়া আবেগ-উন্মুখ ভরে ধরিতে যায়, তখনই রূপবন্ধ বা *Form*-এর আবির্ভাব হয়। এই জন্য জনৈক সমালোচক রূপবন্ধকে মানব-মনের 'answering quality' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যে-সত্যকে শিল্পী অন্তরে আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাকে তিনি অন্তরের বাহিরে স্থিতি বা সত্তা দান করেন। তাঁহার ব্যক্তি-অনুভূতি কিন্তু একান্তভাবে ব্যক্তিগতই নয়। তিনি একদিকে যেমন বিশেষ, অপরদিকে আবার নির্ব্বিশেষ। বিশেষই (*Particular*) আর্টের ভিত্তিভূমি। কোন একটি মেয়েকে যখন 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ' হিসাবে দেখি, তখন তাহার মধ্যে বিশেষ কোন ভাবই মূর্ত্ত হইতে পারে না। আবার দৈনন্দিন

---

*Plato, Schiller প্রভৃতি আর্টকে 'a form of play' বলিয়া অভিহিত করেন ; Herder এবং Vernon Lee যে *Empathy*-কে আর্টের আনন্দ-সৃষ্টির মূলীভূত কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, উহাতে আর্টের সামগ্রীগত সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কোন কথা নাই।

জীবনে যখন তাহাকে কন্যা, ভগিনী, মাতা, পত্নী প্রভৃতি রূপে দেখি, তখনও তাহার পরিচয় অস্পষ্ট ও জটিল হইয়া ওঠে। তাহাকে বিচিত্র রূপে জানা সম্ভব, কিন্তু একটি বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন নারীরূপে না দেখিলে সে শিল্পের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। প্রতিদিনের আলোতে তাহাকে আমরা দেখিয়াও দেখি না, চিনিয়াও চিনি না। কিন্তু সেই মেয়েকে যদি বিবাহ-বাসরে 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার' ন্যায় গিরিশের পদপ্রান্তে প্রণতা দেখি, তাহা হইলে সে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কারণ তাহার জীবনের এই বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ মুহূর্ত্তে, এই বিশিষ্টা মেয়েটি অনন্য ও অপূর্ব্ব হইয়া দেখা দিয়াছে, এবং এই বিশিষ্ট রূপই আবার তাহাকে নির্ব্বিশেষের ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত করিয়াছে। সে একদিকে সাধারণ নারী, আর একদিকে এই বিশেষ মুহূর্ত্তে উদ্ভাসিত বিশেষ নারী-প্রতিমা।

শিল্পী আপনার মনের আলোতে তখন তাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া অপরের তথা সর্ব্বজনের মনের কথা বা ভাবময় রূপে তাহাকে প্রকাশ করেন। কাজেই বিশেষকে তিনি নির্বিবশেষ করিয়া, সর্ব্বজন-হৃদয়-বেদ্য করিয়া বস্তুরূপে মূর্ত্ত করিয়া তোলেন। তাঁহার মনের ধারাটী একটী সূত্র বা চিহ্ন অবলম্বন করিয়া তখন রূপ পরিগ্রহ করে। 'সেই চিহ্নই কোথাও বা মূর্ত্তি, কোথাও বা মন্দির, কোথাও বা তীর্থ, কোথাও বা রাজধানী। সাহিত্যও এই চিহ্ন। বিশ্বজগতের যে কোনো ঘাটেই মানুষের হৃদয় আসিয়া ঠেকিতেছে, সেইখানেই সে ভাষা দিয়া একটা স্থায়ী তীর্থ বাঁধাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে—এমনি করিয়া বিশ্বতটের সকল স্থানকেই সে মানবযাত্রীর হৃদয়ের পক্ষে ব্যবহারযোগ্য, উত্তরণযোগ্য করিয়া তুলিতেছে'।*

শ্রদ্ধেয় নন্দলাল বসু বলেন—'শিল্প সাধনায় শিল্পী সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হয়ে যায়। আর্টিষ্টের নিজের ব্যক্তিগত আবেগ, আকাঙ্ক্ষা সংস্কার সবই আছে। কিন্তু, এই মুহূর্ত্তে সে একটি ভাবের আবেগে বিচলিত হচ্ছে আর পর মুহূর্ত্তেই সৃষ্টি করতে বসে নিজের আবেগ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিচ্ছে। তখন বিষয়ে-বিজড়িত তার নিজের কোন আকাঙ্ক্ষা বা আসক্তি থাকছে না, ব্যক্তিগত উপলব্ধির তীব্রতা

*রবীন্দ্রনাথ : সাহিত্য

নৈর্ব্যক্তিক রূপ ধরছে। সৃষ্টির সময় শিল্পী নিজের ব্যক্তিত্বের উর্দ্ধে চলে যায় এবং তার বিষয় ও আবেগ থেকে, ইমোশন থেকে রসে গিয়ে পৌঁছায়।'

এইজন্যই আর্টে শুধু নির্ব্বিশেষের ব্যঞ্জনা থাকিলেই চলিবে না, উহাকে নৈর্ব্যক্তিক (*Impersonal*) হইতে হইবে। নৈর্ব্যক্তিক অর্থ কি?—কোন শিল্পরূপ দেখিয়া যদি দ্রষ্টার মনে লোভ বা পাইবার বাসনা-কামনা উদ্রিক্ত হয়, তবে উহা নৈর্ব্যক্তিক সৃষ্টি নয়। উহাকে দেখিয়া উহার সৌন্দর্য্যবোধ ব্যতীত অন্য কোন ইচ্ছা তাহার মধ্যে প্রবল হইলে শিল্পীর সৃষ্টি আর্ট পদবাচ্য নয়। মনে করুন, আপনার সম্মুখে অতি সুন্দর একটি চিত্র আছে। ইহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া যদি আপনি ইহা পাইবার, অপহরণ করিবার অথবা আত্মসাৎ করিবার কামনায় প্রলুব্ধ হন, তবে উহার মধ্যে নৈর্ব্যক্তিকতা নাই বলিব। যদি মনে করেন, কত টাকা হইলে উহা আপনি ক্রয় করিতে পারেন, অথবা কোন্ চিত্রকর ইহা কোন্ কোন্ রং মিশাইয়া অঙ্কন করিয়াছে, তবে বলিতেই হইবে, আপনার কামনা ও অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হইয়াছে; ইহাতে ঐ আর্টের আর্টত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কারণ আছে। আর যদি উহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আপনি আত্মবিস্মৃত হইয়া তন্ময়ভাবে নিস্পৃহরূপে উহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া উঠেন, তবে বলিব উহা সত্যকারের আর্ট।

আর্টে নৈর্ব্যক্তিকতা

এইখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, দুর্নীতিপূর্ণ বস্তুকে আর্টের বিষয়বস্তু করিলে উহা অকল্যাণকর ও অসুন্দর হয় কিনা। অনেকে পুরী ও কোনারকের মন্দির গাত্রের বদ্ধকাম মূর্ত্তিগুলি অশ্লীল বা দুর্নীতিপূর্ণ বলিয়া আখ্যায়িত করেন। বস্তুতঃ, উহাদিগকে দুর্নীতিপূর্ণ বলা সঙ্গত নহে—উহারা আদিরসাত্মক। আদিরসের লীলাচিত্র হিসাবে উহাদের মধ্যে নরনারী জীবনের আবেগ একটি অখণ্ড সৌন্দর্য্য-রসে ছন্দিত হইয়াছে বলিয়া উহাদিগকে অশ্লীল বা দুর্নীতিপূর্ণ বলা সমীচীন হইবে না। উহাতে যদি রসের কোন ব্যভিচার না ঘটিয়া থাকে, তবে উহাদিগকে অসুন্দর বলিবারও কোন কারণ নাই। কিন্তু যাহারা রুগ্নমন, তেমন লোক ঐ শিল্প-সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারিবেন না। শিল্প-সৌন্দর্য্য-অনুভূতি অনুরূপ মনোবৃত্তি

আর্ট ও নীতি

ও অভ্যাস সাপেক্ষ। অপরিণত বা বিকৃত-মতির পক্ষে উহা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এমন কথা শুনিয়াছিলাম যে, বহুতীর্থ পর্য্যটনের পর মন যখন শান্ত ও সংযত হইয়া আসিয়াছে, তখনই নাকি পুরীর মন্দিরের শিল্প-সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জন্মে। এখন মনে হয়, কথাটির ভিতরের অর্থ এই যে, দ্রষ্টার ব্যক্তিগত বাসনা কামনা যখন স্তব্ধ হইয়া আসিবে, আদিরসকে যখন তিনি বিশ্বলীলার পরম উৎসরূপে প্রত্যক্ষ করিবার উপযোগী হইবেন, তখনই পুরীর শিল্পকলায় তাঁহার ব্যক্তিগত আবেগ ধরা পড়িবেনা—বিশ্বরহস্যের পরমতত্ত্বটি তাঁহার কাছে ছন্দে রূপে ও ভাবে ধরা দিয়াছে বলিয়া মনে হইবে।

মিল্টন ইডেন-উদ্যান মধ্যে প্রথম নর-দম্পতীকে সৃজন করিয়া যে-দৃশ্য উন্মোচন করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—'ইহাতে অপূর্ব্ব আদিরস সংযোজিত হইযাছে। সরলা নিষ্পাপা লোকমাতা নিদ্রা যাইতেছেন, আদিপুরুষ ...তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, অলকাবলীর উপরি প্রভাত সমীরণ নৃত্য করিতেছে, নিমীলিত নয়নোপরি অলকাবলী ঝলমল করিতেছে, আদম যতনে তাহা সরাইয়া দিতেছেন; এই চিত্র সমধিক মনোহর, ইহা অতুল্য, অমূল্য।' বলা বাহুল্য. যে দৃষ্টি দিয়া দেখিলে এই দৃশ্যকে 'অতুল্য' বলা যায়, তাহা নৈর্ব্যক্তিক রস-দৃষ্টি। ইহার অভাবে শিল্পের সৌন্দর্য্যানুভূতি সার্থক হইতে পারে না।

ললিতকলা বা চারুশিল্প পাঁচটি,* যথা—স্থপতিবিদ্যা, ভাস্কর্য্য, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত ও কবিতা। প্রত্যেক শিল্পীই স্বকীয় অনুভূতি বা ভাবকল্পনাকে কখনো স্থাপত্যশিল্পে, কখনো ভাস্কর্য্যে, কখনো চিত্রে, কখনো সঙ্গীতে, কখনো কাব্যে নিজের বাহিরে রূপ দান করেন। অর্থাৎ শিল্পী তাঁহার ভাবরাজ্যের স্বপ্ন-কামনাকে বহির্জগতে বস্তুরূপে প্রমূর্ত করিয়া তোলেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, ভাবকল্পনা বা অনুভূতির যথেচ্ছ প্রকাশে আর্টের সৃষ্টি হয় না। উহা শিল্পীর ব্যক্তিগত

আর্টের বিশেষত্ব

*এতদ্ব্যতীত নাটক, বাগ্মিতা ও নৃত্যবিদ্যাকে মিশ্র-ললিতকলা রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

মানস-বিলাসের চিহ্ন মাত্র হইতে পারে। সত্যকারের শিল্প যে-অনুপ্রেরণায় জন্মগ্রহণ করে, তাহার মধ্যে উদ্বেলতা থাকিলেও সংযমবোধ থাকা চাই। শিল্পী তাহার প্রেরণাকে সংযত ও সংহত করিয়া বিশেষ একটি রূপায়নের চেষ্টা করেন। সেইজন্য তাহার শিল্পের বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটি ছন্দবোধ বা সৌষম্য বর্ত্তমান থাকে। এই সৌষম্য বা ছন্দবোধের সাহায্যে শিল্পটি প্রাণবান হইয়া উঠে; যেখানে ইহা হয় না, সেখানে শিল্পের অসংগত সৌন্দর্য্য থাকিলেও উহা দ্বারা কোন সর্ব্বাঙ্গীণ সৌন্দর্য্যবোধ জাগ্রত হয় না। সুতরাং বিচিত্রতা যেমন সৌন্দর্য্যের উপাদান ও শিল্পের ভিত্তিভূমি, তেমনি একত্ববোধও উহার প্রাণ-নন্দিনী। খণ্ডাংশ যখন অখণ্ড মণ্ডলায়িত সৌন্দর্য্য-সুষমা সৃষ্টি করে. তখনই উহার মধ্যে মানস-দীপ্তির লাবণ্য বিচ্ছুরিত হয়—উহা সুষীম, সুন্দর, সঙ্গতিপূর্ণ রূপসৃষ্টি বা আর্টরূপে আত্মপ্রকাশ করে। যে শিল্পী বাহিরের সহিত নিজের ও বিশ্বের সহিত আপনার পরিচয়কে নিবিড় করিয়া, অখণ্ড করিয়া অনুভব করেন নাই, তাহার শিল্পকর্ম্মে ছন্দপতনের লক্ষণ অনিবার্য্য। এখানে আব একটি মাত্র কথা বলা প্রয়োজন। /শ্রেষ্ঠ আর্ট শুধু রূপ-সৌষম্য দ্বারা আমাদিগকে মুগ্ধ করে না, উহার মধ্যে রূপাতীতের ব্যঞ্জনা, 'a snatch beyond the reach of art' থাকে।

আর্ট ও বিজ্ঞান

আর্ট ও বিজ্ঞানে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। আর্ট অর্থ সৃষ্টি, রূপায়ন। রূপসৃষ্টির সহায়তার জন্য যে রীতি বা পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হয়, উহাই ইহার বিজ্ঞান বা শিল্প-রীতি। কবিতা লিখিবার সময় কবি নিজের মনোগত ভাব প্রকাশার্থে যথাবিহিত শব্দ-চয়ন ও ছন্দ-রীতির সাহায্য গ্রহণ করেন। ইহাই কবিতা-শিল্পের বিজ্ঞান-ভূমি। চিত্রকর তুলির লিখনে দূরত্ব বা সন্নিকটত্ব বুঝাইবার জন্য যে-নির্দ্দেশানুযায়ী রেখাঙ্কন করেন, উহাই চিত্রকলার বিজ্ঞান-ভূমি এবং চিত্রটি ললিতকলা। সুতরাং সৃষ্টি-নিয়ামক যে পদ্ধতি, তাহাকে বলিব বিজ্ঞান ও সৃষ্টিকে বলিব ললিতকলা, আর্ট। গভীর ভাবে দেখিলে বুঝা যাইবে যে, ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ; বিজ্ঞান ব্যতীত আর্ট রূপবান হইতে পারে না, আবার আর্টের সৃষ্টি ব্যতীত বিজ্ঞানেরও কোন সার্থকতা নাই।

শিল্পীর সহিত তাহার যুগচিত্তের সম্বন্ধ অত্যন্ত নিবিড়। যে-পরিবেশে তিনি পারবর্দ্ধিত তাহার প্রকৃতি, তাহার সংস্কার ও ঐতিহ্য-পরম্পরা (*Tradition*) তাহাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার ব্যক্তি-চরিত্র বা স্বকীয়তাই তাহার পরম সম্পদ। বিষয়বস্তু বা পরিবেশ বা জাতীয় সংস্কৃতি —যাহাই হোক না কেন, উহাকে উপলক্ষ্য করিয়া শিল্পী স্বকীয় ব্যক্তিমানসের রূপসাধনা চরিতার্থ করিবার জন্য শিল্পসৃষ্টি করেন। এবং ইহাই যদি সত্য হয় যে, শিল্পীর ব্যক্তি-মানসের রূপসাধনা—definite-will-to-form-ই শিল্পের স্রষ্টা, তাহা হইলে বিভিন্নযুগের শিল্প-সৃষ্টির ঐক্য কি করিয়া ব্যাখ্যা করা সম্ভব? ইহা এই জন্যই সম্ভব যে, শিল্পের চরম মূল্য দেশকালাতীত, এমন কি শিল্প স্রষ্টার মনেরও অতীত। শিল্পী তাহাব মনের অবচেতনাংশে তাহার রূপ-সৃষ্টির এমন একটি রহস্য-বিস্ময়-পূর্ণ সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করেন, যাহা একমাত্র প্রজ্ঞাদৃষ্টি বলেই সম্ভব। এইখানে আর একটি কথাও মনে রাখিতে হইবে। যে-লেখক শুধু নিজের যুগের কথা লিপিবদ্ধ করেন, তাহার সৃষ্টির পরমায়ু স্বল্পকালের। শ্রেষ্ঠ লেখক যুগের প্রতিনিধি নহেন—তিনি যুগধারা হইতে যুগাতীতকে, চিরন্তনকে প্রত্যক্ষ করেন। ওযার্ডসৃওয়র্থ অষ্টাদশ শতাব্দীতেই কাব্যে অনাগত যুগের সুর সংযোজন করিয়াছিলেন, সেক্সপীয়ার এলিজাবেথীয হইয়াও কালাতীত জীবন-মহিমাকে রূপ দান করিয়াছেন। মধুসূদন উনবিংশ শতাব্দীতে বসিয়া রামায়ণ অবলম্বনে 'মেঘনাদ বধ কাব্যে' নিয়তি-নিপীড়িত দুর্ব্বল মানবাত্মার অপরাজেয় মহিমা কীর্ত্তন-করিয়াছেন। এইজন্য ইঁহারা শ্রেষ্ঠ শিল্পী। কাজেই যুগচিত্ত বা ঐতিহ্য-পরম্পরা শ্রেষ্ঠ লেখকের নিয়ামক নহে। এই সম্বন্ধে Sampson বলেন—

শিল্পী ও যুগচিত্ত

'An artist of the first rank accepts tradition and enriches it; an artist of the lower rank accepts tradition and repeats it; an artist of the lowest rank rejects tradition and strives for originality.'

আর্টের প্রধান উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি। কিন্তু কয়েক প্রকার আর্টে

মানবত্ব অপেক্ষা অরূপ অপরূপ দেবত্বের দ্যোতনা, সুপ্রাচীনকালের আর্টে (Primitive Art) জগতের বিচিত্র দুর্দান্ত শক্তির ভীত-বিস্মিত স্তুতি; প্রাচ্য আর্টে আবার মানবতাব নির্ব্বিশেষ মানস ব্যঞ্জনা। এইখানে আরও মনে রাখিতে হইবে যে, সকল দেশের সকল কালের আর্টেই একই রকম সৌন্দর্য্য দ্যোতনা না-ও থাকিতে পারে। কিন্তু শিল্প-সৃষ্টির মধ্যে সৌষম্য বা শিল্পগত সত্যতা বোধ আছে কিনা, এবং উহা আপাততঃ অসুন্দর মনে লইলেও উহা যদি শিল্পীর মনের আলোকে সীমিত সৌষম্য লাভ করিয়া থাকে, তবেই উহা আর্ট।

আর্টের অনুভূতি সত্য হইলে দ্রষ্টারও মনের মুক্তি হয়। এই মুক্তিকেই জনৈক সমালোচক বলিযাছেন, 'a heightening, a sublimation'। এই যে আর্টের উপভোগের মধ্যদিয়া আত্মমুক্তি, আত্মসমুন্নতি ও আত্মসাক্ষাৎকার ইহা আবার দ্রষ্টাকে এমন এক জগতে লইয়া যাইতে পারে, যেখানে তিনি আত্মারাম হইয়া উঠিয়াছেন।§ সুতরাং আমবা বলিতে পারি যে, জড়বাদ বা নেহাৎ প্রয়োজন-বাদের যুগে আর্টের মূল্য না থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা শুধু মানবাত্মার সিসৃক্ষুতার মুক্তি-পথই নয়, ইহা মানব সভ্যতার মাপকাঠি। 'It is the art of each race that gives its civilization its distinct character and rhythm.' মিশর, গ্রীস, ইটালী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের সভ্যতার পরিমাপ ইতিহাসে যতটুকু থাকে, তাহা অপেক্ষাও গভীরভাবে স্পষ্ট হইয়া উঠে উহাদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভগ্ন চূর্ণ বিচূর্ণ আর্টের মধ্যে। ইতিহাস আর্টের সাহায্যে জীবন্ত হইয়া উঠে।

§এই জন্যই বলা হইয়াছে, Art is a tryst—শিল্প স্রষ্টা ও দর্শকের নিভৃত সাক্ষাৎকার।

২

সাহিত্য

মানুষ নিজেকে যতই স্বাধীন বলিয়া মনে করুক, সে কখনো একান্তভাবে স্বাধীন নহে। একদিকে সে যেমন ব্যক্তিবিশেষ, অপর দিকে আবার তাহার জাতির ভাবকল্পনা ও ঐতিহ্যের প্রতিনিধি এবং সমাজের অঙ্গ বিশেষ। এই হিসাবে তাহার মধ্যে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের চিহ্ন রহিয়াছে। আবার, মানুষের মধ্যে পশু-প্রবৃত্তি অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন প্রভৃতি ব্যতীত বিচারবুদ্ধি এবং অনুভূতি রহিয়াছে। শেষোক্ত দুইটিই তাহাকে মানবেতর সৃষ্টি হইতে বিলক্ষণ করিয়া সৃষ্টির মধ্যে মহৎ মর্যাদা দান করিয়াছে।

সাহিত্য-সৃষ্টি

মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার অন্ত নাই। সে নিজেকে বাহিরে দেখিতে চায়—মানুষের মধ্যে, অপরের মধ্যে সে আপনাকে পাইতে চায়; এবং পাইতে চায় বলিয়া সে-ও ভগবানের মত নিজেকেই প্রকাশ করিতে চায়। ভগবান যেমন 'বহুস্যাম্'—বহু হইব, বলিয়া সৃষ্টির আনন্দে জগৎ-সৃষ্টি করিয়াছেন, মানুষও তেমন নিজের ভাব-কল্পনাকে বহু রূপ পরিগ্রহ করাইয়া তাহার মাধুর্য্য উপভোগ করিতে চায়। এইভাবে আত্ম-প্রকাশের জন্য মানুষের মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, মানুষ কখনও স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়। একান্ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী মানুষও জন্ম হইতেই পরনির্ভরশীল। জন্মের পর হইতে মানবশিশু পিতামাতা আত্মীয় স্বজন এবং পারিপার্শ্বিকের উপর নির্ভর করে। গোয়ালা তাহার দুধ জোগায়, তন্তুবায় তাহার বস্ত্র জোগায়, কৃষক তাহার অন্ন জোগায়। এইভাবে সমাজের নানাজন নানাভাবে তাহাকে গড়িয়া তোলে, তাই সে তাহার পারিপার্শ্বিক, তাহার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, জাতি ও প্রকৃতিকে সে উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারে না। ইহারা তাহার বাস্তব পারিপার্শ্বিক।

পারিপার্শ্বিকের সহিত সংযোগহীন মানুষ আত্মসঙ্কুচিত, দীন। 'স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ বৃহৎ জগত হতে সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে'। তাই মানুষ নিজেকে বিস্তৃত করিয়া দেখিতে চায়। এতদ্ব্যতীত, মাটির মানুষ ক্ষুধাতৃষ্ণার দাবী মিটাইয়া আর একটি কাল্পনিক জগতের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। বাস্তব-জীবন ব্যতীত আর একটি কল্প-জগতের মোহ তাহাকে পাইয়া বসে। কারণ, বাস্তব জগতে তাঁহার সকল আশা আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। তাই কল্পনার জগতে সে জীবনের অপূর্ণতার বৃত্তাংশকে পরিপূর্ণ করিয়া পায়—তাহার অপ্রাপ্তির ইতিহাস কল্পনার জগতে প্রমূর্ত্ত হইয়া উঠে এবং সাহিত্যে উহা তাহার স্বপ্ন-পূরণ রূপে দেখা দেয়। জীবনের বাস্তবভাগ্য অনেক সময়ই মানুষের পক্ষে পীড়াদায়ক। ইহার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া লেখক কল্পনা-সর্ব্বস্ব একটি সুন্দর জগৎ সৃষ্টি করেন। যাহা জীবনে পাওয়া গেলনা, তাহাই কল্পনায় পাইয়া লেখক আশ্বস্ত হইয়া কল্পনাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন। বন্ধন জর্জরিত কবিচিত্ত তাই বিশ্বের স্বর্ণ-যুগ কল্পনা করেন, বেদনা-লাঞ্ছিত কীটস্ তাই সৌন্দর্য্য ও সত্যের অভিন্নতাকে প্রত্যক্ষ করেন, বাঙালী কবি মরণের মধ্যে অমৃতের আস্বাদন করেন। আবার ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, মানুষ স্বভাবতঃই রূপ-বিলাসী, স্রষ্টা। এই জন্য স্বকীয় ভাবনা-কামনাকে রূপশ্রয়ী করিবার ইচ্ছা তাহার সহজাত বৃত্তি। মানুষ বলিযাই হয় তো সে রূপ-মুগ্ধ। সে যাহা চায়, তাহাকে সে রূপের মধ্যে দেখিতে চায়। তাহার কামনা ও কল্পনা যতই সীমাহীন বা সূক্ষ্ম হোক না কেন, উহাকে সে রূপের বন্ধনে আনিতে না পারিলে তাহার মন যেন শান্তি পায় না। কাজেই অরূপ যাহার ভাববিলাস, তেমন কবিও রূপেরই সন্ধানী। এই রূপ-প্রিয়তাই হিন্দু তাহার ধর্ম্মাচরণে, তাহাব পূজাপার্ব্বণে দেবদেবী-কল্পনায় সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। রোমান ক্যাথলিকগণের ধর্ম্মাচরণেও এই রূপপ্রিয়তা দেখা যায়। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়, যাহারা 'রূপ বিবর্জিত' ভগবৎসত্তায় বিশ্বাসী, তাহারাও কাব্য জগতে রূপটিকেই মুখ্য বলিয়া মনে করেন—যাহা নিরবয়ব, তাহাকে 'local colour and habitation' দিতে তাহাদেরও বাঁধেনা। বাঁধিলে, তাহাদের কাব্যসাধনাই ব্যর্থ হইত। কিন্তু আত্ম-প্রকাশ কথাটাই যে মুখ্য, ইহা

বলাই বাহুল্য। সুতরাং আত্ম-প্রকাশের কামনা, পারিপার্শ্বিকের সহিত সংযোগ-কামনা, কল্প-জগতের প্রয়োজনীয়তা এবং রূপ-প্রিয়তা—এই চারিটিই মোটামুটি হিসাবে মানুষের সাহিত্য-সৃষ্টির উৎস। কবি বা সাহিত্যিক স্বকীয় মনোগত ভাব অপরের নিকট প্রকাশ করিতে চাহেন; কারণ অপরের মনে তাহার ভাবনা-কামনার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইলে তিনি উৎফুল্ল হন, অপরের সহিত যোগসূত্র আবিষ্কার করিয়া লেখক নিজের ব্যক্তিত্বকে বৃহৎ করিয়া অনুভব করেন। তখনই রবীন্দ্রনাথের মত তিনি গাহিয়া উঠেন—

> ওরে প্রাণের বাসনা, প্রাণের আবেগ
> রুধিয়া রাখিতে নারি।

সাহিত্য লেখকের আত্ম-প্রকাশ

সাহিত্যিক যখন আত্ম-প্রকাশ করেন, তখন তিনি হয়তো নিজের অন্তর পুরুষকে প্রকাশ করেন বা বাহ্য জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দকে আত্মগত অনুভূতি-রসে স্নিগ্ধ করিয়া প্রকাশ করেন, অথবা তাঁহার ব্যক্তি-অনুভূতি-নিরপেক্ষ বিশ্ব-জগতের বস্তু-সত্তাকে প্রকাশ করেন। নিজের কথা, পরের কথা বা বাহ্য-জগতের কথা সাহিত্যিকের মনোবীণায় যে সুরে ঝঙ্কৃত হয়, তাহার শিল্প-সঙ্গত প্রকাশই **সাহিত্য**।

'প্রকাশ' বলিলেই আমরা যিনি প্রকাশ করেন এবং যাহা প্রকাশ করেন, এই দুইটী সম্বন্ধে সচেতন হই। যিনি প্রকাশ করেন, তিনিই সাহিত্যিক এবং যাহা প্রকাশ করেন, তাহাই সাহিত্যের বস্তু বা সামগ্রী। প্রকাশের একটী ভঙ্গি থাকা চাই। ইহার উপর নির্ভর করিয়াই সাহিত্যের রূপ-ভেদ নির্দ্ধারিত হয়। যখন সাহিত্যিক একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ করেন, তখন উহাকে আমরা **মন্ময় সাহিত্য** বা *Subjective Literature* বলি। সাহিত্যে বস্তু-সত্তার প্রাধান্য হইলে উহাকে **তন্ময় সাহিত্য** বা *Objective Literature* বলা হয়। এই স্থলেও একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, নিছক বস্তুতন্ত্র সাহিত্য (*Realistic Literature*) ব্যতীত সকল সাহিত্যই কম বেশী ব্যক্তি-অনুভূতি-রঞ্জিত। প্রকাশ-ভঙ্গিতে কখনো সাহিত্যিকের বুদ্ধিবৃত্তি, কখনো অনুভূতি,

কখনো কল্পনা বা কখনো বাণী-বিন্যাসের কলা-কৌশল মুখ্য হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু সু-সাহিত্যে উহাদের সমন্বয় সাধিত হইয়া থাকে; এবং তখনই ভাব, ভাষা, বাচ্যার্থ, ব্যঙ্গ্যার্থ, রীতি প্রভৃতির সমন্বয় সাধিত হয়।

সাহিত্য বলিতে সাহিত্যিকের মন, বস্তু-জগৎ ও প্রকাশ-ভঙ্গি—এই তিনটী বিষয়ই লক্ষ্য করিবার বিষয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাহিত্যিক নিজের অনুভূতিকে প্রকাশ করেন—বাহিরের জিনিষকে 'আপন মনের মাধুরী' মিশাইয়া রূপসৃষ্টি করেন। কেন?—আত্ম-প্রকাশের জন্য। কিন্তু আত্ম-প্রকাশই সাহিত্যের সব কথা নয়। তিনি আত্ম-প্রকাশ করেন, আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য, আত্ম-বিস্তারের জন্য, নিজেকে পাঠক সম্প্রদায়ের গোচর করিবার জন্য। সর্ব্বকালের সহৃদয়জনের হৃদয়-বেদ্য ভাবকে আত্মগত করিয়া আবার তাহাকে পরের করিয়া প্রকাশই সাহিত্য। এইজন্য সাহিত্য একান্ত ব্যক্তি-নিষ্ঠ হইয়াও ব্যক্তি-নির্ব্বিশেষ।

সাহিত্যে লেখক, বস্তু-জগৎ ও প্রকাশ-ভঙ্গি

ইহার পর বস্তু-জগৎ। বস্তু-জগৎ বলিতে আমরা কী বুঝি? সাহিত্যিকের একান্ত ব্যক্তি-চরিত্র বা ব্যক্তি-চিত্ত ব্যতীত তাঁহার চারিদিকে দৃশ্য ও অদৃশ্য যে-জগৎ লীলা-চঞ্চল রূপে বর্ত্তমান, উহাই বস্তু-জগৎ। এই জন্যই বিশ্ব-প্রকৃতি, জীব-প্রকৃতি ও অদৃশ্য যে-শক্তি মানুষের সুখ-দুঃখ নিরপেক্ষভাবে ক্রীড়া করিতেছে, তাহাও সাহিত্যের সামগ্রী। মোটকথা, বিশ্ব-প্রকৃতি, ভগবান, মানব ও জীব-জগৎ—সকলই সাহিত্যের সামগ্রী। এই সামগ্রী যখন সাহিত্যিকের কল্পনা-রঞ্জিত হইয়া আত্ম-প্রকাশ করে—ভাবে নয়, ভাবময় রূপে, তখনই উহা সাহিত্য।

সাহিত্যের উপকরণ বা সামগ্রী

'ভাবময় রূপে' বলিবার সার্থকতা এই যে, সাহিত্য কখনও নিছক ভাবাত্মক নয়, ভাবকে এইখানে রূপাত্মক হইতে হইবে। এই চোখে-দেখা কানে-শোনা বস্তু-উপাদানকে সাহিত্যিক গ্রহণ ও বর্জ্জনের দ্বারা শোধন করিয়া প্রকাশ করেন। বিষয়বস্তু ও প্রকাশ-ভঙ্গি যদিও পরস্পর সাপেক্ষ, তথাপি বলা যাইতে পারে যে, সাহিত্যে প্রকাশ-ভঙ্গির মূল্যই বেশি। একই বিষয়বস্তু লইয়া দুইজন কবি দুইটি

কবিতা লিখিতে পারেন, এবং উভয় কবিতা সুন্দর নাও হইতে পারে। দেখিতে হইবে, বিষয়বস্তু কবি-কল্পনায় সর্ব্বমানবের পক্ষে কতখানি হৃদয়গ্রাহী ও সুন্দর রূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। মনে করুন, খবরের কাগজে আপনি একটি সংবাদ পাইলেন, কোথাও কোন স্বামী স্ত্রীকে সন্দেহ করিয়া হত্যা করিয়াছে। এই লোমহর্ষণ কাহিনী পড়িয়া মানব-চরিত্রের অভাবনীয় বিকারে আপনি ব্যথিত হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু সাহিত্যিক যখন এই কাহিনীকে নির্ম্মম্থন্ করিয়া *Othello* নাটক রচনা করেন, তখন *Desdemona*-কেও আপনার অস্বাভাবিক মনে হয়না, এমন কি, বেচারা স্বামী *Othello*-কে পর্য্যন্ত আপনি সহানুভূতি না দেখাইযা পারেন না। আপনি বোঝেন, স্ত্রী-হত্যা করিয়া সে ভাল করে নাই। কিন্তু এমতাবস্থায় হত্যা করা ছাড়া আর কোন উপায়ও যে ছিল না, এই বোধই আপনার প্রাণে সঞ্চারিত হয়। তখন আপনি সহানুভূতিশীল হইয়া উভয়কে গ্রহণ করেন এবং বেদনার মধ্যেও আপনার মনে অপূর্ব্ব আনন্দ সঞ্চারিত হয়। এই ভাবেই কল্পনার সাহায্যে ব্যবহারিক জীবনের সত্যকে (*Fact*) সাহিত্যিক কাব্যের সত্যে (*Truth*) পরিণত করেন।

সাহিত্যিক বা কাব্যগত সত্য

এখন কথা হইল, সাহিত্য যদি বাস্তব-সত্যকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়, তবে কি সত্য হইতে বিচ্যুত হয়? কেহ কেহ মনে করেন, সাহিত্য প্রকৃতির অনুকৃতি (*Imitation*); কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। প্রকৃতিতে যাহা আছে, সাহিত্যে তাহাই পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত, বিশেষিত (*Particularised*) ও সুন্দর হইয়া ওঠে। মনে করুন, কোন কবি বা সাহিত্যিক সিঞ্চলে সূর্যোদয়ের দৃশ্যে আলোকের জন্ম-মুহূর্ত্তে অন্ধকারের যে-বেদনাকম্প আছে, তাহা দেখিযা মুগ্ধ হইযাছেন। তিনি যখন তাহাকে সাহিত্যে রূপ দান করিতে চাহেন, তখন তাঁহার সূর্য্যোদয়-দৃশ্য-দর্শনের অভিজ্ঞতার মুহূর্ত্ত ও তৎকালীন আনন্দ-অনুভূতিব কথা তাঁহার মনের অবচেতন অংশে আত্ম-গোপন করিয়া আছে। সেই স্থান হইতে উহারা নবদেহ পরিগ্রহ করিয়া, নব অঙ্গরাগে রঙিন হইয়া কবির বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে প্রত্যক্ষীভূত হয়। কবি যেন বর্ণনা-প্রসঙ্গে প্রথম অভিজ্ঞতার বস্তু-সত্তা হইতে অনেক দূরে সরিয়া আসেন,

এবং যে-রং ও রেখায় তিনি উহাকে এখন চিত্রিত করিতেছেন, তাহার সৌষম্য রক্ষা করাই তাঁহার পক্ষে তখন মুখ্য বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্য, ইতিপূর্ব্বে কবি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা নয়, কবির আলেখ্য-বর্ণনা যতটুকু সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার সহিত সঙ্গতি রক্ষার প্রেরণাই তাহাকে পরিচালিত করে। সুতরাং পরিণামে যাহা রূপময় হইয়া উঠে, তাহা কবির প্রথম অভিজ্ঞতা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিষ—তাহা শুধুই প্রকাশ নয়, রূপান্তরিত রূপে (*transformed*), অভিনব রূপে, নবজন্ম-প্রাপ্ত রূপে প্রকাশ।

এইখানে সাহিত্যিক বা কাব্য সত্য এবং ঐতিহাসিক সত্যের কথা আসে। ইতিহাস বা ভূগোলে যে সত্য, তাহা তথ্য-সত্য (*Truth of Fact*)। এই সত্য সম্বন্ধে কখনও দ্বি-মত হয় না। হিমালয় ভারতের উত্তরে অবস্থিত, এই ভৌগোলিক সত্য সম্বন্ধে কেহ কোনদিন দ্বি-মত পোষণ করেন না। শাজাহান যে সকল অনুষ্ঠানের দ্বারা মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব বর্দ্ধিত করিযাছিলেন, তাহা শুধু ঐতিহাসিক তথ্য। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও সত্য তাঁহার মহত্ত্ব। সেই সত্যটী—তথ্যটি নয়, পাঠকের মনে উজ্জ্বল করিযা তুলিতে ঐতিহাসিকের গবেষণা অপেক্ষা কবি-প্রতিভার আবশ্যকতা বেশি। এই কবি-প্রতিভা যে সত্য প্রতিষ্ঠা করে, তাহার বস্তুগত সত্যতা নাই, কল্পনার সত্যতা (*Truth of Imagination*) আছে। যাহা হইতে পারে, কবি বা সাহিত্যিক তাহাকে সত্য বলিয়া অন্তর হইতে উপলব্ধি করেন। যে-ভাবে কবি বিষয়-সন্নিবেশ ও চরিত্রাঙ্কন করেন, তাহার সম্ভাব্য-সত্যতা প্রদর্শনই তাঁহার অভিপ্রায়। রাশীকৃত তথ্য হইতে কবি কল্পনার সাহায্যে সত্যতম, নিত্যতম সত্যকে আবিষ্কার করেন—এই আবিষ্ক্রিয়া ঐতিহাসিকের নয, সত্য-দ্রষ্টা কবি-প্রতিভার। এই জন্য কাব্য বা সাহিত্য পাঠ করিতে আমরা বর্ণিত ঘটনাবলীর যথাযথ সত্যতার জন্য উৎসুক হই না।* *Hamlet* নাটক পড়িতে গিয়া মৃত পিতার প্রেতাত্মা এমন করিয়া তাহার

*For this kind of truth...we must not go to a novel, or a poem, but to a treatise on politics and economics—to the blue-books or the criminal reports'—*Worsfold.*

আত্মজকে প্রতিশোধ কামনায় উদ্বুদ্ধ করিতে পারে কিনা, এ আলোচনা যেমন নিরর্থক, তেমনি *Hamlet* ডেনমার্কের, না জার্মেনীর রাজা ছিলেন, এই গবেষণাও নিষ্প্রয়োজনীয়। শুধু দেখিতে হইবে, *Hamlet*-এ নাট্যকার যে-পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং নায়কের চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়া তাহাকে চিরন্তন যুবচিত্তের যে-প্রতীক রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার ফলে পাঠক তাহার মধ্যে আত্মপ্রতিচ্ছবি দেখিয়া বিমোহিত হইয়া উঠে, তাহা সম্ভব কিনা। সূর্য্যমুখী চরিত্রের সত্যতা সন্ধানে 'কোন্নগর'-পরিক্রমায় লাভ হইবেনা, তাহার জীবনের সত্যতা তৎকালীন বাঙালী কুলবধুর ত্যাগনিষ্ঠ জীবনেই মিলিবে; অপুকে পাইবার জন্য নিশ্চিন্তপুরে গেলে চলিবে না, সে ধরা দিবে চিরন্তন শিশু-চরিত্রে, উহাই তাহার চিরবাসস্থান। 'পল্লীসমাজ' পড়িয়া কুয়াপুকুর নামক কোন গ্রামে রমা বা রমেশের জীবন সত্যই বেণী ঘোষাল, গোবিন্দ গাঙ্গুলী প্রভৃতির জন্য ব্যর্থ হইয়াছিল কিনা, ইহাও আমাদের জিজ্ঞাস্য নয়। বাংলার পল্লীসমাজের তেমন আবহাওয়ায় তেমন একটি মর্ম্মান্তিক কাহিনী সম্ভবপর হইতে পারে, এবং রমা ও রমেশ যেরূপ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও স্বতন্ত্র পরিবেশে বর্দ্ধিত, তাহাতে তেমন পরিণতি অত্যন্ত স্বাভাবিক, এই বার্ত্তা যদি শরৎচন্দ্র আমাদের হৃদয়ের দ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়া থাকিতে পারেন, তবেই উপন্যাসের কাব্যগত সত্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে বলিয়া আমরা উপলব্ধি করি। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেন—

> ঘটে যা, তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি,
> রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

বহুদিন পূর্ব্বে *Aristotle* এই কথাই বলিয়াছেন—'The truth of poetry is not a copy of reality but a higher reality : *what to be*, not *what is*....Probable impossibilities are to be preferred to improbable possibilities.'

Hudson-ও বলেন, 'By *poetic truth* we mean fidelity to our emotional apprehension of facts....our first test of truth in

poetry, therefore, is its accuracy in expressing, not what things *are* in themselves, but their beauty and mystery, their interest and meaning for us.' বলা বাহুল্য, এই দিক হইতে দেখিলেই বুঝা যাইবে, কেন সাহিত্যকে 'interpretation of life' বা বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব-জীবন-ভাষ্য বলা হয়।

জ্ঞানের সাহিত্য ও ভাবের সাহিত্য

সাহিত্যকে দুইভাগে* বিভক্ত করা যায়, যথা—**জ্ঞানের সাহিত্য** এবং **ভাবের সাহিত্য**। জ্ঞানের সাহিত্যের মধ্যে বস্তু-সত্তা লেখকের ব্যক্তি-অনুভূতি দ্বারা ততখানি রঞ্জিত হয় না। রামেন্দ্রসুন্দরের 'জিজ্ঞাসা, অনাথ গোপাল সেনের 'টাকার কথা', রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলার ইতিহাস', জগদানন্দের 'আলো' বা রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্ব-পরিচয়'—ইহাদিগকে 'জ্ঞানের সাহিত্য' বলা যায়। যে-সাহিত্যে বিষয়বস্তু লেখকের স্বকীয় ভাব-কল্পনা বা ব্যক্তি-অনুভূতি দ্বারা রূপান্তরিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাহাকে ভাবের সাহিত্য বলা যায়। উপন্যাস, গল্প, নাটক, কবিতা—ইহাদিগকে 'ভাবের সাহিত্য' বলিতে পারি। বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, জ্ঞানের সাহিত্য বিশুদ্ধ সাহিত্য পদবাচ্য নয়। কারণ, ইহার মধ্যে ব্যক্তি-স্পর্শ নাই; ইহার সর্বজন-প্রিয়তার মূলে বুদ্ধিবৃত্তি, ব্যক্তি-হৃদয় নয়। যুগে যুগে জ্ঞানের সাহিত্য পরিবর্দ্ধিত ও উন্নত হইতে পারে। আজ বিজ্ঞান-জগৎ সম্বন্ধে যে-গ্রন্থ লিখিত হইল, দশ বৎসর পর আর একটি উন্নততর গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে, আজিকার সাহিত্য ম্লান হইয়া পড়িবে। কারণ, জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থখানার মূল্য কমিয়া যায়। কিন্তু ভাবের সাহিত্যের উন্নততর সংস্করণ হইতে পারে না। এইজন্যই 'বিশ্ব-পরিচয়' অপেক্ষা উন্নততর জ্ঞানের সাহিত্য রচিত হইতে পারে, এবং হইলেই ইহার মূল্য থাকিবে না। কিন্তু 'মেঘনাদবধ কাব্য' বা 'সোনার তরী' কাব্যের উন্নত বা পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ হয় না, হইতে পারে না। ইহারা চিরকালের সাহিত্য। এইখানেই ভাবের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব। জ্ঞানের সাহিত্য যুগের কথা প্রকাশ করে, ভাবের

De Quincey.

সাহিত্য যুগন্ধর হইয়াও যুগাতীতকে প্রকাশ করে। প্রথমটি মানুষের বুদ্ধিকে জাগ্রত করে, দ্বিতীয়টি তাহার হৃদয়কে অধিকার করে। প্রথমটি সাময়িক, দ্বিতীয়টি চিরকালের। তবে, এই কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, জ্ঞানের ও ভাবের সাহিত্যের মধ্যে ভেদরেখা সব সময় সুনির্দ্দিষ্ট না-ও থাকিতে পারে। জ্ঞানের সাহিত্যের মধ্যেও ভাবের কথা, মনকে উদ্বুদ্ধ করার কথা অনায়াসে মিশিয়া যাইতে পারে। ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভয়ের কথা' ও জগদীশ বসুর 'অব্যক্ত' গ্রন্থে জ্ঞান যেন ভাবময় হইয়া আমাদের অন্তর স্পর্শ করে। ইতিহাস মূলতঃ জ্ঞানের সাহিত্য, কিন্তু বার্ক বা কার্লাইল-এর *French Revolution* অথবা গিবনের ***The Decline and Fall of the Roman Empire*** প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে ইতিহাসের তথ্যালোচনা কাব্য-সুষমা লাভ করিয়াছে।

সাহিত্যে সর্ব্বজনীনতা

প্রশ্ন হইতে পারে, সর্ব্বমানবকে জানা কি সাহিত্যিকের পক্ষে সম্ভব? সম্ভব নয়—আবার সম্ভবও। সর্ব্বমানবকে এক এক করিয়া জানা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সাহিত্যিক যদি নিজেকে জানেন, তবে তাহার আত্ম-জ্ঞানের মধ্য দিয়াই সর্ব্বজনপরিচিতি সম্ভব হইবে। এই জন্য বলা হয়, একান্ত ব্যক্তিগত সাহিত্যই একান্তভাবে সর্ব্বজনীন (*Universal*)। কথা এই যে, যে-সাহিত্যিকের অনুভূতিতে আন্তরিকতা আছে, যাহার আত্ম-বোধে ফাঁকি নাই, তাঁহার পক্ষে সর্ব্বজনীন সাহিত্য সৃষ্টি করা অসম্ভব নয়। মনে করুন, আপনাকে একটি গরু আঁকিতে বলা হইল। আপনি হয়তো পারিতেছেন না। কেন?—আমি বলি, আপনি অনেক গরু দেখিয়াছেন সত্য, কিন্তু একটি গরুও ভাল করিয়া, সত্য করিয়া দেখেন নাই; দেখিলে আঁকিতে পারিতেন; এবং একটি গরু আঁকিতে পারিলেই যাবতীয় গরু সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান বা সত্য-দৃষ্টি সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিবে না। একটি সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান নাই, তাই বহুকে আপনি উপলব্ধি করিতে পারেন না। সুতরাং দেখা যায় যে, একটি সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান-দৃষ্টি থাকিলে, একের মধ্য দিয়াই বহুর সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। একান্ত ব্যক্তি-নিষ্ঠ সাহিত্যিকের হৃদয়-বাণীও তখন

ব্যক্তি-কথা না হইয়া বিশ্বের সকলের কথা হইয়া দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথ যখন মিলন-পিপাসু প্রেমিকের নিভৃত কামনাকে ভাষা-চিত্র দেন—

এমন্ দিনে তারে বলা যায়,
এমন্ ঘন ঘোর বরিষায়।
এমন্ মেঘস্বরে বাদল ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়।

* * *

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব।
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব
আঁধারে মিশে গেছে আর সব।

তখন উহার মধ্যে নিখিল-হৃদয় আত্ম-দর্শন করিয়া মুগ্ধ হয়। সুতরাং বলা যাইতে পারে, ব্যক্তি-বিশেষে যাহার আরম্ভ, ব্যক্তি-নির্ব্বিশেষে তাহার পরিণতি। রবীন্দ্রনাথের 'বালিকাবধূ' নামধেয় রূপক কবিতাটি নিখিল মানবহৃদয়ের নিগূঢ় আধ্যাত্মিকতাবোধের চিত্র। কিন্তু এইরূপ একটি কবিতায়ও কবি অতি পরিচিত একটি বিশেষ নারী প্রতিমার মধ্য দিয়াই নির্ব্বিশেষ রসব্যঞ্জনার সৃষ্টি করিয়াছেন। Browning তাঁহার *The Last Ride Together* কবিতায় প্রেমিক-প্রেমিকার ক্ষণ-মিলনের বিশেষ মুহূর্ত্তটিকে নির্ব্বিশেষের ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত করিয়াছেন। এই নির্ব্বিশেষের ভাব (*Universal Element*) না থাকিলে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্ট হয় না।

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের রূপ-সৃষ্টির পশ্চাতে 'mighty sense of experience' থাকে। এই অভিজ্ঞতাকে বিশোধন করিয়া তিনি তাঁহার কাব্যে সমগ্র জীবনের আলেখ্য অঙ্কন করেন। সমগ্রতার চিত্র যাহার কাব্যে নাই, তাহার সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিও অসার্থক, ব্যাহত, অপরিপুষ্ট ও বিকলাঙ্গ। অবশ্য, সমগ্রকে দেখিতে হইলে সাহিত্যিকের দৃষ্টির প্রসার ও আত্মস্থতা থাকা বাঞ্ছনীয়। একটী উদাহরণ দিতেছি। মনে

সাহিত্যিকের অখণ্ড দৃষ্টি

করুন, পথ চলিতে অন্ধকারে সহসা আপনি একটী ভীষণদর্শন ব্যাঘ্রের সম্মুখীন

হইয়াছেন। আপনি ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া কোথাও আশ্রয় গ্রহণ করিলে, যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনি কী দেখিয়াছেন, আপনি তখন ভীত -কম্পিত স্বরে উত্তর দেন, 'একটা ভীষণ—প্র-কা-গু বাঘ—ভয়ঙ্কর!' ইহা অপেক্ষা বেশি কিছু বলা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য আপনি তখন এত উদ্বিগ্ন ছিলেন যে, বাঘটাকে সমগ্রতায় দেখিতে পারেন নাই। কাজেই আপনার রূপ-বর্ণনার মধ্যে অখণ্ড সৌন্দর্য্য-বোধ নাই। কিন্তু এই বাঘটাকেই যদি আপনি পশুশালায় সুরক্ষিত অবস্থায় দেখেন, তবে আপনি তাহার অনতিদূরে দাঁড়াইয়া তাহার বর্ণ-বৈচিত্র্য সম্পূর্ণ নির্ভয়ে নিরীক্ষণ করিতে পারেন এবং Blakeএর মত বলিতে পারেন—

Tiger ! tiger ! burning bright,
In the forests of the night.

কেন?—যেহেতু, আপনি এখন আত্মরক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত। সুতরাং বাঘটাকে এখন আপনি সমগ্রভাবে দেখিতেও পারেন, এবং ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ বর্ণনাও করিতে পারেন। সঞ্জীবচন্দ্রের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনাটি তাহার দূর-সংস্থিত অখণ্ড দৃষ্টির পরিচয় প্রদান করে—

'প্রাঙ্গনের এক পার্শে ব্যাঘ্র নিরীহ ভালোমানুষের ন্যায় চোখ বুজিয়া আছে; মুখের নিকট সুন্দর নখর সংযুক্ত একটি থাবা দর্পণের ন্যায় ধরিয়া নিদ্রা যাইতেছে। বোধ হয়, নিদ্রার পূর্বে থাবাটি একবার চাটিযাছিল।'

বলা বাহুল্য, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক যখন আত্মভাবনা-বিমুক্ত হইতে পারেন, তখনই তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যে জীবন ও জগতের সমগ্র রূপ প্রতিফলিত হইয়া থাকে। তেমন একটি ভাব-দৃষ্টিই Blake বা সঞ্জীবচন্দ্রের বর্ণনাকে অনন্যসাধারণ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'অন্তরের জিনিষকে বাহিরের, ভাবের জিনিষকে ভাষার, নিজের জিনিষকে বিশ্বমানবের ও ক্ষণকালের জিনিষকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ'। সাহিত্য জগৎ ও জীবনকে সুন্দর করিয়া এবং কোন কোন সময় সত্যকে আমাদের কাছে গোচর বা প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দদান করে। কবিকঙ্কনের ভাঁড়ু দত্ত যে-অপূর্ব্ব

সাহিত্যের উদ্দেশ্য

রসমূর্ত্তিতে আমাদের কাছে প্রকাশিত, তাহাতেই সে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রত্যক্ষতা-বোধ সৃষ্টিতে সাহিত্যের সামগ্রীব বহির্গত সৌন্দর্য্যের প্রশ্ন ওঠে না। সৌন্দর্য্য বলিতে এইখানে আমরা বিভিন্ন সামগ্রীর রূপ-সৌষম্য বুঝি। কোন্দল-পরায়ণা স্বার্থান্ধ কৈকেয়ী নিজের মাহাত্ম্যেই স্পষ্ট; লেডী ম্যাক্‌ব্যাথ বা শূর্পনখা ব্যক্তি-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যেই প্রোজ্জ্বল—ইহারা আরও ভাল বা অপেক্ষাকৃত নীচ হইলে ইহাদের অস্তিত্বই থাকিত না। তেমনি শকুনি বা ইয়াগো বা পরমকরুণাময়-বিলাসী ভণ্ড রাসবিহারী—ইহারা সকলেই নিজেদের আত্মমহিমায় আমাদের কাছে গোচরীভূত। ইহারা আমাদের অত্যন্ত পরিচিত। সাহিত্য এইভাবে মানুষ, প্রকৃতি বা কোন ভাবনা-চিন্তাকে আমাদের কাছে নিঃসংশয়িত রূপে সত্য করিয়া তোলে।

সাহিত্যকে যাহারা অবসর বিনোদনেব উপায বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা মনে করেন, ইহা ***Escapism*** বা পলায়নী-মনোবৃত্তির অবলম্বন মাত্র। তাঁহারা একটু গভীর করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, নিছক পলায়নী মনোবৃত্তি পরিপোষক সাহিত্যেও **Escape *from* life**-এর কামনার সঙ্গে **Escape *into* life**-এর সুস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা আছে। কারণ, এইধরণের সাহিত্যিকও নিজেকে দূর-সংস্থিত করিয়াই, জীবনের জটিলতা হইতে দূরে গিয়াই, জীবনকে দেখিবার চেষ্টা করেন। মানুষের জীবনের দুঃখ-বেদনা, হাসি-অশ্রু ও বিচিত্র সমস্যা যে সাহিত্যের উপকরণ, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কিন্তু সাহিত্যিক যখন সৃষ্টি করেন, তখন জীবনের নিগূঢ় রহস্য তাহাকে উদ্বুদ্ধ করে; তিনি সকলের সহিত নিজেকে যুক্ত রাখিয়া, প্রেমের দ্বারা, প্রীতির দ্বারা মানুষকে গ্রহণ করিয়া, তাঁহার সৃষ্টিকে রূপময় করিয়া তোলেন। আবার, জীবনের সহিত তিনি যুক্ত থাকিয়াও বিযুক্ত, কারণ বিযুক্ত না হইলে তিনি আবার জীবনের অপরূপকে নয়ন ভরিয়া দেখিতে পারেন না। নিজের ব্যক্তি-কথা যদি বৃহত্তর জীবন-কথাকে ছোট করিয়া জানিবার স্পর্দ্ধা রাখে, তবে উচ্চতরের সৃষ্টি হইতে পারে না। কাজেই 'দূরে গিয়া দেখা' বলিতে আমরা সাহিত্যিকের দূর-সংস্থিত ভাবে জীবনের

অভিজ্ঞতাকেই বুঝাইতে চাই। ইহা জীবন-সমস্যা হইতে পলায়ন নয়, ইহা জীবনকে জানিবার উপায়ন্তর বিশেষ।

আধুনিক কালে কথা উঠিয়াছে, সাহিত্য ও শিল্পকে সর্ব্বসাধারণের উপযোগী করিয়া দাও। এই প্রশ্নের উত্তর আমরা কথা-সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় দিতেছি। তিনি বলেন—

'সাহিত্য ও শিল্পকে সর্ব্বসাধারণের উপযুক্ত করে দাও—এই একটি আধুনিক ধূয়ার কোন মানে হয় না। এ কথার অর্থ তো এই যে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যেব রস অত্যন্ত ঘন, একে খানিকটা জোলো করে দাও, এর শিল্পের বুননীতে অত সূক্ষ্ম তন্তুর বদলে মোটা দড়ির ব্যবহার প্রচলিত কর। কাবণ, তা হ'লে তখন শিক্ষা ও শক্তি-নির্ব্বিশেষে এ সাহিত্য যাবতীয় জনেরই হয়ে উঠবে, রসের মন্দিরে ভিড়ের আর কমতি থাকবে না। আমাদের বক্তব্য এই যে, এ রকম কোন আদর্শের উপর যদি জোর দেওয়া হয়, তবে সাহিত্যের সর্ব্বনাশ করা হবে, এবং যাদের দিকে চেয়ে সাহিত্যে এই ভুয়ো গণতন্ত্রের সুর আমদানীব জন্য আমরা এ কবতে যাব, তাদেরও শেষ পর্য্যন্ত উপকার কিছু হবে না। রস-সাহিত্যের উপভোগ সামর্থ্যের দিক দিয়ে যারা 'হরিজন', সাহিত্যকেও জোর করে 'হরিজন'-মার্কা করে তাদের স্তরে না নামিয়ে উক্তরূপ তথাকথিত 'হরিজন'দের আর্ট ও সংস্কৃতিগত শিক্ষার এমন সুযোগ ও সাহায্য দিতে হবে, যাতে করে তারা মনের দিক দিয়ে ক্রমশঃ উঠে আসতে পারে, সূক্ষ্মতম রসের স্বাদগ্রহণে পারগ হয়। যেমন ধর্ম্মের ক্ষেত্রে, তেমনি এক্ষেত্রেও অধিকারী-ভেদ মানতে হয়। বাস্তবিক পক্ষেও আমরা দেখতে পাই যে, চিন্তামূলক বা সৌন্দর্য্যমূলক সত্য, ইন্দ্রিয়জ বা অতীন্দ্রিয় রসের আবেদন, অথবা একই শ্রেষ্ঠ কাব্য উপন্যাস বা নাটক, জন্মগত ক্ষমতা তথা অনুশীলনবৃত্তির চর্চ্চাভেদে বিভিন্ন পাঠকের মনে—প্রধানতঃ 'ইন্‌টেন্‌সিটি'র দিক দিয়ে—বিভিন্ন রকমের সাড়া জাগায়। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে, সাহিত্যের যে একটি স্বাভাবিক আভিজাত্য আছে, এমন কিছু না করা—যাতে তা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়, পরন্তু আমাদের সবাইকে তার উপযুক্ত হতে শিক্ষিত করা।'

আমাদেরও বক্তব্য এই যে, সাহিত্যিক রচনা হইতে বিভিন্ন মনোবৃত্তি, শিক্ষা, দীক্ষা, পারিপার্শ্বিক ও সংস্কৃতি-সম্পন্ন জনগণ বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করুক, ইহাতে আপত্তি করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে কোন সামাজিক, নৈতিক বা রাষ্ট্রিক শিক্ষাদান বা মতবাদ প্রচার করা সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়। যে-সাহিত্যে মতবাদ প্রচার উগ্র হইয়া উঠিয়াছে, তাহা রসসৃষ্টি বা শিল্পকর্ম্ম হিসাবে ব্যর্থ হইয়াছে।* রবীন্দ্রনাথও বলেন, 'মত জিনিষটা হচ্ছে সৃষ্টির ক্ষেত্রে জীবদেহের অন্তর্গত কঙ্কালের মত। ওটা ভিতর থেকেই সাহিত্যকে যোগাবে মাথা তুলে দাঁড়ানোর শক্তি, বাইরে থেকে প্রকাশ পাবে তার বিচিত্র দেহ-সৌষ্ঠব, তার লাবণ্য।...কোন বিশেষ মতবাদের কাছে শিল্পী যদি দাসখৎ লিখে দিয়ে বসেন, তাহলে পক্ষপাতের কুয়াসায় তার সত্যদৃষ্টি হবে বাধাগ্রস্ত। তাঁর সাহিত্যও হবে সত্যভ্রষ্ট। এইজন্যই সাহিত্যের যা সত্য, তা কোন বিশেষ আমলের রাজনৈতিক প্রোপাগাণ্ডার লেজুড় ধরে চল্‌তে পারেনা'।

---

* Warren & Welleck বলেন—The reduction of a work of art to a doctrinal statement...is disastrous to understanding the uniqueness of a work : it disintegrates its structures and imposes alien criteria of value.

—*Theory of Art, p. 108*

কবিতা

এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, আদি কবি বাল্মীকির ক্রৌঞ্চমিথুন-বিয়োগজনিত শোকই শ্লোক রূপে উৎসারিত হইয়াছিল। সহচরী-বিয়োগ-কাতর ক্রৌঞ্চের বেদনায় কবির চিত্তে বেদনার সঞ্চার হয়। এই বেদনা হইতেই সহসা 'পরিপূর্ণ বাণীর সঙ্গীত' জন্মগ্রহণ করিয়া অপূর্ব্ব ছন্দে কবি-কণ্ঠে উচ্চারিত হইল—

কবি ও কবিতার জন্ম

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

কবির এই বেদনা-বোধ স্বকীয় দুঃখ-সন্তপ্ত চিত্তের অবস্থা নহে; ইহার মধ্যে তদ্গত চিত্তের আত্ম-প্রকাশের আনন্দ-বেদনা আছে। এই---

........অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয়, তা'র বক্ষে বেদনা অপার,
তা'র নিত্য জাগরণ; অগ্নিসম দেবতার দান
ঊর্দ্ধশিখা জ্বালি' চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।

সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, কবির বেদনা-বিদ্ধ হৃদযই কবিতার জন্ম-ভূমি। অর্থাৎ, সময়-বিশেষে কোন একটি বিশেষ সূত্রকে অবলম্বন করিয়া কবির আনন্দ-বেদনা যখন প্রকাশের পথ পায়, তখনই কবিতার জন্ম। কবি বেদনাকে আস্বাদ্যমান রস-মূর্ত্তি দান করেন। ব্যক্তিগত বেদনার বিষপুষ্প হইতে কবি যখন কল্পনার সাহায্যে আনন্দমধু আস্বাদন করিতে পারেন, তখন বেদনা পর্য্যন্ত রূপান্তরিত ও সুন্দর হইয়া উঠে। বেদনার যিনি ভোক্তা, তাঁহাকে উহার দ্রষ্টা না

হইতে পারিলে তাঁহার দ্বারা কাব্য-সৃষ্টি সম্ভব নয়। কবির বেদনা-অনুভূতির এই রূপান্তর-ক্রিয়া সম্বন্ধে ক্রোচে বলেন—

Poetic idealisation is not a frivolous embellishment, but a profound penetration in virtue of which we pass from troublous emotion to the serenity of contemplation.

আসল কথা এই যে, বাহিরের জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ বা আপন মনের ভাবনা-কল্পনাকে যে-লেখক অনুভূতি-স্নিগ্ধ ছন্দোবদ্ধ ও শিল্প-সঙ্গত তনু-শ্রী দান করিতে পারেন, তাহাকেই আমরা কবি নামে বিশেষিত করি।

অনেকে বলেন যে, যিনি জগতের একখানি যথাযথ স্বাভাবিক চিত্রপট আঁকিয়া দিতে পারেন, তিনিই যথার্থ কবি। অর্থাৎ কবি জগতের ভালোমন্দের যথাযথ চিত্র অঙ্কন করিবেন। যাহারা তথাকথিত বাস্তব সাহিত্যপ্রিয় এবং যাহারা কবি-কল্পনার দ্বারা প্রবঞ্চিত হইতে চাহেন না, তাহারা এইরূপ মত পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু, কাব্যাদর্শ বাস্তবাদর্শ হইতে বিভিন্ন, ইহা ভুলিলে চলিবে না। কাব্যের জগৎ বাস্তব-জগতের যথাযথ চিত্র নয়, বরং ইহা একপ্রকার স্ব-প্রতিষ্ঠ, স্বয়ম্বশ, অখণ্ড জগৎ।

কবিতা কাহাকে বলে

Coleridge বলেন, অপরিহার্য্য শব্দের অবশ্যম্ভাবী বাণী-বিন্যাসই কবিতা*। 'অপরিহার্য্য শব্দ' কাহাকে বলে? এবং শব্দ-ই বা কি? 'শব্দ' ভাব-কল্পনা ও অর্থ-ব্যঞ্জনার বাহন। কালিদাস বলেন, বাগার্থাবিব সম্পৃক্তৌ—শব্দও অর্থের সম্বন্ধ নিত্যকালের। এইরূপ অসংখ্য শব্দ যখন কবির লেখনী-মুখে ভিড় করিয়া

---

*নিম্নে কবিতার কয়েকটি বিখ্যাত সংজ্ঞা দেওয়া হইল:—

(১) Best words in the best order—*Coleridge.*

(২) Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings—*Wordsworth.*

(৩) Poetry is at bottom a criticism of life under the conditions fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty—*Matthew Arnold.*

আসে, তন্মধ্যে একটি মাত্র যথাযথ শব্দই কবিতায় ব্যবহারোপযোগী 'অপরিহার্য্য' শব্দ ; এই জাতীয় শব্দ লেখকের কল্পনা বা অনুভূতি-স্নিগ্ধ অন্তর হইতে স্বতঃ-উৎসারিত বলিয়া ভাবপ্রকাশের পক্ষে ইহা একান্ত উপযোগী। আবার, এই শব্দকে রসাত্মক বাণী-মূর্ত্তি দান করিবার জন্য কবি বস্তু-উপাদানের উপরে কল্পনার দীপ্তি—

The light that never was, on sea or land
The consecration, and the Poet's dream—

প্রতিফলিত করেন। 'অবশ্যম্ভাবী বাণী-বিন্যাস' বলিতে বুঝা যায় যে, অযত্ন-বিন্যস্ত শব্দে কবিতা হয় না। এইখানেই কবিতায় ছন্দের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে হয়। অপরিহার্য্য শব্দ যথাবিন্যস্ত হইলেই তাহাদের মধ্যে চিত্রগুণ ও প্রবাহের সৃষ্টি হয় এবং শব্দসমূহ তখন রসাত্মক বাক্যে সমর্পিত হইয়া অবশ্যম্ভাবী ছন্দোময় রূপ লাভ করে। সুতরাং দেখা যায়, মানবমনের ভাবনা-কল্পনা যখন অনুভূতি-রঞ্জিত যথাবিহিত শব্দ-সম্ভারে বাস্তব সুষমা-মণ্ডিত চিত্রাত্মক ও ছন্দোময় রূপ লাভ করে, তখনই উহার নাম **কবিতা**। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন—

অন্তর হ'তে আহরি বচন,
আনন্দলোক করি বিরচন
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
সংসার-ধূলিজালে

—তখন তিনি কবিতার জন্ম-কথা ও উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রবীন্দ্র-নাথের উক্তি হইতে উপলব্ধি হইবে যে, কবি নিজের অন্তর হইতে 'বচন', কথা বা শব্দ-সম্ভার সংগ্রহ করিয়া আনন্দ-লোক সৃষ্টি করেন। কি উদ্দেশ্যে ?—না, সংসারের অভাব, অভিযোগ, দুঃখ, দৈন্য, কুশ্রীতা প্রভৃতির উপর গীত-রস সিঞ্চন

---

(৪) Poetry is the nascent self-consciousness of man, not as an individual but as a sharer with others of a whole world of common emotion—*Caudwell.*

(৫) কাব্যলক্ষ্মীর সঙ্গে আত্মার রতিসুখ-সম্ভোগকালে রস-মূর্চ্ছিত মানবের দিব্য-ভাববিধুর গদগদ-ভাবই কবিতা—(মোহিতলাল)

করিয়া উহাদিগকে আরও উজ্জ্বল করিবার জন্য। কবি-কল্পনায় বাস্তবের এই নব-জন্মদানকে লক্ষ্য করিয়াই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

নবীন আষাঢ়ে রচি' নব মায়া
একে দিয়ে যাব ঘনতর ছায়া,
করে দিয়ে যাব বসন্তকায়া
বাসন্তীবাসপরা।

ধরণীর তলে, গগনের গায়,
সাগরের জলে অরণ্য ছায়
আরেকটু খানি নবীন আভায়
রঙিন করিয়া দিব।

এবং ইহার ফলে—

সুখহাসি আরো হবে উজ্জ্বল,
সুন্দর হবে নয়নের জল,
স্নেহসুধামাখা বাসগৃহতল
আরো আপনার হবে।

কবি-কল্পনা
ও
খেয়ালী-কল্পনা

কবি কল্পনা-বলে অন্তর হইতে 'বচন' আহরণ করিয়া অতি-সাধারণকে অসাধারণ সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেন এবং যাহা শুধু ভাবময় ও বিদেহী, তাহাকে শরীরী বা রূপময় করিয়া তোলেন। কাব্যের এই যে রূপময়তা বা রূপ-বন্ধ (*Form*) ইহা কোন বস্তুগত পরিমেয় সত্তা নয়। কোন কাব্য বা সঙ্গীত বা চিত্র দেখিয়া যখন আমাদের চিত্তের উদ্বোধন হয়, আমাদের ভাব-কল্পনা উদ্রিক্ত হয়, তখন বুঝিতে হইবে, ইহার রূপ আছে। এই জন্যই জনৈক সমালোচক বলেন, 'We can know, as experience, a piece of music, a picture, or a poem to be a work of art in no other way than by reacting emotionally towards it'.

এখন প্রশ্ন হইল, **কল্পনা** কাহাকে বলে? ইংরেজীতে ইহাকে *Imagination* বলে, এবং ইহার অর্থ কবি-প্রতিভার সেই শক্তি, যাহার বলে কবি স্বকীয় মানসরসে সঞ্জীবিত চিত্রাত্মক কোন ভাব-কল্প সৃষ্টি করিতে পারেন। ইংরাজীতে

ইহার অনুরূপ আর একটি শব্দ আছে—*Fancy** ইহাকে আমরা খেয়ালী-কল্পনা বলিতে পারি। যদিও ধাতুগত অর্থের দিক হইতে উহারা বিভিন্ন নয়, তথাপি *Fancy* বলিতে আমরা নিম্ন স্তরের কল্পনাকে বুঝি। *Fancy* বলিতে আমরা সাধারণতঃ কৌতুকাবহ, চটুল, লঘু, খণ্ড-বিচ্ছিন্ন কল্পনাকে বুঝি, যাহার পশ্চাতে বিশেষ বাস্তববোধ নাই; Imagination অনেক উচ্চস্তরের বস্তু—ইহা যে রূপ-কল্পের সৃষ্টি করে, তাহার পশ্চাতে অনুভূতি-স্নিগ্ধ ভাব-বাস্তবতা থাকিবেই। Shakespeare-এর—

"You are now sailed into the north of my lady's opinion where you will hang like an icicle on a Dutchman's beard" (*Twelfth Night*)—খেয়ালী-কল্পনা, কিন্তু Coleridge-এর—

Silent icicles
Quietly shining to the quiet moon, কল্পনার উদাহরণ।

রবীন্দ্রনাথের—

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে—
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি-সৌরভ রভসে
ঘন গৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যাম গম্ভীর সরসা

কল্পনার উদাহরণ, কিন্তু মোহিতলালের—

দোপাটি ফুল—চুটকি পায়ের,
সন্ধ্যামণির নাকছবি,
গোট পরেছে অপরাজিতার,

কুন্দকলির সাতনরী হার,
আঁচল-খুঁটে বিংটা-ভরা
কৃষ্ণকলির লাল চাবি।

---

* Fancy is childlike and sportive. She chases butterflies, while her sister (Imagination) takes flight with angel—*L. Hunt*

অথবা, সত্যেন দত্তের—

আজি দলে দলে গিরিসভাতলে
মেঘ জুটিয়াছে যত
প্রমথনাথেরে ঘিরিয়া ফিরিছে
প্রমথ দলের মত।

—নেহাৎ খেয়ালী-কল্পনা।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ কবি-কল্পনা অর্থে 'কবি-ব্যাপার' 'কবি-কৌশল' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিলেও 'কল্পনা' শব্দটি ব্যবহার করেন নাই। তাই ডাঃ সুশীল দে বলেন—

The Indian theorists have almost neglected an important part of their task, to find a definition of the nature of the subject of a poem as the *product of the poet's mind*; this problem is the main issue of Western Æsthetics.*

কবির এই যে কল্পনা-শক্তি, ইহাকে আলঙ্কারিকগণ 'নৈসর্গিকী' ও 'সহজা' নামে অভিহিত করিয়াছেন; অভিনবগুপ্ত এই 'অপূর্ব্ব বস্তু নির্ম্মাণক্ষম' শক্তিকে 'প্রজ্ঞা' বলিয়াছেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ কাব্য-বিচারে কবিমানসের প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই—তাহাদের কাব্য-জিজ্ঞাসা রসবাদের নির্ব্বিশেষ গৌরব লাভ করিয়াছে। 'রস' কাব্যবিচারে 'সকল প্রয়োজন মৌলীভূতং' হইলেও, সেই রসস্রষ্টার কবি-মানসের যে-দৃষ্টি কাব্যবস্তুকে বিশেষ হইতে নির্ব্বিশেষের কোঠায় পৌঁছাইয়া দেয়, সেই শক্তির ব্যাখ্যা অপ্রধান হইলে কাব্যবিচার একদেশিক হইয়া পড়ে এবং কাব্যানুভূতি রসাবেশ-স্নিগ্ধ এমনই একটি নিরঞ্জন তুরীয় ভাবানুভূতিতে পর্য্যবসিত হয় যে, তখন পাঠকের জীবনবোধ পর্য্যন্ত যেন কোথায় মিলাইয়া যায়। ফলে, সাহিত্য নিছক রসবাদের চর্চ্চায় কবি-মানস-বিচ্যুত হইয়া স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া পড়ে।

কিন্তু আধুনিক কাব্য-জিজ্ঞাসায় আমরা কাব্যের বিষয়বস্তু ও কবিমানসকে অপ্রধান বলিয়া ভাবিতে পারিনা। সংস্কৃত আলঙ্কারিক যেখানে বিশেষ কতকগুলি

* Sanskrit Poetics, Vol. II

নিয়মনির্দ্ধারিত ছাঁচে ঢালিয়া সুনির্দ্দিষ্ট ছক-কাটা কাব্য-রূপ সৃষ্টি করিতে পারিলেই প্রশংসনীয় মনে করিতেন, আমরা তাহা মনে করিনা। আমরা বরং মনে করি, বিশিষ্ট কবি-প্রতিভা বিশিষ্ট কল্পনা বলে বিশিষ্ট সাহিত্য-রূপ সৃষ্টি করে। অর্থাৎ বিষয়বস্তুকে পরিবেশন করিবার কবি-দৃষ্টি বিশেষভাবেই বিশেষ, এবং বিশেষ হইযাই নির্ব্বিশেষ। সাহিত্যে ও কাব্যে বিষয়বস্তু অপেক্ষা উহার বিশিষ্ট রূপসাধনাই অধিকতর গৌরবেব দাবী করিতে পারে, ইহা কে অস্বীকার করিবে? এই বিশিষ্ট রূপসৃষ্টি একমাত্র কবি-কল্পনা বলেই সম্ভব। ইহাই **সৃজনী-কল্পনা** (*Creative Imagination*).

এই সৃজনী-কল্পনা সত্যই 'অঘটনঘটন পটিয়সী'। ইহার সাহায্যে Wordsworth দৈনন্দিন জীবনের দীনতম ঘটনা বা বস্তুকে অভাবিত সৌন্দর্য্য-দীপ্তি দান করেন, Coleridge অবিশ্বাস্য ভাব-কল্পনাকে সত্য করিয়া প্রত্যক্ষ করেন ও করান, Shelley অবাস্তবকে দুঃসাহসিক বাস্তবতার ঐশ্বর্য্যে মনোরম করিযা তোলেন, রবীন্দ্রনাথ নিরবয়ব আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে মানবরসে সঞ্জীবিত কবেন। এতদ্ব্যতীত, অনেক সময কবি একটি মাত্র শব্দ, উপমা, কাব্যোক্তি বা ভাষাচিত্রের সাহায্যে অপূর্ব্ব কল্পনা-দ্যুতি বিকীর্ণ করেন। মধুসূদন যখন বলেন—

কৌস্তুভরতন যথা মাধবেব বুকে

অথবা রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন—

অচ্ছোদ সরসীনীরে রমণী যেদিন
নামিলা স্নানের তরে—

অথবা Keats যখন বলেন—

Beaded bubbles winking at the brim,

তখন যেন প্রথমটির শব্দমাহাত্ম্যে ও চিত্রাত্মকতায়, দ্বিতীয়টির কাব্যোক্তি-মাধুর্য্যে, (allusion) তৃতীয়টির রূপ-বিহ্বলতায পাঠকের মনে কবি আগুন ধরাইয়া দেন।

উৎকৃষ্ট সৃজনী কল্পনা—

> "শব্দ-বন্ধে ছন্দ-স্পন্দে, রূপ দেয় চঞ্চল তরঙ্গে,
> ছায়ারে দানিছে কায়া শূন্য হতে টানিয়া সবলে,
> সুসম্পূর্ণ করি তারে সুডৌল সুন্দর অবয়বে. . . ." †

এই কল্পনার বলেই কবি জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা আমাদের নিকট উপস্থাপিত করেন। 'আমরা যাহা দেখি নাই, তাহা তাঁহার অনুগ্রহে বুঝিতে পারি। কবি অনেক স্থলে আমাদের চক্ষু ফুটাইয়া দেন; কুত্রাপি আমাদের চোখের উপর যদি কোন ময়লার আবরণ জন্মিয়া থাকে, তাহা মুছাইয়া দেন; কুত্রাপি বা চোখের উপর একখানা চশমা বা দূরবীণ এইরূপ একটা কিছু যন্ত্র ধরিয়া দেন। এই হিসাবে কবি একরকম ডাক্তার।...যাহার রঙ দেখিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, তিনি তাহাকে রঙ দেখিবার সামর্থ্য দিয়া অনুগৃহীত করেন।'*

কোল্‌রিজের মতে, কবির সজ্ঞান চিন্ময়াবস্থা (consciousness) কাছের ও দূরের, নিত্য ও অনিত্যের, বিশেষ ও নির্ব্বিশেষের, বাস্তব ও অবাস্তবের, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয়ের, বিশ্বাস্য ও অবিশ্বাস্যের, তথ্য ও সত্যের, ক্ষণকাল ও চিরকালের, বাস্তব আদর্শের ভাব বা বস্তুসত্তাকে চাক্ষুষ করিয়া রূপের সাহায্যে পাঠকের মনে উহার অনুরূপ ভাব-ব্যঞ্জনা সঞ্চার করিতে পারে। বিশ্বজগতের রূপ-বৈচিত্র্য অনন্ত ভগবানের চিত্ত-বিক্ষেপ মাত্র—যিনি অরূপ, তিনি রূপে রূপে আপনাকে বিলসিত করিয়া দিয়াছেন। কবিও সেই অপূর্ব্ব বিচিত্র সৃষ্টির ভাগবতী মহিমা স্বকীয় চিত্তের আলোকে প্রস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। এই শক্তি যেন সত্যই এক শ্রেণীর ব্রাহ্মী প্রতিভা—'a repetition of the finite mind of the eternal act of creation in the *infinite I am*', ইহারই সাহায্যে কবি একটি অখণ্ড চেতনা বা দৃষ্টি-বিধৃত সৌন্দর্য্য-মণ্ডল সৃষ্টি করিতে পারেন। এই শ্রেণীর যে-কল্পনা—যে-'beautiful and beauty-making power'—

---

† শ্রীমোহিতলাল মজুমদার : স্মর-গরল

* সমালোচনা-সংগ্রহ (*C. U.*)

দ্রষ্টা ও দৃশ্য বস্তর মিলন সংসাধন করে, যাহা কবির চিদাকাশ হইতে জ্যোতির্ম্ময় আলোর মত বিকীর্ণ হইয়া তাহাকে দূর-সংস্থিত ভাবকল্পনার সহিত তাহার অভিন্নতা সৃষ্টি করে, যাহার প্রভাবে কবি 'traces the parts, and their relation to each other, and to the whole', তাহাকে কোল্‌রিজ *Esemplastic Imagination*—নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইহা সেই কবি-প্রতিভা যাহা 'tends to objectize itself and to know itself in the object'। বলা বাহুল্য, ইহা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, কবি ও কাব্যসামগ্রী উভয়ের মধ্যে সেতু নির্ম্মাণ করিয়া উভযের অখণ্ড ঐক্য সংবিধান করে।

কবিতা নিরাভরণা নয়। নারী যেমন আকার-ইঙ্গিতে, সাজসজ্জায়, বিলাসে-প্রসাধনে আপনাকে মনোরমা করিয়া তোলে, কবিতাও তেমনি শব্দে, সঙ্গীতে, উপমায়, চিত্রে ও অনুভূতির নিবিড়তায় নিজেকে প্রকাশিত করে। নীতিপ্রচার, শিক্ষাদান বা রাজনীতি বা সমাজনীতি প্রচার কাব্যের উদ্দেশ্য নয়। জীবনের সুখদুঃখ পাপপুণ্য ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রভৃতি যে কোন বিষয়ই কাব্যের উপাদান বা অঙ্গ হিসাবে গৃহীত হইতে পারে—কিন্তু ইহারা যেন কাব্যাত্মার দেহ মাত্র। শ্রেষ্ঠ কাব্য পাঠে পাঠক জীবনের যে কোন জিজ্ঞাসা—সামাজিক, আর্থিক, নৈতিক—সম্বন্ধে গৌণভাবে অবহিত হইতে পারেন। কিন্তু সৎকাব্য কখনও সাক্ষাৎভাবে কোন সমস্যা সমাধান করিতে বসে না। এই সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরচরিত আলোচনা প্রসঙ্গে যাহা বলেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

কবিতাব উদ্দেশ্য

> কাব্যেব উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে।...কবিরা জগতেব শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতি ব্যাখ্যার দ্বাবা তাহারা শিক্ষা দেন না। তাহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতেব চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কাব্যের উদ্দেশ্য জগত ও জীবনের রহস্যকে সুন্দর করিয়া, রসস্নিগ্ধ করিয়া উপস্থাপিত করা। এইজন্য কবির কাছে সৌন্দর্য্যই পরম সত্যরূপে পরিগণিত এবং যাহা কল্পনায় তিনি সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ করেন, উহাই সুন্দর। এই সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই কাব্যের উদ্দেশ্য।

কাব্য-প্রসঙ্গে ম্যথু আর্ণল্ডের কবিতার সংজ্ঞাটি ভাবিয়া দেখা দরকার। তিনি বলেন যে, কবিতা মূলতঃ জীবন-দীপিকা (*Criticism of life*) বা জীবন-জিজ্ঞাসা। তাঁহার মতে শ্রেষ্ঠ কবিতা পাঠে পাঠক কবির সুগভীর আন্তরিকতা ও বিষয়-তন্ময়তায় প্রবুদ্ধ হয়। কাব্যের বিষয়-বস্তু কাব্য-সত্যে ও কাব্য-সৌন্দর্য্যে পরিবেশিত হইয়া এমনভাবে উপস্থাপিত হইবে, যেন পাঠক কবির সুগভীর আন্তরিকতা ও বিষয়-তন্ময়তায় সন্দেহ প্রকাশ করিতে না পারে। তিনি আরও বলিতে চাহেন যে, কবি বা ঔপন্যাসিক আদর্শ-গত জীবনালেখ্য চিত্রিত করিয়া বাস্তব জীবনের সহিত তুলনা করিবার এমন ইঙ্গিত দান করিবেন যে, আদর্শগত জীবন ও বাস্তব জীবনের তুলনার সাহায্যে আমরা যেন জীবন ও জগতের সাধারণ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া কাব্যে '*How to live*'—এই গভীর প্রশ্নের উত্তরের ইঙ্গিত পাই। এইভাবে কাব্য আমাদের নিকট জীবন-দীপিকার কাজ করে। শ্রেষ্ঠ কবি জীবনের আদর্শগত চিত্রাঙ্কনের সাহায্যে একদিকে যেমন পাঠকের মনে জীবন-রহস্য আলোকিত করিয়া তোলেন, তেমন আবার কী ভাবে জীবনযাপন করিতে হইবে, এই প্রশ্নের উত্তর দানে সাহায্য করেন।

বলা বাহুল্য, ম্যথু আর্ণল্ড্ কাব্যের প্রকৃতি-নির্ণয়ে কাব্যকে ব্যক্তিগত স্পর্শ হইতে রক্ষা করিয়াও কাব্যে নীতির প্রাধান্যকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু কাব্যবিচারে নীতি-প্রাধান্য স্বীকার করিলে কাব্যকে ছোটই করা হয়—কারণ কাব্যের নীতি ইহার নির্ম্মাণ-নীতি ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না। কাব্য মূলতঃ নীতিবাচকও নয়, নীতিদ্রোহীও নয়, ইহা নীতির ঊর্দ্ধে। কাব্যবিচারে কাব্যের বহির্ভূত কোন নীতিবাদ বা সত্যবোধের মানদণ্ড ব্যবহার চলিতে পারে না। সর্ব্বশেষ কথা এই যে, কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য কাব্য হিসাবে ইহার সার্থকতা—'its fidelity to its own nature'.

গদ্য ও পদ্য

গদ্য ও পদ্য—উভয়ই সাহিত্যের বাহন। সাধারণতঃ কবিতা পদ্যেই লিখিত হয়। মূলতঃ উহাদের মধ্যে কোন বিভিন্নতা আছে বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন না। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ তাঁহার

Lyrical Ballads-এর ভূমিকায় বলিয়াছিলেন যে, গদ্য ও পদ্যের মধ্যে মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই, এবং শেলীও গদ্য ও পদ্যের বিভেদকে অসমীচীন মনে করিতেন। অবশ্য দার্শনিকপ্রবর হেগেলের মত আমরা বলিতে চাই না যে, ছন্দই কবিতার অপরিহার্য্য অঙ্গ (metre is the first and only condition demanded of poetry.)। ছন্দ না থাকিলেও শুধু তাল বা লয় (*Rhythm*) কাব্যদেহকে সৌন্দর্য্যে লীলায়িত করিতে পারে। কিন্তু সাধারণভাবে গদ্য ও পদ্যের বিভেদ সাহিত্যে স্বীকার করা হইয়াছে। ইংরেজ কবি কোল্‌রিজ গদ্য ও পদ্যের পার্থক্য নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, শব্দের সুনিয়ন্ত্রিত বিন্যাসই গদ্য এবং যথোপযোগী শব্দের অবশ্যম্ভাবী বিন্যাসই পদ্য*। শব্দ ভাবের বাহন, শব্দ বাঙ্ময়, শব্দ অর্থসমন্বিত, চিত্রাত্মক ও ব্যঞ্জনাময়। এই শব্দ যখন অনুভূতি-বিগলিত গীতি-মূর্চ্ছনায় সাবলীলস্রোতে অপরিবর্ত্তনীয় ভাষায় আবেগ-কম্পিত হইয়া উঠে, তখনই সাহিত্য পদ্যাত্মক হইয়া উঠে। গদ্য মানুষের ভাবনাচিন্তার সুনির্ব্বাচিত বুদ্ধিনিষ্ঠ প্রকাশ, পদ্য ভাষার অতীত ব্যঞ্জনাত্মক প্রকাশ। গদ্য যাহা বলে, তাহাই বলে, পদ্য যাহা বলে, তাহার বেশি বুঝায়। বর্ষার দিনে আকাশে সঞ্চরণশীল মেঘ-সৌন্দর্য্য দেখিয়া যদি বলি—

ঘন বরষায় আকাশে মেঘ গর্জ্জন করে,

তবে মনের কথাটি যে সাধারণ ভাষাচিত্রে রূপ পাইল, তাহা গদ্য। কিন্তু যদি বলি—

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা—

তখন, কে যেন সেই একই কথার মধ্যে সুরের আগুন ধরাইয়া দিল, ভাব যেন কথায় সমর্পিত হইয়া ক্ষান্ত হয় নাই। প্রকৃতি যেন ঘনবর্ষা সমাগমে কী বলিতে চায়, তাহার সেই অস্পষ্ট নিবেদন যেন আমাদিগকে উন্মন করিয়া তোলে। বলা বাহুল্য, এই জন্যই শ্রেষ্ঠ কবিতাকে গদ্যে পরিণত করিলে তাহার অর্থ পরিস্ফুট হইতে পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনির্ব্বচনীয়তা লোপ পায়—সহসা যেন

**Cf.* Prose is words in their best order, Poetry is the best words in the best order.

সঞ্চরণশীল কাব্য-বিহঙ্গ ছিন্নপক্ষ ও লাঞ্ছিত হইয়া পড়ে। গদ্যে অর্থ ও ব্যঞ্জনা প্রধান বলিয়া কোন বিষয়বস্তু কাহাকেও বুঝাইতে হইলে, ব্যাখ্যা করিতে হইলে বা সেই সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করিতে হইলে, লেখকের পক্ষে গদ্যই সমীচীন বাহন। যে-অর্থে গদ্যকে 'instrument of many stops' বলা হয়, সেই অর্থে পদ্যের ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত সীমায়িত। গদ্য বুঝায় ও জানায়, পদ্য অনুপ্রাণিত করে; গদ্যের জন্ম মস্তিষ্কে, পদ্যের জন্ম হৃদয়ে। গদ্য হাটে, পদ্য উড়ে; গদ্য সাবধানী, পদ্য অসাবধানী; গদ্য জ্ঞান, পদ্য প্রজ্ঞা। এইরূপ বিভেদ সত্ত্বেও গদ্যের ও পদ্যের সীমারেখা যে সুনির্দ্ধারিত নাই, এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে। শরৎচন্দ্র গদ্যেই লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উপন্যাসে গদ্য যেন পদ্যের সুরমাধুর্য্যে কান্ত-কোমল হইয়া উঠিয়াছে; বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরের' গদ্য তাঁহার অপূর্ব্ব কবি-মানস-রসে সিঞ্চিত হইয়া কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের গদ্য সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে বলা যায়, তিনি যেন 'other harmony of prose' আত্মস্থ করিয়া গদ্যকে পর্য্যন্ত কাব্য-মাধুর্য্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের—

আমি কে? আমি কেমন করিয়া উদ্ধার করিব। আমি এই ঘূর্ণ্যমান পরিবর্ত্তমান স্বপ্নপ্রবাহের মধ্য হইতে কোন্ মজ্জমান কামনাসুন্দরীকে তীরে টানিয়া তুলিব! তুমি কবে ছিলে, কোথায় ছিলে হে দিব্যরূপিনী! তুমি কোন্ শীতল উৎসের তীরে খর্জ্জুরকুঞ্জের ছায়ায় কোন্ গৃহহীনা মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে? তোমাকে কোন্ বেদুয়ীন দস্যু বনলতা হইতে পুষ্পকোরকের মত মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া বিদ্যুৎগামী অশ্বের উপর চড়াইয়া জলন্ত বালুকারাশি পার হইয়া কোন্ রাজপুরীর দাসী হাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল?

অথবা **শরৎচন্দ্রের—**

এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত সীমাহীন—তাহা ততই অন্ধকার। অগাধ বারিধি মসীকৃষ্ণ; অগম্য গহন অরণ্যানী আঁধার; সর্ব্বলোকাশ্রয় আলোর

আলো, গতির গতি, জীবনের জীবন, সকল সৌন্দর্য্যের প্রাণ পুরুষও মানুষের চোখে নিবিড় আঁধার'।

অথবা Lamb-এর—

We are not of Alice nor of thee, nor are we children at all. The children of Alice call Bartrum their father. We are nothing ; less than nothing, and dreams. We are only what might have been, and must wait upon the tedious shores of Lethe millions of ages before we have existence and a name.

বহিরঙ্গের দিক হইতে—প্রত্যেকটি উদ্ধৃতি গদ্য। কিন্তু ইহাদের ভাষা যে কবিতার স্তরে উত্তীর্ণ হইয়াছে, ইহা অনস্বীকার্য্য। এই প্রসঙ্গে Sidneyর উক্তি প্রণিধানযোগ্য—

One may be a poet without versing, and a versifier without poetry. অর্থাৎ ভাষা যখন অনুভূতি-স্নিগ্ধ হইয়া সুর-মাধুর্য্যে অনীর্ব্বচনীয়তার ব্যঞ্জনা জাগায়, তখন সে গদ্যের সীমানা পার হইয়া কবিতার রাজ্যে প্রবেশ করে। ভাষার শব্দার্থ-ময় দেহটি পর্য্যন্ত তখন ভাব-স্পন্দে কবিতায়িত হইয়া উঠে।

গদ্য ও কবিতার যে পার্থক্য আমরা নির্দ্ধারণ করিলাম, ইহা সত্ত্বেও বলা যাইতে পারে, রূপের দিক দিয়া গদ্য ও কবিতার ভেদরেখা সামান্য হইলেও প্রাণস্পন্দনের দিক দিয়া উহাদের পার্থক্য কম নয়। এইবার কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে আমাদের বক্তব্য বুঝাইতে চেষ্টা করিব। গদ্যও সার্থক কবিতার স্তরে উন্নীত হয়, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। আবার দেখুন, নেহাৎ গদ্যাত্মক পংক্তি-নিচয় মধুসূদনের হাতে কেমন কবিতা হইয়া উঠিয়াছে—

কোন্ ধর্ম্মমতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব ভ্রাতৃত্ব, জাতি— —এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি ? শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয় ; পর পর সদা।
এ শিক্ষা হে রক্ষোবর ! কোথায় শিখিলে ?

T. S. Eliot গদ্যকে কী অপূর্ব্ব কবিতা-শ্রী দান করিয়াছেন, দেখুন—

In the room the women come and go
Talking of Michelangelo.

আবার, Wordsworth কবিতা লিখিতে গিয়া কিরূপ সাধারণ গদ্য রচনা করিয়াছেন দেখুন—

When Ruth was left half desolate
Her father took another mate.

বিহারীলাল গোধূলি-বর্ণনা প্রসঙ্গে কবিতার সাধারণ ছন্দ-স্পন্দটিকেও হারাইয়া ফেলিয়াছেন—

নীল আকাশ মাঝে আধশশী শোভা পায়,
ঈষৎ গোলাপী মেঘ ঘেরিয়া রয়েছে তায়।
উচে নীচে তরঙ্গিয়া ভাসিছে শকুন সব,
চাতকেরা উড়ে উড়ে করে কি যে কলরব।

Browning কবিতায় গদ্যকে পর্য্যন্ত কেমনভাবে স্বধর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন, দেখুন—

Irks care the crop-full bird ? Frets doubt the maw-crammed beast ?

এবার, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একটি অনবদ্য কবিতায় কাব্যলক্ষ্মীকে কেমন 'আলুথালু' করিয়া তুলিয়াছেন, লক্ষ্য করুন—

বৈশাখে দেখেছি বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল
কালো শ্যেন পাখীর মতো তোমার ঝড়,
সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর-ফোলা সিংহ
তার ল্যাজের ঝাপটে ডালপালা আলুথালু ক'রে
হতাশ বনস্পতি ধূলায় পড়ল উবুড় হয়ে।

সুতরাং, আমাদের কথা হইল, গদ্য ও কবিতা উভয়ের যে প্রকৃতিগত সৌষম্য (harmony) আছে, তাহা লঙ্ঘন করিলে অনেক সময় না-গদ্য-না-কবিতা ধরণের যে সৃষ্টি হয়, তাহা অপাংক্তেয়ই থাকিয়া যাইবে। কবিতার সৌষম্য এবং গদ্যের অন্তর সৌষম্য,—the other harmony,—বুঝিবার একটি মাত্র উপায়—লেখক ও পাঠকের বোধি বা *Intuition*। এই বোধি শিক্ষা, দীক্ষা ও

সাধনাসাপেক্ষ তো বটেই, কিন্তু শ্রেষ্ঠ লেখক বা সাহিত্য-বোধ সম্পন্ন পাঠকের পক্ষে অনেক সময় প্রাক্তন। যাহার মধ্যে এই উভয়ের মিলন ঘটিয়াছে, তিনি অত্যন্ত ভাগ্যবান।

এখন আমরা কবিতা সম্বন্ধে মূল কয়েকটী কথার পুনরাবৃত্তি করিতেছি—

(১) কবিতায় আমরা সাধারণতঃ বাহ্য-জগত ও মানব জীবনের কাহিনী এবং ভাব-কল্পনা সুন্দর ও মনোরম করিয়া পাই। সংসার-ধূলিজাল কল্পনার কোমল স্পর্শে কবিতার রাজ্যে আরও মধুর, আরও সুন্দর হইয়া উঠে।

(২) কবিতা ভাবকে রূপে পরিবর্ত্তন করে। 'ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসার' তত্ত্বই কবিতায় প্রকাশিত। যাহা অদেহী, অ-রূপ, সূক্ষ্ম বা ইন্দ্রিয়াতীত, কবি তাহাকে দেহ, রূপ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূর্ত্তি দান করেন।

(৩) কবিতার চিরন্তন আবেদন আমাদের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যবোধের নিকট। ভাব-সঞ্চারী বলিয়া ইহা আমাদের মনে বিচিত্র রস উদ্দীপন করে। কিন্তু সর্ব্বত্রই ইহা সৌন্দর্য্য-বোধের পরিপোষক। কবির এই সৌন্দর্য্যবোধের সত্যতার সহিত দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক সত্যের বিভিন্নতা আছে। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিচারের দ্বারা যে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা অসুন্দর হইলেও সত্য। কিন্তু, কবি কল্পনা বলে যে-সত্য আবিষ্কার করেন, তাহা সুন্দর হইবেই।

(৪) কবিতার একটী বিশেষত্ব ইহার ছন্দ। এই সম্বন্ধে অনেকে বলেন যে, ছন্দ কবিতার পক্ষে অপরিহার্য্য নহে। তাহারা এইজন্য ছন্দোহীন রচনাকেও কবিতা বা কাব্য নামে আখ্যাত করিতে চাহেন। Wordsworth বলিয়াছিলেন যে, কবিতা ও গদ্যের ভাষায় বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।* কিন্তু তাঁহার উৎকৃষ্ট কবিতা তাঁহার এই উক্তির সমর্থন করেনা। Wordsworth-এর উক্তির উত্তরে সত্য-দৃষ্টি সম্পন্ন Coleridge বলিয়াছিলেন—There *may be*,

*'There neither is, nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition'—*Preface to Lyrical Ballads.*

† 'The distinction between poets and prose writers is a vulgar error'—*Shelley.*

is and *ought to be* essential difference between the language of prose and of metrical composition.†

'ছন্দোগুরু' রবীন্দ্রনাথ একদা (১৯৩৯) যখন বলিয়াছিলেন, 'গদ্য ও পদ্যের ভাসুর-ভাদ্রবউ সম্পর্ক আমি মানিনা', তখন তিনি কাব্যে ছন্দের প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নটি এড়াইয়া গিয়াছিলেন। আমাদের বক্তব্য এই যে, সনাতনরীতি-সম্মত কবিতায় ছন্দ না থাকিলেও উহাতে ছন্দ-স্পন্দ (rhythm) থাকিবেই।

অধুনা নিশ্ছন্দ-কবিতা নামে এক প্রকার কবিতা লিখিত হইতেছে। যাহা হউক, আমাদের বক্তব্য এই যে, গদ্য যদি ভাব-সঞ্চারে, সঙ্গীত-মাধুর্য্যে ও প্রবাহমানতায় পাঠকের মনে আনন্দ সঞ্চার করিতে পারে, তবে উহাকে কবিতা না বলিয়া, কাব্য-ধর্ম্মী গদ্য বলা যাইতে পারে। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'শ্মশান বর্ণনা' বা শরৎচন্দ্রের 'রাত্রির রূপ' বর্ণনা—প্রভৃতিকে কবিতা না বলিয়া কাব্য-ধর্ম্মী গদ্য বলাই যুক্তিযুক্ত। ছন্দ থাকিলেই কবিতা হয়, এবং ছন্দ না থাকিলে কবিতা হয় না, এই কথা অবশ্য গ্রাহ্য নহে। তবে, ইহাও সত্য যে, সারস্বতসমাজ ছন্দকে কবিতা-লক্ষ্মীর অপরিহার্য্য অলঙ্কার রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ছন্দের আপাতঃ-বন্ধনে যে মুক্তির আবেগ আছে, তাহা কবিতা-সৃষ্টির একান্ত সহায় মনে করিয়াই বোধ হয় বিবুধ জন ইহাকে কবিতার অলঙ্কার রূপে মানিয়া লইয়াছেন।

এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ছন্দের একটা অনিবার্য্য প্রবাহ আছে, সেই প্রবাহের মাঝখানে একবার ফেলিয়া দিতে পারিলে কবিতা সহজে নাচিতে নাচিতে ভাসিয়া চলিয়া যায় ; কিন্তু গদ্যে নিজে পথ দেখিয়া পায়ে হাঁটিয়া নিজের ভাব-সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে হয় ; সেই পদব্রজ বিদ্যাটী রীতিমত অভ্যাস না থাকিলে চাল্ অত্যন্ত আঁকাবাঁকা এলোমেলো এবং টলমলে হইয়া থাকে'।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, কাব্য গড়ে, বিজ্ঞান ভাঙে। কথাটি কবি ও বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টির পার্থক্য অতি নিপুণভাবে পরিস্ফুট করিতেছে। কবি ও বৈজ্ঞানিক—উভয়েই সত্যের উপাসক। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে বাস্তব সত্যের অনুসন্ধান করেন। কবি কোন কোন স্থলে বিশ্লেষণাত্মক হইলেও তাঁহার দৃষ্টি মূলতঃ সংশ্লেষণাত্মক।

কবি ও বৈজ্ঞানিক

বৈজ্ঞানিক জগত ও জীবনের দুর্জ্ঞেয় রহস্য বিচারে, গাণিতিক পরিমাপের সাহায্যে সাধারণ সত্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই সত্য বুদ্ধিগত, অমূর্ত্ত। কবি জগত ও জীবনের যে-সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা শুধু ব্যক্তিগত, প্রত্যয়াধীন। তাহার বাস্তব সত্যতা না থাকিলেও অনুভূতির প্রত্যয়-গোচর গভীর সত্যতা আছে। সত্য নিষ্ঠুর হইলেও বৈজ্ঞানিক তাহাকে নির্ব্বিকার ভাবে গ্রহণ করেন, কবি সত্যকে সুন্দর করিয়া গ্রহণ করেন। বৈজ্ঞানিক বলেন, মানুষ রক্ত মাংস ও অস্থি-সমন্বিত জীব মাত্র, কবি বলেন, মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। বৈজ্ঞানিক সূর্য্যকে ক্রমবিলীয়মান আলোক-কেন্দ্র রূপে দেখেন, কবি তাহাকেই আবার জগতের প্রাণ রূপে অর্চ্চনা করেন। কাজেই বৈজ্ঞানিকেব দৃষ্টি তন্ময় দৃষ্টি, কবির দৃষ্টি মন্ময় দৃষ্টি—ভাবদৃষ্টি। আবার, বৈজ্ঞানিক সত্য যখন লেখকের ব্যক্তি-চেতনায় রঙীন হইয়া উঠে, তখন উহাই আবার কাব্যের স্তবে উন্নীত হয়। এইজন্যই Wordsworth বলেন, Poetry is the impassioned expression which is in the countenance of all science.

কবিতা ও দর্শন—উভয়েই বিশ্ব-জগতের রহস্য উদ্ধার করিতে চাহে। কিন্তু উহাদের প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অনুভূতি ও ভাবাবেগই কবিতার উপজীব্য, কিন্তু দর্শন বিচারমূলক বিশ্লেষণের সাহায্যে জগত ও জীবনের বুদ্ধিগত স্বরূপটী উদ্ধার করিতে চায়। দার্শনিক জীবনকে জিজ্ঞাসা দ্বারা, বিচারেব দ্বারা গ্রহণ করেন। দার্শনিক ভাবেন, কবি অনুভব করেন। তবে একথাও সত্য যে, কোন কোন কবি ভাবাত্মক হইলেও ভাবকল্পনাকে অনুভূতি-স্নিগ্ধ করিয়া পরিবেশন করাই তাঁহাদের কাজ। সেইরূপ, আবার কোন কোন দার্শনিকও তাঁহাদের ভাবনাচিন্তাকে অনুভূতি-স্নিগ্ধ করিয়া যখন প্রকাশ করেন, তখন তাঁহারা আবার কবির আসনে উন্নীত হন। কবি হৃদয়-বৃত্তিকে বড় করিয়া দেখেন, দার্শনিক বুদ্ধি-বৃত্তিকে বড় করিয়া দেখেন। কিন্তু কবি যেখানে প্রতীক ও রূপকল্পনায় নিজের অনুভূত সত্যকে প্রকাশ করেন, দার্শনিক সেখানে অমূর্ত্ত বিশুদ্ধ চিন্তাধারায় নিজেকে প্রকাশ করেন। কবির মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি, দার্শনিকের মুখ্য উদ্দেশ্য

কবিতা ও দর্শন

বিশ্বের অন্তর্লীন সৌন্দর্য্যের ভাবগত অদ্বৈত সত্তার আবিষ্কার। সর্ব্বশেষে বলিতে হয় যে, লেখকের ভাবকল্পনা যেখানে অরূপ ও অমূর্ত্ত সত্য নির্দ্দেশ করে, সেখানে তিনি দার্শনিক; আবার উহাই যখন সীমায়িত রূপ-রসে নিবেদিত হয়, তখন তিনি কবি। লেখকের ভাবনা-কল্পনার ধূপ যেখানে গন্ধ হইয়া অদেহীরূপে ব্যঞ্জিত হইয়া উঠে, সেখানে তিনি দার্শনিক; আবার ধূপ-সুরভি যেখানে জমাট হইয়া বস্তুপুঞ্জরূপে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যরূপে রূপময় হইয়া উঠে, তখন তিনি কবি। কবিতায় দার্শনিকতা থাকিতে পারেনা, এমন কথা আমরা বলিব না। কিন্তু কবির জীবন-দর্শন কাব্যত্বের দাবী করিতে হইলে উহাকে রূপাত্মক কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। কবি যদি দার্শনিকতাকে উচ্চতর স্থান দেন, তবে তিনি স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া পড়েন এবং তাহার কাব্যও কাব্যহিসাবে নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে। শ্রেষ্ঠ কবি দার্শনিক সত্যকে পর্য্যন্ত রূপ-কান্ত করিযা তোলেন, যাহা বিশুদ্ধ অমূর্ত্ত সত্য-স্বরূপ ছিল, তাহাই তাঁহার কাছে রূপাত্মক কল্পনায় বিভূষিত হয়। কোন কোন কবি আবার জীবন-দর্শনকে বড় করিয়া তোলেন। বলা বাহুল্য, তাহারা দার্শনিক বা চিন্তাবীর হইতে পারেন, কিন্তু কবি উপাধিতে তাঁহাদিগকে বিভূষিত করা যায় না। শ্রেষ্ঠ কবিতায় দর্শন ও কাব্যের হরগৌরী-মিলন মোটেই অসম্ভব নয়। কাজেই কাব্য-বিচারে আমাদিগকে কবিতার দার্শনিক সূক্ষ্মতার প্রশংসা করিলে চলিবে না, দেখিতে হইবে, দার্শনিকতা কাব্য-শ্রী মণ্ডিত হইয়াছে কিনা। তাহা না হইয়া থাকিলে, দর্শনের পীড়নে কবিতার অপমৃত্যু হয়। এই জন্যই কীটস্ বলিয়াছেন—

Do not all charms fly
At the mere touch of cold philosophy ?

কবিতা প্রধানতঃ দুই প্রকার। *Subjective* বা মন্ময় কবিতা এবং *Objective* বা তন্ময় কবিতা। কবি যখন নিজের আন্তর অনুভূতি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ভাবনা-চিন্তা বা বহির্গত অনুভূতি তাঁহার কাব্যের সামগ্রী মাত্র রূপে গ্রহণ করিয়া আত্ম-প্রকাশ করেন, তখন আমরা তাঁহার সৃষ্টিকে মন্ময় বা ব্যক্তিনিষ্ঠ কবিতা বলি। এই জাতীয়

মন্ময় ও তন্ময় কবিতা

কবিতা

কবিতা এক হিসাবে কবির আত্ম-চরিত বা আত্ম-বাণী। কবি যখন বস্তুজগতকে যথাযথ রূপে প্রকাশ করেন, তখন আমরা তাহাকে তন্ময় বা বস্তু-নিষ্ঠ কবিতা নামে অভিহিত করিতে পারি। মন্ময় কবিতায় কবির ব্যক্তি-অনুভূতির নিবিড়তাই প্রধান, তন্ময় কবিতায় বস্তু-সত্তাই প্রধান। এই শ্রেণী-বিভাগ বিশেষ প্রয়োজনীয় হইলেও মনে রাখিতে হইবে যে, সম্পূর্ণ রূপে তন্ময় বা সম্পূর্ণ রূপে মন্ময় কবিতা অসম্ভব।

একান্ত বস্তু-নিষ্ঠ কবিতায়ও মাঝে মাঝে কবি-প্রাণের শিহরণ সঞ্চারিত হইয়া থাকিতে পারে এবং একান্ত ব্যক্তি-নিষ্ঠ কবিতায়ও মাঝে মাঝে বস্তু-সত্তার প্রাধান্য লক্ষিত হইতে পারে। মন্ময় ও তন্ময় কবিতাকে আবার যে কয়েক ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, তাহা পরপৃষ্ঠার তালিকা হইতে প্রতীয়মান হইবে।

কবিতা
মন্ময় বা গীতিকবিতা
(Subjective Poetry)
তন্ময় বা বস্তু-নিষ্ঠ কবিতা
(Objective Poetry)
ভক্তিমূলক
(Devotional)
স্বদেশ-প্রীতিমূলক
(Patriotic)
প্রেমমূলক
(Love *or*,
Erotic
প্রকৃতিবিষয়ক
(Nature)
সনেট
(Sonnet)
স্তোত্র
(Ode)
চিন্তামূলক
(Reflective)
শোক-গীত
(Elegy)
Vers de Societe
লঘু বৈঠকী-কবিতা
গাথা
(Ballad)
মহাকাব্য
(Epic)
নীতি-কবিতা
(Didactic)
রূপক
(Allegory)
ব্যঙ্গ-কবিতা
(Satire)
লিপি-কবিতা
(Epistle)

৪
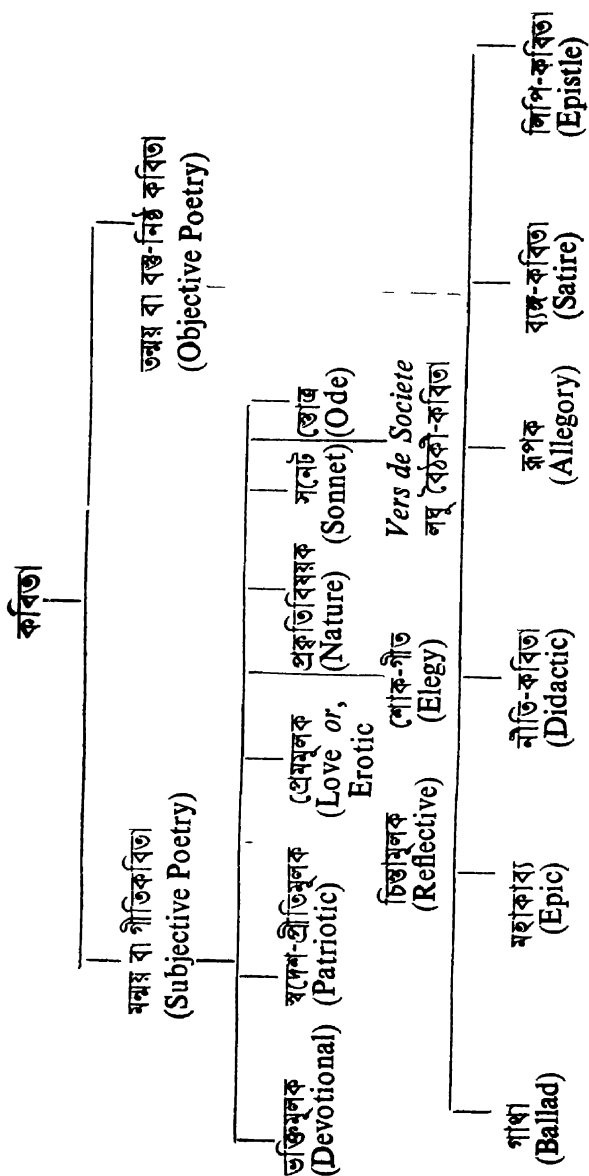
সাহিত্যে রসতত্ত্ব

সংস্কৃত আলঙ্কারিক বলেন, কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং। এই 'রস' বস্তুটি কি, ইহা লইয়া তাঁহারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা করিয়াছেন। 'রস' ধাতুর অর্থ আস্বাদন, সুতরাং যাহা আস্বাদ্য তাহাই রস, এবং একমাত্র সহৃদয় অনুভূতিশীল চিত্তই রসাস্বাদনে অধিকারী। এই

রস

রস সহৃদয় জনের আনন্দময় মানসিক অবস্থা মাত্র। কাব্যপাঠ সহৃদয় লোকের মনে কাব্যের অনুরূপ ভাব সঞ্চারিত করিয়া তাঁহাকে এমন এক নৈর্ব্যক্তিক ও আদর্শ জগতে লইয়া যায় যে, তিনি তখন তদ্গত হইয়া পড়েন; ফলে, কাব্যের ভাবানুভূতির সহিত তাঁহার একাত্মতা সৃষ্ট হয় অথবা নাটক উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার মধ্যে তাঁহার আত্মবিলুপ্তি সংসাধিত হয়। এই আত্মবিলুপ্তির মধ্য দিয়াই তিনি তখন ভাবজগতের তুরীয় লোকে উপনীত হইয়া 'অলৌকিক' আনন্দ অনুভব করেন। এই দিব্য অনুভূতি-সঞ্জাত নির্ম্মল আনন্দময় মানসিক অবস্থাই, 'রস'। এই রস কাব্য নহে, 'স এষ পরমো ব্যঙ্গ্যঃ' অর্থাৎ ব্যঞ্জনার দ্বারা রসবোধ হইয়া থাকে। সত্যকথা বলিতে কি, রস এবং রস-প্রতীতি এই দুইটী বস্তু ভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না। কারণ, যাঁহার রসানুভূতি বা রসপ্রতীতি হয় নাই, তিনি রস কাহাকে বলে বুঝিতে পারিবেন না।

আনন্দবর্দ্ধনের মতে রসোদ্রেকই কবির একমাত্র উদ্দেশ্য—আখ্যানবস্তু ও অলঙ্কার তাঁহার মতে মুখ্য নহে। এই রস 'পরিত্যক্ত বিশেষঃ' অর্থাৎ বস্তুবিশেষ-নিরপেক্ষ অলৌকিক আনন্দাস্বাদনে পরিণত হয়। এই যে বস্তু বা ব্যক্তিবিশেষ-নিরপেক্ষ সাধারণ ভাববস্তুতে পরিণত হওয়া, ইহাকেই বলে সাধারণীকৃত-হওয়া।

রস-ব্যঞ্জিত পদ-নির্ম্মাণই কবি-কর্ম্ম। সংস্কৃত আলঙ্কারিক ভরত রসকে সাহিত্যের বীজ ও ফল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—

যথা বীজাদ্ ভবেদ্ বৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং তথা।
তথাং মুলং রসাঃ সর্বে তেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ।

রসাচার্য্যগণ বলেন যে, রসানন্দ 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' অর্থাৎ কাব্য-পাঠে পাঠক এমন এক বিষয়ান্তর-নিরপেক্ষ রস-লোকে উত্তীর্ণ হন, যেখানে তিনি তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হন। Hamilton-এর ভাষায় বলা যায়, 'Poetry, as such, is to be judged simply by the quality of imaginative experience it gives, and not by the test of moral goodness or of truth in reference to something outside itself.' রসই 'সকল প্রয়োজন মৌলীভূতং' এই কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু রসতত্ত্ব কাব্যবিচারে একান্ত করিয়া তুলিলে উহা নির্ব্বিশেষ তত্ত্ববিচারে পরিণত হয়। কাব্য-সৃষ্টি যে বিশিষ্ট কবি-মানসের কলাকীর্ত্তি, কাব্য যে 'product of the poet's mind' এই কথাটী রসতত্ত্ব স্বীকার করে নাই*। ফলে, সৃষ্টির পশ্চাতে স্রষ্টা এইখানে বাদ পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, কাব্য-সৃষ্টি কী গভীর ভাবে বিশেষ কবি-মানসের বিশিষ্ট কল্পনাত্মক সৃষ্টি।

সংস্কৃত আলঙ্কারিক আরও বলেন যে, কাব্য-রস হইতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রাপ্তি হয়। কাব্য কবির যশ, সম্পদ ও অর্থ আনয়ন করে, এবং কাব্যের মধ্যে যে দেব-অর্চ্চনা থাকে তাহাতে কবির ধর্ম্মলাভ হয়, এবং ধর্ম্মের শেষ ফল মোক্ষ।

কিন্তু, আধুনিক জগতে, কাব্য বা কবিতার প্রতি মানুষ ততখানি আস্থাবান নহে। বর্ত্তমান সভ্যতা 'কুবের-পূজারী'; সৌন্দর্য্যের স্থান এখানে অপেক্ষাকৃত গৌণ। তবে এইটুকু বলা অসমীচীন হইবে না যে, কবিতা বা কাব্য-রস মানুষের অন্তরের চিরন্তন সৌন্দর্য্য-পিপাসার পরিপোষক। বিশেষতঃ,

*৩৪ পৃষ্ঠায় ডাঃ দে-র মত দেখুন

কাব্য-পাঠে মানুষ কেবল সংসারের ধূলিজাল হইতে কল্প-লোকের সৌন্দর্য্য-জগতেই আশ্রয় গ্রহণ করে না, পরন্তু ইহার সাহায্যে মানুষ জীবনের গভীরতম রহস্যটির পরিচয় লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হয়। কাব্যের জগৎ বস্তু-জগৎ না হইলেও ইহা অধিকতর সত্য-জগৎ এবং কাব্যজগতে প্রয়াণ অর্থ, বাস্তব-জগৎ হইতে বিচ্ছেদ নয়, বাস্তবের সহিত নিগূঢ় সংযোগ সাধন। কাব্যপাঠে অনেকের চিত্ত নিয়মত হইয়া থাকে, অনেক 'অল্পবুদ্ধি সাধুলোক' ইহা হইতে শক্তি বা জ্ঞান লাভ করিতে পাবেন। কিন্তু কাব্য-বিচারে এই সকল তথ্য সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। 'সরস্বতীর আসন বস্তুপিণ্ডের উপর নহে, পদ্মের স্নিগ্ধ-সৌন্দর্য্যেই তাঁহার অধিষ্ঠান'—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিই কাব্য-বিচারের কষ্টিপাথর রূপে গৃহীত হইতে পারে।

রস নয় প্রকার—শৃঙ্গার, বীর, রৌদ্র, বীভৎস, হাস্য, অদ্ভুত, করুণ, ভয়ানক ও শান্ত। বৈষ্ণবগণের নিকট রসতত্ত্ব শুধু কাব্যামৃত আস্বাদনের অবলম্বন নয়, ইহা ভগবানকে লাভ করিবার শ্রেষ্ঠ পথ। তাই তাঁহারা ভগবানের ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি অপসারিত করিয়া মধুরমূর্ত্তিকেই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে রস পাঁচ প্রকার—শান্তরস, দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্যরস ও মধুর রস।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকের মতে রসানুভূতির সামগ্রী চারিটি—**বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারীভাব** এবং **স্থায়ীভাব**। যে সকল কারণে স্থায়ীভাব উৎপন্ন হয় তাহার নাম বিভাব। **বিভাব** আবার দুই প্রকার, **আলম্বন** ও **উদ্দীপন**। যাহাকে অবলম্বন করিয়া মনে সুখদুঃখ উদিত হয়, তাহার নাম **আলম্বন** বিভাব এবং যে-বিষয় দেখিয়া মনে সুখদুঃখ উদ্দীপ্ত হয়, তাহাকে **উদ্দীপন** বিভাব বলে। যাহা দ্বারা সুখদুঃখের অবস্থা অনুমিত হয়, তাহাকে **অনুভাব** বলে। যে-ভাব আমাদের চিত্তে কখনো আবির্ভূত হয়, কখনো অন্তর্হিত হয়, তাহাকে **সঞ্চারীভাব** (বা ব্যভিচারভাব) বলে। যখন নয়টি ভাব (রতি, উৎসাহ, ক্রোধ, জুগুপ্সা, হাস, বিস্ময়, শোক, ভয় ও শম) আমাদের চিত্তে দৃঢ়ভাবে স্থায়িত্ব লাভ করে তখন উহাকে **স্থায়ীভাব** বলে।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকের মতানুযায়ী আমরা কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে রস-নির্ণয় দেখাইতেছি। রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত 'প্রশ্ন' কবিতাটি এই :—

ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে,
তারা ব'লে গেল, ক্ষমা করো সবে, ব'লে গেল, ভালোবাসো—
অন্তর হতে বিদ্বেষ-বিষ নাশো।—
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে॥

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে,—
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হ'য়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে॥

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশী সঙ্গীত হারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে,
তাইতো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো।

এখানে মূলরস—রৌদ্র, এবং **স্থায়ীভাব**—ক্রোধ, **আলম্বন**—অত্যাচারী, **উদ্দীপন**—বালকের মৃত্যু। **অনুভাব**—কণ্ঠরোধ ও অশ্রুপাত। বিভিন্ন

সঞ্চারী ভাবের সমাবেশেই কবিতাটি এমন অপূর্ব্ব হইয়াছে। এইখানে সঞ্চারী ভাব :* —

(১) শোক—(ক্রোধের সঞ্চারী)
(২) দৈন্য—'কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে'
(৩) বিষাদ— ঐ
(৪) আবেগ—যাহারা তোমার ..বায়ু
(৫) নির্বেদ—(ক) আমি যে দেখেছি ...কাঁদে
(খ) লুপ্ত করেছে . তবে
(৬) উগ্রতা—নবনীর তারা....নমস্কারে
(৭) মরণ —কী যন্ত্রণায়....মাথা কুটে
(৮) অমর্ষ—গোপন হিংসা....নিঃসহায়ে
(৯) বিতর্ক—যাহারা তোমার....ভালো
(১০) চাপল্য—নবনীর....নমস্কারে
কণ্ঠ....অশ্রুজাল
(১১) চিন্তা—সমগ্র কবিতায় ব্যক্ত

এইখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়, কবিতাটিতে ক্রোধ ও শোকের অন্যোন্য বিরোধী রস-সান্নিধ্য থাকা সত্ত্বেও কোথাও এতটুকু রসাভাস হয় নাই।

---

*সঞ্চারী ভাব ৩৩ প্রকার—

*নির্ব্বেদ, আবেগ, দৈন্য, জড়তা, উগ্রতা।
মোহ, মদ, অপস্মার, নিদ্রা, চপলতা।
বিবোধ, বিষাদ, শ্রম, ঔৎসুক্য, স্মৃতি।
মরণ, আলস্য, স্বপ্ন, চিন্তা, গ্লানি, ধৃতি।
অসূয়া, উন্মাদ, শঙ্কা, অবহিত্থা, হর্ষ।
লজ্জা, মতি, গর্ব্ব, ব্যাধি, সন্ত্রাস, অমর্ষ।
ব্যভিচারি ভাবের বিতর্ক বাকি রয়।
ইহা দিলে সঞ্চারীর সংখ্য অঙ্ক হয়।

—লালমোহন

এইবার আমরা একটি আধুনিক ইংরেজী কবিতার রসবিচার করিব। কবিতাটি এই :—

Christmas

A boy was born at Bethlehem
that knew the haunts of Galilee.
He wandered on Mount Lebanon,
and learned to love each forest tree.

But I was born at Marlborough,
and love the homely faces there ;
and for all other men besides
'tis little love I have to spare.

I should not mind to die for them,
my own dear downs, my comrades true.
But that great heart of Bethlehem
he died for men he never knew.

And yet, I think, at Golgotha,
as Jesus' eyes were closed in death,
they saw with love most passionate
the village street at Nazareth.

—*E. Hilton Young.*

এই কবিতাটি মূলতঃ রসাত্মক নয়, ভাবাত্মক। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের মতে যখন কোন একটি স্থায়ী বা সঞ্চারী ভাব যথেষ্ট পরিমাণে বিকাশ লাভ করিয়া রসত্বলাভ না করে, তখন সে স্থলে উহার আত্মা রস না হইয়া, ভাবই হয় ; এস্থলে কবির স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতির ভাবটিই বিভাবাদিযোগে আস্বাদ্যমান হইয়াছে। কবিতাটিতে **স্থায়ীভাব**—স্বজন-নিষ্ঠ রতি, **আলম্বন**—স্বজনবর্গ, **উদ্দীপন**—খ্রীষ্টের আত্মোৎসর্গ, **অনুভাব**—মুমূর্ষু যীশুর ন্যাজরেথের প্রতি দৃষ্টিপাত-কল্পনা, **সঞ্চারীভাব**—

(১) দৈন্য—'He wandered....tree' (*St. I*)
(২) ব্রীড়া—'and for....spare'. (*St. II*)
'But that....knew'. (*St. III*)
(৩) মতি—'they saw....Nazareth'. (*St. IV*)

বঙ্কিমচন্দ্রের **'সীতারাম'** হইতে আর একটি অংশের রসবিচার করা যাক—

তা, সে দিন গঙ্গারামের কোন কাজ করা হইল না। রমার মুখখানি বড় সুন্দর! কি সুন্দর আলোই তার উপর পড়িয়াছিল। সেই কথা ভাবিতেই গঙ্গারামের দিন গেল। বাতির আলো বলিয়াই কি অমন দেখাইল? তা হ'লে মানুষ রাত্রিদিন বাতির আলো জ্বালিয়া বসিয়া থাকে না কেন? কি মিস্‌মিসে কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের গোছা! কি ভুরু! কি চোখ! কি ঠোঁট!—যেমন রাঙ্গা তেমনই পাতলা! কি গড়ন! তা কোন্‌টাই বা গঙ্গারাম ভাবিবে? সবই যেন দেবীদুর্ল্লভ! গঙ্গরাম ভাবিল, 'মানুষ যে এমন সুন্দর হয়, তা জানতেম না। একবার যে দেখিলাম, আমার যেন জন্ম সার্থক হইল। আমি তাই ভাবিয়া যে কয় বৎসর বাঁচিব, সুখে কাটাইতে পারিব।'

এইখানে **মূলরস**—শৃঙ্গার (পরস্ত্রী-ঘটিত বলিযা রসাভাস হইয়াছে) **স্থায়ীভাব**—রতি, **আলম্বন**—রমা, **উদ্দীপন**—রমার মুখ, **সঞ্চারীভাব** -

(১) চিন্তা—গঙ্গারাম ভাবিল....পারিব।
(২) জড়তা—তা কোন্‌টাই বা.. .ভাবিবে?
(৩) ঔৎসুক্য—সেই কথা ভাবিতেই....গেল।
(৪) স্মৃতি—রমার মুখ....পড়িয়াছিল।
(৫) হর্ষ—সবই....দেবীদুর্ল্লভ।
(৬) বিতর্ক—বাতির....কেন?
(৭) চপলতা—গঙ্গারামের অব্যবস্থিত চিত্তাবস্থা। ইহা সমগ্র অনুচ্ছেদে পরিস্ফুট।

উপরে যে কয়েকটি কাব্যাংশের রস-বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, উহার সাহায্যে উহাদের কাব্যত্ব কতটুকু বোধগম্য হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তবে, ইহা হইতে একটি বিষয় দেখা যাইবে যে, সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ কাব্য-দেহের অঙ্গ-সৌষ্ঠব বিশ্লেষণ ব্যাপারে যথেষ্ট কুশাগ্রবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। রস নামক নির্ব্বিশেষ আনন্দানুভূতিকে বেশ সুপরিকল্পিত ছকের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া আলঙ্কারিক রসাস্বাদন করিয়াছেন। কিন্তু যে কবি-মানস দৃষ্টিতে বিষয়বস্তু রূপ লাভ করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে তাঁহারা নির্ব্বাক, এবং কবির যে উৎকৃষ্ট সৃজনী-

কল্পনা রূপ-সৃষ্টির সহায়ক, সেই সম্বন্ধেও তাহারা কিছু বলেন না। আর একটি কথা—সাহিত্যের বা কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব তাহার বাণীভঙ্গিতে—Style-এ। এই বাণীভঙ্গি তত্ত্বটিও যে বিশিষ্ট কবি মানসেরই ভাষাবিগ্রহ, ইহাও তাঁহারা উল্লেখ করেন নাই। ফলে, তাহাদের রসতত্ত্ব অনেকটা নিরুপাধিক নির্বিশেষ রসতত্ত্ব হইয়া উঠিয়াছে—বিশেষের সহিত নির্বিশেষের সংযোগ সাধনের অভাবে এই রসতত্ত্ব কাব্য জিজ্ঞাসায় সমধিক উপযোগিতার দাবী করিতে পারে না। আলঙ্কারিকদের বিচার যেন অনেকটা নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বের দিকে, ইহাতে অনন্ত বিচিত্র অনন্যসদৃশ কবি প্রতিভার স্বীকৃতি নাই। এই কারণেই কাব্যবিচারে, আমরা পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা শাস্ত্রের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য। পাশ্চাত্ত্য কাব্য পরিমিতি (*Poetics*) কবি মানস, কবি কল্পনার বৈশিষ্ট্য ও বিশিষ্ট লেখকের বিশিষ্ট বাণী-সাধনাকে মুখ্য গণ্য করিয়া কাব্য বা সাহিত্য-বিচারের মর্মকথাটিকে বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে। আধুনিক তথা উনবিংশ শতাব্দী ও তৎপরবর্তী কালের যে বাংলা সাহিত্য প্রধানতঃ ইংরেজী ও ইয়োরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার আলোচনায় প্রাচীন সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র বিশেষ উপযোগী হইতে পারে না। আমরা বিশ্বাস করি, সংস্কৃত আলঙ্কারিক যেখানে কাব্যবিচারে সাহিত্য বোধের ও বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সাহিত্য সমালোচক গ্রহণ করিবেনই -কিন্তু শুধু প্রাচ্যের আকাশের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইলে', বাংলা তথা বিশ্ব সাহিত্য পঠন পাঠন তাঁহার পক্ষে ব্যর্থ হইবে।

৫

গীতিকবিতা

কবির একান্ত ব্যক্তি অনুভূতি যখন সহজ ও সাবলীল গতিতে সঙ্গীতমুখর হইয়া আত্ম-প্রকাশ করে, তখনই গীতিকবিতার জন্ম। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, 'বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটন মাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।' গীতিকবিতা অনুভূতির প্রকাশ বলিয়া সাধারণতঃ দীর্ঘকায় হয় না। কারণ, কোন অনুভূতিই দীর্ঘকাল স্থায়ী নয়। কিন্তু কোন কবি যদি গীতিকবিতায় তাঁহার ব্যক্তি-অনুভূতিকে আন্তরিকতার সহিত অনায়াসে দীর্ঘাকারে বর্ণনা করিতে পারেন, তবে তাহার মূল রস ক্ষুণ্ণ হয় না। কবির আন্তরিকতাই শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতার একমাত্র কষ্টি-পাথর।

গীতিকবিতা ও গান

ইংরাজী সাহিত্যে গীতিকবিতা *Lyric* নামে অভিহিত। বীণাযন্ত্র যোগে এই শ্রেণীর সঙ্গীত-কবিতা গীত হইত বলিয়া ইহাকে *Lyric* বা গীতিকবিতা বলা হইত। এইখানে গান ও গীতিকবিতার পার্থক্য মনে রাখা দরকার। শব্দচয়ন ব্যাপারে গান রচয়িতার স্বাধীনতা নাই, কারণ সুরাত্মক ও সহজে উচ্চারণ করা যায় এমন শব্দই তাঁহার পক্ষে উপযোগী। গানে ছন্দোবৈচিত্র্য সম্ভব নয়, কারণ কোন বিশিষ্ট ছন্দের পুনরাবৃত্তির সাহায্যে গান-রচয়িতা গানের মূল ভাবটিকে গভীরতর করিয়া তোলেন। এতদ্ব্যতীত, গানে সুরের প্রাধান্য, গীতিকবিতায় কথা ও সুরের সমন্বয়। গানে একাধিক ভাব কল্পনা সম্ভব নয়, গীতিকবিতায় ভাব কল্পনায় বিচিত্রতা ও সুর সঙ্গতি শুধু সম্ভবপর নয়, সুসাধ্যও বটে।' অধুনা যে-কবিতায় কবির আত্মানুভূতি বা একান্ত ব্যক্তিগত বাসনা-কামনা ও আনন্দ-বেদনা তাঁহার প্রাণের অন্তঃস্তল হইতে আবেগ-কম্পিত সুরে অখণ্ড ভাবমূর্তিতে

আত্মপ্রকাশ করে, তাহাকেই গীতিকবিতা বলে। ইহাতে পরিপূর্ণ মানব-জীবনের ইঙ্গিত নাই; ইহা একক পুরুষের একান্ত ব্যক্তিগত আনন্দ-বেদনায় পরিপূর্ণ। কবি এইখানে আত্ম-বিমুগ্ধ, তাই সমস্তটি কবিতা ব্যাপিয়া তাহার প্রাণ-স্পন্দন অনুভব করা যায়। কবির ব্যক্তি-অনুভূতি অথবা বিশিষ্ট মানসিকতা ইহাকে স্নিগ্ধ কান্তি দান করে। তাঁহার চরিত্রের কমনীয়তা, নমনীয়তা বা দৃঢ়তা ইহাতে প্রতিফলিত হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, গীতিকবিতা কবির আত্ম-মুকুর। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'যাহাকে আমরা গীতিকাব্য বলিয়া থাকি অর্থাৎ যাহা একটুখানির মধ্যে একটিমাত্র ভাবের বিকাশ, ঐ যেমন বিদ্যাপতির—

> ভরা বাদর মাহ ভাদর
> শূন্য মন্দির মোর—

সে-ও আমাদের মনের বহুদিনের অব্যক্ত ভাবের একটি কোনো সুযোগ আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া ওঠা'। গীতিকবিতার মধ্যে আমরা আন্তরিকতাপূর্ণ অনুভূতি, অবয়বের স্বল্পতা, সঙ্গীত-মাধুর্য্য ও গতিস্বাচ্ছন্দ্য —এই কয়েকটি জিনিষ প্রত্যাশা করি। বলা বাহুল্য যে, গীতিকবিতা গান না হইলেও, আজ পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যে যে গীতিকবিতা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে সুরের প্রাধান্য অব্যাহত রহিয়াছে।

গীতিকবি ও মহাকবি

গীতিকবি যেমন আত্মসচেতন, মহাকবিও তেমনই আত্মসচেতন। ইহাদের পার্থক্য শ্রেণীগত নয়, ভাবগত। গীতিকবি আপনাকে কেন্দ্র করিয়া নিজের উপলব্ধ জগৎ সৃষ্টি করেন। মহাকবির ব্যক্তি-পরায়ণতা আরও বিস্তৃত। গীতিকবি অন্ধ, মহাকবি সহস্র-চক্ষু, গীতিকবি আত্মরতিসম্পন্ন, মহাকবি স্বকীয় কল্পনার আলোকে নির্ব্বাচিত বিষয়বস্তু অবলম্বনে সর্ব্বজনীন মানবতাকে নিক্ষীরণ করেন। (মিল্‌টন আর্থারের কাহিনী পরিত্যাগ করিয়া বাইবেল-বর্ণিত আদিম মানবের পতন কাহিনীকেই মহাকাব্যের সামগ্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ ইহাই তাহার বিপুল ব্যক্তিত্বের রসে রসান্বিত হইয়া এমন কাব্য-রচনায় সাহায্য করিবে, যাহাতে তিনি ঐশ্বরিক বিধানকে মানবভাগ্যের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেখাইতে পারিবেন) মধুসূদনও

রামায়ণের যে-কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ব্যঞ্জনা ব্যক্তি-নির্বিশেষ হইলেও উহা মধুসূদনের কবি-মানসের ও জীবনদর্শনেরই সহায়ক।

✓ আধুনিক উৎকৃষ্ট গীতিকবিতায় ব্যক্তি-সচেতনতা ছন্দায়িত রূপ-কর্ম্ম সৃষ্টির মধ্যেই ধরা পড়ে। এই হিসাবে, যে-সকল গীতিকবিতায় কবির ব্যক্তি-অনুভূতির প্রাধান্য নাই, বরং তাহার ধ্যানধারণা অপর কোন বহির্গত বিষয়কে অবলম্বন করিয়া মূর্ত্তি লাভ করিয়াছে, সেইখানে, বিষয়বস্তুর বস্তু-সত্তা প্রধান হইলেও উহারাও শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা রূপে গণ্য হইতে পারে। শাক্ত পদাবলীর 'গিরিবর আর আমি পারিনা প্রবোধ দিতে উমারে', অথবা ব্রাউনিং-পত্নীর '*The Musical Instrument*' এ হিসাবে অনবদ্য। এই সকল কবিতায় কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি বড় না হইলেও, বিষয়বস্তুর সহিত তাঁহার মানস-সহানুভূতিটি যেভাবে মধুর ছন্দে নিবেদিত হয়, তাহাতেই উহা গীতিকবিতার স্তরে উন্নীত হয়। জনৈক সমালোচকের উক্তি এই বিষয়ে স্মরণীয়–

'In perfect lyric....the instrument is the metrical form to which the words have to adapt themselves.'*

গীতি-গাথা

কোন কোন সময় দেখা যায় যে, কবির ব্যক্তি-অনুভূতি গীতিকবিতার বিষয়বস্তু হইয়া উঠে নাই। কোন ঘটনা (যথা: মোহিতলালের 'নবতীর্থঙ্কর'), কোন চরিত্র (যথা কালিদাস রায়ের 'চাঁদসদাগর',) বা কোন গল্প অবলম্বন করিয়াও গীতিকবিতা রচিত হয়। শেষোক্ত শ্রেণীর কবিতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের 'নিষ্ফল উপহার', 'পুরস্কার'- প্রভৃতির নাম করা যায়। ইহাদিগকে বরং **গীতিগাথা** বলা যাইতে পারে।

গীতিকবিতার সার্থক্য

আধুনিক অনেক উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা 'শুধু একতারার একটি গান', বা কবির নিছক আত্মগত ভাবকল্পনার প্রকাশ মাত্রই নয়। কবি ইহার মধ্যে কখনো বা নাটকীয়তা কখনো বা মহাকাব্যোচিত ব্যঞ্জনা সঞ্চার করিয়াছেন। যে গীতিকবিতায় কবির ভাবানুভূতি কোন বিষয়বস্তু অবলম্বনে চলমান জীবনালেখ্যের মধ্য দিয়া প্রদর্শিত হয়, অথবা যেখানে কবি

* *Encyclopaedia Britannica*

স্বকীয় আদর্শানুগ কোন চরিত্র অঙ্কিত করেন, তখন তাহাকে নাট্য-গীতি বলা যায়। ব্রাউনিংএর *The Lost Leader*, টেনিসনের *The Lady of Shalott*, রবীন্দ্রনাথের 'বন্দীবীর' এই শ্রেণীভুক্ত। আবার যখন গীতিকবিতায় কবি স্বকীয় ভাবনাচেতনাকে কোন কাহিনী বা চরিত্রের সাহায্যে উপস্থাপিত করিতে গিয়া বিশাল কোন পটভূমি বা কল্পনা লীলার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন সেই গীতিকাব্যটি পর্য্যন্ত মহাকাব্যোচিত গরিমায় মণ্ডিত হইয়া উঠে। ব্রাউনিংয়ের *Saul*, মোহিতলালের 'কালাপাহাড়' যতীনসেনের 'মর্ত্ত্য হইতে বিদায়' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

বৈষ্ণব কবিতা ও আধুনিক গীতিকবিতা

এইখানে বৈষ্ণব গীতিকবিতা ও আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার প্রভেদ লক্ষ্য করা সমীচীন। বৈষ্ণব কবিতা গান হিসাবে লিখিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব কবিগণ প্রত্যেকেই একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তাহাদের সাধনমার্গও সম্প্রদায়গত ছিল। তাই তাহাদের কাব্যে ব্যক্তিগত কথা অপেক্ষা সম্প্রদায়গত ও বিশিষ্ট সাধনতত্ত্বগত বাণীই অপূর্ব্ব বাণী-বিন্যাসে গীতি রূপ লাভ করিয়াছে। আধুনিক গীতিকবিতা মূলতঃ গান নহে, উহা প্রধানতঃ কবিতা, এবং দ্বিতীয়তঃ কবির ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণার স্বতঃস্ফূর্ত্ত গীতিরসোচ্ছল কবিতা। বৈষ্ণব কবিতায় গোষ্ঠীগত ধর্ম্ম চেতনা মানবরসকে ধর্ম্মরসে অভিষিক্ত করিয়াছে, আধুনিক গীতিকবিতায় বিশ্বচেতনা কবির আত্মচেতনায় মানবরসে স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। (বৈষ্ণব কবি মূলতঃ দ্বৈতবাদী বলিয়া তাঁহার জগৎ-দর্শন রাধাকৃষ্ণ রূপকের মধ্য দিয়া প্রকাশিত, আধুনিক গীতিকবির জগৎ দর্শন কোন রূপকের মধ্যে ধরা দেয় নাই। বৈষ্ণব কবিতার একমাত্র বিষয়বস্তু প্রেম, আধুনিক গীতিকবিতার বিষয়বস্তু বিচিত্র জীবনানুভূতি) বৈষ্ণব কবিতার বিশিষ্ট ব্যক্তি-অনুভূতি পরোক্ষ, আধুনিক গীতিকবিতার বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুভূতি প্রত্যক্ষ। তথাপি বলিতে হইবে যে, বৈষ্ণব কবিতা আধুনিক যুগের গীতিকবিতায় পর্য্যন্ত গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

* A pure lyrist....with his one voice sings only one tune....He is sometimes a warbbler because he is blind.—En. Brit.

বৈষ্ণব কবিতার গানের সুরটিই রবীন্দ্রনাথের সুরমাধুর্য্যে ধরা পড়িয়াছে, এমন কি বৈষ্ণব কবিতায় রাধাকৃষ্ণ প্রেম রবীন্দ্রকাব্যে 'তুমি আর আমি-র' প্রেমের মধ্যে আত্মস্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে।

চূড়ান্ত না হইলেও মোটামুটি হিসাবে গীতিকবিতার নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে।

ভক্তিমূলক

যে গীতিকবিতা ধর্ম্ম বা ভক্তিভাব অবলম্বনে লিখিত তাহাকে **ভক্তিমূলক** গীতিকবিতা বলে। শঙ্করাচার্য্যের স্তোত্রমালা, অক্ষয়কুমার বড়ালের 'কোথা তুমি', রামপ্রসাদের 'পদাবলী', গোবিন্দদাসের 'বন্দনাগীতি', Cardinal Newman-এর '*Lead Me Kindly Light*', Browning-এর *Saul* রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির কবিতা-নিচয়, রজনী সেনের 'নির্ঝর' এই শ্রেণীর কবিতা। রামপ্রসাদের সহজ স্বতঃ-উৎসারিত আকুলতা তাঁহার কাব্যকে অপূর্ব্বতা দান করিয়াছে। Browning-এর *Saul* কবিতাটির গীতি মাধুর্য্যের সঙ্গে নাটকীয়তার বেগ ও মহাকাব্যের বিশালতাবোধ সঞ্চার করা হইয়াছে।

এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, **বন্দনা-মূলক** কবিতাও ভক্তিমূলক হইতে পারে। যথা—নিশিকান্তের 'অরবিন্দ বন্দনা'।

স্বদেশ প্রীতিমূলক

যে গীতিকবিতা কবির স্বদেশ প্রীতি আশ্রয় করিয়া রূপ পরিগ্রহ করে, তাহাকে **স্বদেশপ্রীতিমূলক** গীতিকবিতা বলে। অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাবুদ্ধি, দেশের মাটির প্রতি কবির সশ্রদ্ধ অনুরাগ, বা দেশের অতীত বীর কাহিনীর প্রতি একান্ত অনুরাগ হেতু কবি ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার ব্যক্তি-অনুভূতির মধ্য দিয়া দেশচিত্তের অনুভূতিকে প্রকাশ করেন। ফরাসী স্বদেশ সঙ্গীত The Marsellaise, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ', অক্ষয় বড়ালের 'বঙ্গভূমি', যদুগোপালের 'জন্মভূমি', দ্বিজেন্দ্রলালের 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত।

প্রেমমূলক গীতিকবিতায় প্রেমের আশা-নৈরাশ্য বেদনা-মধুরতা প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া কবি আত্মগত ভাব-কল্পনার স্বতঃস্ফূর্ত রূপ দান করেন। ইংরেজী সাহিত্যে Burns-এর *My love is like a red, red, rose*, Donne-এর '*The Ecstasy*', Browning-এর *The Last Ride Together*, '*One Word More*', রবীন্দ্রনাথের 'গুপ্তপ্রেম', দেবেন সেনের 'লাজ ভাঙান', গোবিন্দদাসের 'আমি তোরে ভালবাসি' এবং জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন উল্লেখযোগ্য।

প্রেমমূলক

প্রকৃতি বিষয়ক গীতিকবিতায় কবি বাহ্য-প্রকৃতির রূপ-রস-স্পর্শ-শব্দকে নিজের অন্তর-রসে রসায়িত করিয়া আত্মগত ভাবকল্পনার অনুরূপ মূর্তি দান করেন। Wordsworth-এর *The Daffodils*, Keats-এর *Autumn*, রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষামঙ্গল', নজরুল ইসলামের 'বাদল দিনে', সত্যেন দত্তের 'ঝর্ণা', গোবিন্দদাসের 'বর্ষার বিল', কালিদাস রায়ের 'বাংলার দীঘি', মোহিতলালের 'কালবৈশাখী' এই শ্রেণীর কবিতা।

প্রকৃতি বিষয়ক

সনেট শব্দটি ইটালীয়ান 'সনেটো' (মৃদুধ্বনি) শব্দ হইতে উদ্ভূত। ইহা একপ্রকার মন্ময় কবিতা। একটি মাত্র অখণ্ড ভাবকল্পনা বা অনুভূতি-কণা যখন ১৪ অক্ষর সমন্বিত (কখনো কখনো ১৮ অক্ষরও ব্যবহৃত হয়) চতুর্দ্দশ পংক্তিতে একটি বিশেষ ছন্দোরীতিতে আত্মপ্রকাশ করে, তখন আমরা উহাকে সনেট নামে অভিহিত করি। ইটালীয়ান কবি Petrarch (১৩০৪-৭৪) ইহার জন্মদাতা। সনেটের ইতিহাসে পেত্রার্ক, দান্তে, ট্যাসো অপেক্ষা ইংরাজী সনেট লেখকগণ কম কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই। ষোড়শ শতাব্দীতে Wyatt এবং Surrey সর্ব্বপ্রথম সনেট কবিতা লিখেন। ইংরেজী সাহিত্যে সিডনি, সেক্সপীয়র, মিল্টন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কীটস্‌, এলিজাবেথ ব্যারেট্‌ ব্রাউনিং, ডি. জি. রসেটি, আর্ণল্ড, রুপার্ট ব্রুক প্রভৃতি সুবিখ্যাত সনেট রচয়িতা।

সনেট

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, চতুর্দ্দশ পংক্তিতে এই ধরণের কবিতা সুগঠিত। মধুসূদন দত্ত ১৪ অক্ষরই বাংলা সনেটের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং আজ পর্য্যন্ত কৃতী সনেট লেখকগণ এই নিয়মই পালন করিয়াছেন। সনেটের

প্রথম আট পংক্তিতে যে ভাব-কল্পনার ইঙ্গিত করা হয়, তাহাকে অষ্টক (*Octave*) বলে, পরবর্ত্তী যে ছয় পংক্তি পূর্ব্বোক্ত ভাব-কল্পনার বিস্তৃতি সাধন বা ব্যাখ্যা করে, তাহাকে ষট্‌ক (*Sestet*) বলে। অনেক কবি এই দুইটি বিভাগ না মানিয়া এই জাতীয় কবিতাকে একটি অখণ্ড কবিতামূর্ত্তি দান করেন। অষ্টকের আট পংক্তি আবার দুইভাগে বিভক্ত—চার পংক্তি সমন্বিত প্রত্যেকটি ভাগের নাম চতুষ্ক (*Quatrain*); ষট্‌কের তিন পংক্তি সমন্বিত দুই ভাগের প্রত্যেক ভাগকে ত্রিপদিকা (*Tercet*) বলে। মনে রাখিতে হইবে যে, সমগ্র কবিতাটি যেন একটি অখণ্ড ভাবের দ্যোতনা করে। পংক্তিগুলির মিলবিন্যাস সাধারণতঃ কখখক, কখখক, গঘঙ, গঘঙ, অথবা কখখক, কখখক, গঘ, গঘ, গঘ অথবা গঘঙ, গঘঙ। Shakespeare এই সনাতন পন্থা মানিয়া চলেন নাই; Milton এবং Wordsworth প্রায়শঃই ইটালীয়ান পন্থানুগ; Shakespeare-এর সনেটের মিলবিন্যাস এই—কখ, কখ, গঘ, গঘ, ঙচ, ঙচ, ছছ। সেকস্‌পীয়র অষ্টক ও ষট্‌কবিভাগ মানিয়া চলেন নাই। নিম্নে একটি সনেটের রূপ দেখান হইল :—

সায়ংকালের তারা

কার সাথে তুলনিবে, লো সুর-সুন্দরী,	ক
ও রূপের্ ছটা কৃরি এ ভব-মণ্ডলে ?	খ
আছে কি লো হেন খনি, যার গর্ভে ফলে	খ
রতন তোমাব মত, কহ সহচরি—	ক
গোধূলির ? কি ফণিনী, যার সু-কবরী	ক
সাজায় সে তোমাসম মণির উজ্জ্বলে ?—	খ
ক্ষণমাত্র দেখি তোমা নক্ষত্র মণ্ডলে	খ
কি হেতু ? ভাল কি তোমা বাসে না শর্ব্বরী ?	ক
হেরি অপরূপ রূপ বুঝি ক্ষুণ্ণ মনে	গ
মানিনী রজনী রাণী তেঁই অনাদরে	ঘ
না দেয় শোভিতে তোমা সখাদল সনে,	গ
যবে কেলি করে তারা সুহাস-অম্বরে ?	ঘ
কিন্তু কি অভাব তব, ও লো বরাঙ্গনে ?	গ
ক্ষণমাত্র দেখি মুখ, চির আঁখি স্মরে।	ঘ

—মধুসূদন দত্ত

উপরের সনেটটি ইটালিয়ান আদর্শে রচিত। মধুসূদন কবিতাটির অষ্টকে সায়ংকালের তারার সৌন্দর্য্যে যে বিস্ময় সঞ্চার করিয়াছেন, উহাই ষট্‌কে পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে। অষ্টক ও ষট্‌ক ভাগটিও সনেট-রীতি সম্মত, এবং ছন্দ অনেকাংশে আড়ষ্ট হইলেও আঙ্গিকের দিক দিয়া প্রথম ব্রতীর প্রচেষ্টা হিসাবে প্রশংসনীয়।

এইবার দেবেন সেনের একটি সেক্সপীরিয়ান সনেট লক্ষ্য করুন—

অশোক তরু

হে অশোক, কোন্ রাঙ্গা-চরণ-চুম্বনে	ক
মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিয়া হ'লি লালে-লাল	খ
কোন্ দোল-পুর্ণিমায় নব-বৃন্দাবনে	ক
সহর্ষে মাখিলি ফাগ্, প্রকৃতি দুলাল ?	খ
কোন্ চির-সধবার ব্রত-উদ্‌যাপনে	গ
পাইলি বাসন্তী শাড়ি সিন্দুর বরণ ?	ঘ
কোন বিবাহের রাত্রে বাসর-ভবনে	গ
একরাশি ব্রীড়া-হাসি করিলি চয়ন ?	ঘ
বৃথা চেষ্টা !—হায় ! এই অবনী-মাঝারে	ঙ
কেহ নহে জাতিস্মর—তরু জীব প্রাণী ?	চ
পরাণে লাগিয়া ধাঁধা আলোক-আঁধারে,	ঙ
তরুও গিয়াছে ভুলে অশোক-কাহিনী !	চ
শৈশবের আবছায়ে শিশুর 'দেয়ালা',—	ছ
তেমতি, অশোক, তোর লালে-লাল খেলা !	ছ

এইখানে অষ্টক ও ষট্‌ক বিভাগ বিশেষ অর্থব্যঞ্জক; মিলবিন্যাস—কখ, কখ, গঘ, গঘ, ঙচ, ঙচ, ছছ। অষ্টকে অশোক তরুর হাসির উল্লেখ, এবং শেষাংশে উহারই কবিত্বপূর্ণ মীমাংসা। কবি ভাব ও ভাষার পরিমিতি বোধ রক্ষা করিয়া একটি উৎকৃষ্ট সনেট রচনা করিয়াছেন।

এইবার মোহিতলালের একটী সনেট নিতেছি—

বিবেকানন্দ

কালরাত্রি পোহাইল ? পূর্ব্বাভাষ অসীম উষার	ক
দেখা যায় প্রাচী-প্রান্তে। মুমূর্ষু এজাতির শিয়রে	খ
জেগে বসেছিল যেই, মহামন্ত্র সে কর্ণকুহরে	খ
উচ্চারিয়া বার বার সে যে তুমি, হে চিরকুমার !	ক
জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম-বীর, বীর-বীর্য্য, প্রেমিক উদার,	ক
ইহ-পরত্রের বন্ধু, রথিশ্রেষ্ঠ সঙ্কট-সমরে—	খ
হে সংযমী, যমভয়-ভীত জনে অন্তিম প্রহরে	খ
দানিলে অভয়-দীক্ষা, ব্রহ্মবিদ্ ! চারিত্রে তোমার !	ক
তোমারে স্মরণ করি, স্মরে যথা তীর্থশেষে ফিরি'	গ
আপনার গৃহকোণে দীন গৃহী দূর গিড়ি-চূড়া—	ঘ
দেবতা নিবসে যথা, চন্দ্রমৌলী, তুষার-ধবল।	ঙ
পাদমূলে বহে বারি পিপাসার শির রহে ঘিরি	গ
চিরস্তব্ধ তারাস্তোম, বক্ষে তার বজ্র হয় গুঁড়া !	ঘ
জানে, আর হেরিবে না, জানে তবু—সে গিরি অচল।	ঙ

লক্ষ্য করিবার বিষয়, সনেটটির প্রত্যেক পংক্তি ১৮ অক্ষরের। নির্ম্মাণ-শিল্পের উৎকর্ষে ও ভাব-গাম্ভীর্য্যে ইহা একটি উৎকৃষ্ট সনেট।

যে কয়েকটি সনেট আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইবে যে, সনেট নির্ম্মাণ-নৈপুণ্য বিশেষ একটি আঙ্গিক-কুশলতার উপর নির্ভর করে। ইহার আঙ্গিক বিশেষ রীতিসম্মত হওয়ায় অনেক কবি ইহাকে কবি-কল্পনার স্ফূর্ত্তির পক্ষে প্রতিবন্ধক মনে করেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই বন্ধনকে বরং কল্পনা-বিস্তারের প্রভূত সহায়ক মনে করিতেন, তাই তিনি বলিয়াছিলেন—

> ......'t was pastime to be bound
> Within the Sonnet's scanty plot of ground.

D. G. Rossetti ও সনেটকে 'moment's monument' নামে অভিহিত করিয়াছেন। আসল কথা এই, যে-কাব্য-প্রতিভা রোমান্টিক কিন্তু অসংযত,

তাহার পক্ষে সনেট রচনা উপযোগী নয়। এইজন্যই ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যে যাহারা একাধারে কল্পনাপ্রবণ অথচ সংযত, তাঁহাদের হাতেই এই শ্রেণীর কবিতা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

অনেকে মনে করেন, সনেটে কবি আত্মজীবনী-কথা বিবৃত করেন। সনেট মন্ময় বা ব্যক্তিগত কবিতা, কাজেই কথাটি একেবারে অমূলক নয়। কিন্তু আধুনিক কাব্যের মন্ময়তা (subjectivity) এত ব্যাপক যে, যে-কোন বিষয় অবলম্বনেই সনেট লেখা যাইতে পারে। মিল্টন ও ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের সনেট বহু বিচিত্র ভাগে ভাগ করা যায়। সেক্সপীয়রের সনেটগুলি আত্মচরিত-মূলক বলিয়া অনেকে মনে করেন। ইহাদের সম্বন্ধে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ বলিয়াছিলেন, **'With this key he unlocked his heart'.** ইহার প্রতিবাদেই যেন ব্রাউনিং বলিয়াছিলেন, **If so, the less Shakespeare he'.** সেক্সপীয়রের সনেটে ব্যক্তিনিষ্ঠতা কতখানি, সেই জটিল তত্ত্ব আলোচনার অবসর এইখানে নাই। আমরা সংক্ষেপে বলিতে পারি যে, তাঁহার সনেটে আত্মকথা যেন নাটকীয়তায় পরিবেশিত হইয়াছে; রোসেটির ***The House of Life***এ কবির স্বকীয় প্রেম-কাহিনী বেদনা-বিমুগ্ধ কান্তি লাভ করিয়াছে। মধুসূদন তাঁহার কয়েকটি সনেটে সত্যই নিজের অন্তরতম মানুষটিকে ধরা দিয়াছেন; দেবেন সেনের সনেটে প্রেমবিমুগ্ধ কবির অন্তরাত্মা পরিস্ফুট হইয়াছে; মোহিতলালের সনেটগুলিতে ব্যক্তিপুরুষ অপেক্ষা কবি-মানসই অধিকতর প্রকাশ পাইয়াছে।

সনেটের নির্ম্মাণ-রীতি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখা দরকার:—

(১) ইহা সাধারণতঃ চতুর্দ্দশ অক্ষর (কখনো ১৮ অক্ষর) সমন্বিত চতুর্দ্দশটি পংক্তির কবিতা।

(২) ইহাতে একটি মাত্র ভাবের দ্যোতনা থাকে।

(৩) অষ্টক ও ষট্‌কের বিভাগ রক্ষা করা সনাতন রীতি হইলেও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকে এই নিয়ম মানিয়া চলেন নাই।

(৪) সনেটের ভাবে গভীরতা ও ভাষায় ঋজুতা থাকিবে।

(৫) বিশেষ নির্ম্মাণ-রীতি অনুসরণ করিতে হয় বলিয়া সনেটের স্বতঃস্ফূর্ত্তি অন্যান্য গীতি-কবিতার তুলনায় অনেক কম।

বাংলা সনেট

বাংলা সনেট রচয়িতা হিসাবে মধুসূদনের নাম সর্ব্বাগ্রে গণ্য। তিনিই বাংলা সনেটের আকৃতি ও মিলবিন্যাস নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। অধিকাংশ সনেটে সনাতন রীতি না মানিলেও এই শ্রেণীর কবিতার পথিকৃৎ হিসাবে তিনি স্মরণীয়। তাঁহার 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর' মধ্যে ভাবৈশ্বর্য্যের দিক হইতে 'বঙ্গভাষা' উল্লেখযোগ্য। মধুসূদনের পরবর্ত্তী নবীনচন্দ্র বা হেমচন্দ্রে সনেটের বিশেষ সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। তাঁহার পর দেবেন্দ্রনাথের 'অশোক গুচ্ছে' যে ভাবগভীর সংহত সনেট পাওয়া যায়, বাংলা কাব্য-সাহিত্যে তেমনটি খুব সুলভ নয়। ইঁহার পর অক্ষয়কুমার বড়াল। তাঁহার ভাব ও ভাষা উভয়ই প্রশংসনীয়; কিন্তু তাঁহার সনেট তেমন গীতিরসোচ্ছল নয়। অক্ষয়কুমারের পর রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের সনেটে একটি অখণ্ড ভাবের প্রকাশ থাকিলেও আঙ্গিকের দিক দিয়া উহাদের সম্পূর্ণতা নাই এবং মূলতঃ উহারা চতুর্দ্দশপদী কবিতা মাত্র। চৈতালি নৈবেদ্য প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের সনেটাকার কবিতাগুলিতে পর পর সাতটি পয়ার মাত্র রচনা করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে গীতিরসের উচ্ছলতা আছে, গাঢ়-পিনদ্ধ সংযম বা সনেটের মিল-বিন্যাস নাই। প্রমথ চৌধুরীর 'সনেট পঞ্চাশৎ' লঘু চতুর্দ্দশপদী কবিতা হিসাবে উল্লেখযোগ্য। আধুনিক কালে যাঁহারা সনেটে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তন্মধ্যে মোহিতলালের নাম সর্ব্বাগ্রে স্মরণীয়। তাঁহার সংযম বোধ, ভাবগভীরতা ও আঙ্গিক-কুশলতা তাঁহার সনেটকে অনন্যসাধারণ মর্য্যাদা দান করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, ইংরেজী সাহিত্যে যেমন Shakespeare, Rossetti (*The House of Life*) প্রভৃতি সনেট-পরম্পরা (Sonnet Sequence) রচনা করিয়াছেন, মোহিতলালও তেমন 'বঙ্কিমচন্দ্র' সম্বন্ধে একটি উৎকৃষ্ট সনেটগুচ্ছ রচনা করিয়াছেন। ডাঃ সুশীলকুমার দে-র সনেটগুলি বেশীমাত্রায় ইংরেজী প্রভাবিত হইলেও

নির্ম্মাণ-নিপুণতার দিক দিয়া প্রশংসনীয়। সাম্প্রতিক কালের সনেট-শিল্পীদের মধ্যে প্রমথ বিশী ও অজিত দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন কালে গ্রীক সাহিত্যে Chorus কর্ত্তৃক রঙ্গমঞ্চের উপর বিভিন্ন স্বরে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় সঙ্গীত ও নৃত্য সহযোগে যে-গান গীত হইত, তাহাই *Ode*• বা স্তোত্র নামে অভিহিত। গ্রীক Ode এক বা বহু কণ্ঠে গীত হইবার প্রথা ছিল। গ্রীক সাহিত্যে Alcaeus, Sappho, Anacreon, Pindar প্রমুখ কবিগণ স্তোত্র-কবিতা রচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে Pi ndar-এর রচিত স্তোত্র কবিতায় Strophe, (*turn*), Anti-strophe (*counter turn*) এবং Epode (*after song*) নামধেয় সুবিহিত শ্লোক-বিভাগ দৃষ্ট হয়। ইংরেজী সাহিত্যে Gray এবং Collins কখনো কখনো pindar-এর অনুকরণে কবিতা লিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের কবিতা সর্ব্বাংশে গ্রীকধর্ম্মী হইয়া উঠে নাই। কারণ গ্রীক কবিতায় নৃত্যগীতের সংযোগ হেতু তাহা যতখানি জীবন্ত মনে হয়, ইংরেজী কবিতায় তাহা না থাকায় উপবিউক্ত শ্লোক-বিভাগ ততখানি মূর্ত্ত হইতে পারে নাই। Gray-র সুবিখ্যাত *The Bard* কবিতাটি নয়টি স্তবকে লিখিত। কিন্তু Strophe, Anti-strophe ও Epode-এর সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্য ইহাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। *Ode on a Distant Prospect of Eton College* সম্বন্ধে এই কথা বলা চলে না। পরবর্ত্তীকালে ইংরেজী স্তোত্র-কবিতা গ্রীকপন্থী কবিতা হইতে অনেকটা পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। অধুনা যে প্রশস্তিমূলক (address) গীতিকবিতায় কোন সুমহান বা গাম্ভীর্য্য-ব্যঞ্জক বিষয়-বস্তু বা উপাদান আশ্রয় করিয়া কবি বিভিন্ন ধরণের ওজস্বী ছন্দে আত্মগত অনুভূতির ভাবমূর্ত্তি দান করেন, তাহাকে *Ode* বা স্তোত্র কবিতা নামে অভিহিত করা হয়। ইংরেজী সাহিত্যে Milton-এর *Ode on the morning of Christ's Nativity*, Dryden-এর *Alexander's Feast*, Gray-র *The Bard*, Collins-এর *Ode to Evening*, Wordsworth এর *Intimation Ode*, Shelley-র *Ode to the Westwind*, Keats এর *Ode*

স্তোত্র কবিতা

to a Nightingale, টেনিসনের *Ode on the Death of the Duke of Wellington* কয়েকটি বিখ্যাত স্তোত্র কবিতা। (বাংলায় সুরেন্দ্র মজুমদারের "মাতৃস্তুতি", অক্ষয় বড়ালের 'মানব বন্দনা', সত্যেন দত্তের 'নমস্কার', রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ', 'আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো, পৃথিবী' এবং মোহিতলালের 'নারীস্তোত্র' ও 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উল্লেখযোগ্য।)

চিন্তামূলক গীতিকবিতায় কবি জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে রূপদান করেন। Browning-এর *Rabbi Ben Ezra*, হেমচন্দ্রের 'জীবন-সঙ্গীত', রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব', মোহিতলালের 'পাপ', যতীন সেনগুপ্তের 'নবপন্থা' এই শ্রেণীর কবিতা। রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' কবিতাটির প্রথম কয়েকটি স্তবক পড়িলে মনে হয়, ইহাকে স্তোত্র কবিতা বলিলে অসমীচীন হইবে না। কিন্তু কবিতাটির শেষার্দ্ধে রবীন্দ্র কবি-মানসের ভাব-কল্পনা প্রবল হইয়া কবিতাটিকে যে স্তরে লইয়া গিয়াছে, উহাতে আমরা ইহাকে চিন্তামূলক কবিতা লক্ষণাক্রান্ত মনে করি। বলা বাহুল্য, অনেক উৎকৃষ্ট কবিতার শ্রেণীবিভাগ এইভাবে দুরূহ হইয়া পড়ে।

চিন্তামূলক

গ্রীক *Elegos* শব্দ হইতে *Elegy* শব্দটি আসিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক Elegy শোকাত্মক কবিতা নয়। শোকসঙ্গীতে (Elegy) কবি ব্যক্তিগত বা জাতীয় শোক-কাহিনীকে ভাষা দান করেন। যখন কবিতায় ব্যক্তি-বিশেষের শোকানুভূতি রূপলাভ করে, (যথা—Milton এর *Lycidas*, Shelleyর *Adonais*) তখন উহাকে *Monody* বলা হয়। ইংরেজী সাহিত্যেব সুবিখ্যাত শোকগীতি Gray's *Elegy*—কোন ব্যক্তি-বিশেষের শোকে রচিত নয়। ইহার বিষয়-বস্তু উপেক্ষিত দীন-দরিদ্রের জীবনের ব্যর্থতার ইতিহাস। এই জন্যই কবির বেদনাবোধ এইখানে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক না হইয়া মানব-কেন্দ্রিক হইয়া উঠিয়াছে।

শোক গীতি

শোকানুভূতির আন্তরিকতাই শোকসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ের মানদণ্ড। কোন কোন শোক সঙ্গীতে কবির ব্যক্তিগত বেদনা সর্বমানবের বেদনারূপে ভাষা পাইয়া

থাকে। ইহাতে অবশ্য উহার মর্য্যাদা আরও বর্দ্ধিত হয়। বাংলা সাহিত্যে শোকসঙ্গীতের মধ্যে বিহারীলালের 'বন্ধু-বিয়োগ', অক্ষয় কুমার বড়ালের 'এষা', রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ', গোবিন্দ দাসের 'বঙ্কিম-বিদায়', করুণানিধানের 'উদ্দেশে' ও নজরুলের 'চিত্তনামা' উল্লেখযোগ্য। অনেক সময় শোক-কবিতা স্বর্গত বন্ধুর স্তুতি-সূচকও হইতে পারে। Tennyson-এর *In Memoriam*-এ কবির বন্ধুপ্রীতি, বন্ধুর স্মৃতি-পূজা ও কবির জীবন-জিজ্ঞাসার পরিচয় রহিয়াছে। আধুনিক সাহিত্যে শোকগীতি অনেক সময় সাহিত্য-সমালোচনার বাহন রূপেও ব্যবহৃত হয়। এই প্রসঙ্গে Matthew Arnold-এর *Heine's Grave*, Watson-এর *Wordsworth's Grave* ও রবীন্দ্রনাথের 'সত্যেন দত্ত'র নাম করা যাইতে পারে।

গ্রীক কবিতা অনুকরণে ইংরেজী সাহিত্যে দেখা যায় যে, কোন কোন সময় কবি তাহার বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু উপলক্ষে রাখালের মুখে বেদনার ভাষা দান করেন এবং তাহার উক্তির মাধ্যমেই স্বকীয় শোকসন্তপ্ত চিত্তের পরিচয় প্রদান করেন। এইজন্য তাঁহাকে সমীচীন রাখালিয়া পরিবেশও (pastoral surrounding) রচনা করিতে হয়। এই শ্রেণীর শোক-গীতিকে রাখালিয়া শোক-গীতি (*Pastoral Elegy*) বলা যাইতে পারে। ইংরেজীতে Milton-এর *Lycidas*, Shelley-র *Adonais*, Arnold-এর *Thyrsis*, বাংলায় কালিদাস রায়ের 'কৃষাণীর ব্যথা' ও যতীন সেনের 'চাষার ঘরে' এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

Verse de Societe or Convival lyric

যে ধরণের গীতিকবিতায় জীবনের লঘু আনন্দের দিকটি ও সমাজ-জীবনের লঘু চিত্রটি কবির ব্যক্তি-অনুভূতি দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাহাকে *Verse de Societe* বা লঘু বৈঠকী-কবিতা বলে। ইংরেজী সাহিত্যে Austin Dobson, Herrick এবং বাংলায় অপরাজিতা দেবী ('বুকের বীণা') এই শ্রেণীর কবিতা লিখিয়াছেন।

বাংলা গীতিকাব্যের ইতিহাসে বিহারীলালের নাম সর্ব্বাগ্রে স্মরণীয়। ইতিপূর্ব্বে অবশ্য মধুসূদন (১৮২৪-৭৩) 'ব্রজাঙ্গনাকাব্যে' বৈষ্ণবকবির সুরমাধুর্য্য ও ভাবমাহাত্ম্যটি অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং কয়েকটি চতুর্দ্দশপদী কবিতায় ও 'আত্মবিলাপে' গীতি-কবিতার রূপটি মূর্ত্ত করিয়াছিলেন। এইগুলিতে সত্যই কবি নিজের হৃদয়-গবাক্ষ খুলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু বিহারীলালই (১৮৩৪-৯৪) প্রথম খাঁটি প্রাণের ভাষায় প্রাণের গভীর আকূতিটি বাংলা কাব্যে প্রকাশ করেন। তাঁহার 'সারদামঙ্গল' একটি অপরূপ গীতিকবিতাগুচ্ছ। বিহারীলালের আত্মনিষ্ঠতা ও ব্যক্তিগত ভাবতন্ময়তা পরবর্ত্তী কবি অক্ষয়কুমার বড়ালে (১৮৬০-১৯১৮) পরিণতি লাভ করিয়াছে। তাঁহার গীতিকাব্যের মধ্যে প্রদীপ, কনকাঞ্জলি ও এষা বিখ্যাত। দেবেন্দ্রনাথ সেনের (১৮৫৫-১৯২০) অধিকাংশ গীতিকবিতায় নারী কল্পনা-কান্ত রূপে বিভূষিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'অশোকগুচ্ছ' উৎকৃষ্ট। বিহারীলাল ও দেবেন্দ্রনাথের আবির্ভাব কালের মধ্যে যে কয়েকজন গীতিকবির পরিচয় পাওয়া যায়, তন্মধ্যে যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৭-১৯০০), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) সুরেন্দ্র মজুমদার (১৮৩৮-৭৮), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৪০-১৯২৬) ও নবীনচন্দ্র সেনের (১৮৪৭-১৯০৯) নাম করা যাইতে পারে। হেমচন্দ্রের সহজ ভাবপ্রবণতা, সুরেন্দ্রনাথের মননশীলতা, দ্বিজেন্দ্রলালের লঘু-সরসতা ও নবীনচন্দ্রের উচ্ছ্বাসপ্রবণতা বিশেষ লক্ষণীয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪০-১৯২৬) 'স্বপ্নপ্রয়াণ' (১৮৭৫) নামক রূপক কাব্যটিও এই কালের বাংলা গীতিকাব্যের ইতিহাসে স্মরণীয় [illegible] ও Dante-র প্রভাব সুস্পষ্ট।

বাংলা-গীতিকাব্য

দেবেন্দ্রনাথের পর স্বভাব-কবি গোবিন্দ দাস (১৮৫৫-১৯১৮)। নিজের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও বেদনা তাঁহার কাব্যে একটি সাবলীল বাণীমূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। তাঁহার প্রেমকাব্যের তীব্র বাস্তবানুভূতি বাংলা সাহিত্যে সত্যই দুর্লভ। কস্কুম, কস্তুরী, প্রেম ও ফুল এবং বৈজয়ন্তী তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ। তাঁহার পর রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১)। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' হইতে 'শেষলেখা' পর্য্যন্ত

অজস্র গীতিকবিতায় ও গানে বাংলা কাব্যসাহিত্যকে তিনি বিশ্বসাহিত্যের তুল্য মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। ভাষা ও ছন্দকে তিনি কত রূপে কত বর্ণে সাজাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক তিনজন মহিলা কবিও—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪), মানকুমারী বসু (১৮৬২-১৯৪৩) ও কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩)—বাংলা গীতিকাব্যে বিশিষ্ট সুর সংযোজনা করিয়াছেন। 'অশ্রুকণার' কবি গিরীন্দ্রমোহিনীর সহজ সৌন্দর্য্যবোধ ও বেদনাবিধুরতা, 'কাব্য কুসুমাঞ্জলি'র কবি মানকুমারীর আদর্শপ্রবণতা ও 'আলো ও ছায়ার' কবি কামিনী রায়ের বেদনা-কান্ত জীবনানুভূতি বাংলা গীতিকাব্যে একটি বিশিষ্ট কোমলতা সঞ্চার করিয়াছে।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫) প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বর্ণনা, চিত্রাত্মক কল্পনা ও শব্দচয়ন-শিল্পে অনন্যসাধারণ। প্রসাদী, ঝরাফুল, ধানদুর্ব্বা তাঁহার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-৪৮) বাঙ্গালী জীবনের সুখ দুঃখ ও বাংলার পল্লীপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য বর্ণনায় আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন। তাহার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রেখা, অপরাজিতা ও মহাভারতী বিখ্যাত। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮১-১৯২২) রবীন্দ্র-শিষ্য হইলেও বিভিন্ন কবিপ্রকৃতি সম্পন্ন। তাঁহার গীতিকবিতায় অনুভূতি অপেক্ষা মননশীলতা বেশী। কিন্তু বিচিত্র ছন্দের উপর তাঁহার অসামান্য অধিকার। 'কুহু ও কেকা', 'অভ্র-আবীর' ও 'বেলা শেষের গান' তাঁহার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের ভক্তি-রসাপ্লুত প্রেমকাব্যের সুরটি কুমুদরঞ্জন মল্লিকে (১৮৮২) নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। বনতুলসী, বীথি ও নূপুর তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ। 'নূতন খাতার' কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৭-১৯৩১) বেদনা-মধুর অপূর্ব্ব গীতিকাব্য রচনা করিয়াছেন। যতীন্দ্র সেনের (১৮৮৭-১৯৫৪) কাব্যে বেদনার অশ্রু আত্মস্থ ভাবকল্পনায় নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। মরীচিকা, মরুশিখা, মরুমায়া ও সায়ম্ তাঁহার রচিত বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) রবীন্দ্রযুগের এবং মূলতঃ রোমান্টিক হইলেও কাব্যে সনাতন রীতির (Classicism) পক্ষপাতী;

ভাবগভীরতা, চিত্রাত্মক কল্পনা ও ভাস্কর্য্য-মহিমা তাঁহার কবিতার বিশেষত্ব। স্বপনপসারী, বিস্মরণী ও স্মরগরল, হেমন্ত গোধূলি তাঁহার কাব্যগ্রন্থ। কালিদাস রায়ের (১৮৭৯) কাব্যে বাংলার মাঠঘাট ও পল্লীপ্রকৃতি মমতা-স্নিগ্ধ রূপ পাইয়াছে। কুন্দ, পর্ণপুট ও ব্রজবেণু তাঁহার কাব্যগ্রন্থ। নজরুল ইস্‌লাম (১৮৯৯) বাংলা কাব্যে বিশেষ একটি গীতিমাধুর্য্য সঞ্চার করিয়াছেন। জসীম-উদ্দীনে (১৯০৩) বাংলার অবহেলিত মানবজীবন সহজ গীতিচ্ছন্দে রূপ পাইয়াছে। আধুনিক কালের অন্যান্য কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্র দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু ও সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের নাম করা যাইতে পারে।

৬

বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় কবিতা

কবিতা প্রধানতঃ দুই প্রকার—আত্ম-নিষ্ঠ বা মন্ময় কবিতা এবং বস্তু-নিষ্ঠ বা তন্ময় কবিতা, এই কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বস্তু-নিষ্ঠ বা তন্ময় কবিতাকে আবার যে-কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, তাহা নিম্নে আলোচিত হইল।

গাথাকবিতা

Ballad শব্দটি ফরাসী *Baller* (নৃত্য) শব্দ হইতে আসিয়াছে। প্রাচীনকালে নৃত্য সহযোগে যে-কবিতা গীত হইত, তাহাকেই গাথাকবিতা বলা হইত। অধুনা, গাথা বলিতে আমরা কোন লোকপ্রিয় পল্লীগান অথবা ব্যক্তিবিশেষ বা প্রতিষ্ঠানের সমালোচনামূলক সহজ, সাবলীল, লঘুগতি কবিতাকে বুঝিয়া থাকি। পল্লীসঙ্গীতে বহু অজ্ঞাত লোকের রচিত বা মুখে মুখে প্রচলিত এই জাতীয় কবিতা পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের মধ্যযুগীয় ***Robin Hood*-সংক্রান্ত** গাথাকবিতা, **Percy-র *Reliques*** নামক কবিতা-সংগ্রহ (১৭৬৫) এবং বাংলায় বহুজনের রচিত 'ময়মনসিংহ গীতিকা', এবং 'গোপীচাঁদের গীত' এই শ্রেণীর কবিতা। গাথাকবিতা হিসাবে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য্য। খুব সম্ভব, ইহার কবিতাবলী গীত হইত বলিয়া ইহাদিগকে গীতিকা বলা হইয়াছে। বিভিন্ন লোকের রচনা বলিয়া ইহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি-মানসের পরিচয় না থাকিলেও ইহারা ময়মনসিংহবাসীদের দৈনন্দিন জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রসঙ্গক্রমে ইহাদের মধ্যে ইতিহাস পুরাণ ধর্ম্মতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব ঢুকিয়া পড়িয়াছে। এই কাব্য দুইটিতে সাধারণ লোকের জীবনকাহিনী অতি সাধারণ নিরাভরণ অথচ হৃদয়স্পর্শী ভাষায় রূপায়িত হইয়াছে। আখ্যানবস্তু গ্রন্থন-চাতুর্য্যে, জীবনের বাস্তব অনুভূতি রূপায়নে, চরিত্রাঙ্কনে এবং সহজ ও সরস ভাষার গৌরবে, 'মৈমনসিংহ গীতিকা' বাংলা সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। কেহ কেহ ইহাকে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের অগ্রদূত বলিয়া মনে করেন।

গাথাকবিতা অধিকাংশ স্থলেই এক বা বহুজনের রচিত হইতে পারে। প্রাচীন গাথা সাহিত্যে এত প্রক্ষিপ্ত রচনা আছে যে, উহাদের সুনিশ্চিত লেখক-পরিচয় সহজে জানা যায় না।

সত্যকার সাহিত্যিক গাথা (*Literary Ballads*) বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার মধ্যে আখ্যান-ভাগ বা বিশেষ একটি ঘটনাংশ (ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনা নহে) থাকিবেই। গল্পের কাহিনী সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর ভাষায় প্রকাশ করাই কবির প্রধান কাজ। গল্পাংশ বর্ণনায় নাটকীয় সংস্থান-সৃষ্টি বিশেষ প্রয়োজনীয়। গাথাকবিতা বস্তু-নিষ্ঠ বলিয়া ইহাতে লেখকের আত্মগত ভাব-কল্পনা অপেক্ষা জনগণ-নিষ্ঠ ভাব-কল্পনার প্রাধান্য অধিক। সুতরাং ইহাকে গীতিকবিতাধর্মী মনে করা যাইতে পারে না।* অনেক সময় গাথায় বীরোচিত কাহিনী-সংস্থান বা অতি-প্রাকৃত সমাবেশ থাকিতে পারে; কিন্তু ইহাতে কোন উপদেশ বাণী বা রূপ-সজ্জার প্রয়োজন নাই। স্বকীয় নিরাভরণ আভরণ-গৌরবে ও সর্ব্বাঙ্গীণ স্বচ্ছ-সহজতায় ইহা আমাদিগকে মুগ্ধ করে। কোন কোন গাথাকবিতায় দুই চারিটি ছত্রের পুনরাবৃত্তি দ্বারা যে 'ধুয়া' (*Burden* বা *Refrain*) সৃষ্টি করা হয়, তাহা কবিতার আখ্যান ভাগটিকে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে অনলসভাবে জাগ্রত করিয়া রাখে।

গাথাকবিতা অনুকরণে আধুনিক সাহিত্যেও কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ইংরাজীতে Cowper-এর *John Gilpin*, Keats-এর *La Belle Dame Sans Merci*, Rossettiর *The White Ship* এবং বাংলায় রবীন্দ্রনাথের 'স্পর্শমণি', 'পণরক্ষা', সত্যেন দত্তের 'ইন্সাফ', কুমুদ মল্লিকের 'শ্রীধর' উল্লেখযোগ্য।

বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্যে কাহিনী-কাব্য নামে এক শ্রেণীর বর্ণনাত্মক

কাহিনী-কাব্য

(*Narrative Story Poems*) কবিতা দেখা যায়। রামায়ণ মহাভারতে, কবিকঙ্কন ও ভারতচন্দ্রের কাব্যে এই শ্রেণীর

---

* *Cf* :—'The first and foremost quality about Ballad is not its personality, but its impersonality'.—*F. Sidgwick : The Ballad.*

ধর্ম্মমূলক কবিতা দৃষ্ট হয়। কিন্তু কাব্যের পরিপোষক হিসাবেই ইহাদের মূল্য, ইহাদের কোন স্বতন্ত্রতা নাই। আধুনিক কালের কাহিনী-কাব্যে সাধারণতঃ পৌরাণিক, কাল্পনিক বা বাস্তব ঘটনা প্রভাবিত কোন বিষয়বস্তু অথবা কোন চরিত্র বা ভাবমণ্ডল গল্পের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়। উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন কবি কাহিনী-কাব্য রচনায় দক্ষতা দেখাইয়াছেন। তন্মধ্যে রঙ্গলালের 'কাঞ্চী-কাবেরী', কামিনী রায়ের 'মহাশ্বেতা' উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কাহিনী-কাব্যে আখ্যানভাগ রচনা-শিল্পের সহিত সার্থক চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়। তাঁহার পরিশোধ, মুক্তি, ফাঁকি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কাহিনী-কবিতা। ইংরেজী সাহিত্যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, বায়রণ, কীটস্ এই শ্রেণীর কবিতা লিখিয়াছেন।

গাথা-কবিতা প্রসঙ্গে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আর একশ্রেণীর কবিতার নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইহাদের নাম মঙ্গলকাব্য। দেবতা বিশেষের মঙ্গলগান

মঙ্গলকাব্য

ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে বলিয়া ইহাদিগকে দেবদেবীর নামের অন্তে 'মঙ্গল' শব্দ যোগ করিয়া আখ্যায়িত করা হয়। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও ধর্ম্মমঙ্গল* তিনখানি বিখ্যাত মঙ্গলকাব্য। দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার যদিও মঙ্গলকাব্যের উদ্দেশ্য তথাপি ইহাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেবদেবীর দেবোচিত গৌরব রক্ষা হয় নাই।

মঙ্গলকাব্যগুলি আকারে বৃহৎ। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কাহিনী কোনমতে সংগ্রথিত করিয়া কবি ইহাদের বিপুলকায় করিয়া তুলিয়াছেন। বর্ণনা-কুশলতা এবং অনেক সময় নাটকীয় গুণ থাকা সত্ত্বেও, এবং তৎকালীন সামাজিক চিত্রের উপকরণ হিসাবে কাব্যগুলির ঐতিহাসিক মূল্য থাকিলেও, কাব্যগুলিতে বস্তু ও ভাব-সামঞ্জস্যের এমন অভাব দৃষ্ট হয়, যে ইহাদিগকে শ্রেষ্ঠ শিল্প-সৃষ্টি বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কেহ কেহ ইহাদিগকে 'মহাকাব্য' বলিয়া অভিহিত করিতে চাহেন। সত্য কথা বলিতে কি, ইহারা যদিও বিভিন্ন কালে বিভিন্ন লোকের

---

* ডাঃ সুকুমার সেন 'রায়মঙ্গল' নামক আর একশ্রেণীর কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণরাম দাস রায়মঙ্গলের (১৬০৮) শ্রেষ্ঠ কবি।

হাতে পড়িয়া স্ফীতকলেবর লাভ করিয়াছে তবু ইহাদিগকে **Epic of growth** মনে করিলে চলিবেনা। ইহাদের গঠন-শিল্পে মহাকাব্যের দৃঢ়-পিনদ্ধ সৃষ্টি-কৌশল নাই, ইহাদের ছন্দে সে উদাত্ত গাম্ভীর্য্য নাই – এবং সর্ব্বোপরি, ইহাদের ভাবকল্পনা যেন 'জাতির অতল জঠর হইতে উদ্ভূত' হয় নাই। ফলে, মহাকাব্যে যে সাবলিমিটি বা মহিমময় ব্যঞ্জনা থাকে, তাহাও ইহাতে নাই। ইহাও ভুলিলে চলিবেনা যে, 'মঙ্গলকাব্য মূলে গান, দিন দুই পালা করিয়া আটদিনে ষোল পালায় গীত হইত'। উপরিউক্ত কারণে মঙ্গলকাব্য মহাকাব্য বলিয়া অভিহিত হইবার দাবী রাখিতে পারে না। ইহাদিগকে কাহিনী-কাব্য বলাই সঙ্গত হইবে এবং কাহিনী-কাব্যের মাপকাঠিতেই ইহাদের বিচার করা সমীচীন হইবে। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে প্রাচীনতম—বিজয়গুপ্তের* (খৃঃ ১৫শ শতাব্দী) 'মনসা-মঙ্গল' আখ্যান-রচনায়, কল্পনা ও কবিত্বের উৎকর্ষে, এবং সর্ব্বোপরি চাঁদের চরিত্রাঙ্কনে উৎকৃষ্ট কাহিনীকাব্য হইয়াছে। চাঁদসদাগরের চরিত্র ট্র্যাজিডির নায়ক-সুলভ মর্য্যাদায় অভিষিক্ত—এ যেন গ্রীকশিল্প *Laocoon*এর কথা মনে করাইয়া দেয়। নিয়তি-নির্য্যাতিত হইয়াও চাঁদ আত্ম-বিশ্বাসে পরম আস্থাবান, প্রাণ-প্রতিম পুত্রকে হারাইয়াও সে আদর্শকে জড়াইয়া ধরিতেছে, নুইয়া পড়িলেও সে ভাঙিয়া পড়িতেছে না। বস্তুতঃ কাহিনী-কাব্যে চাঁদসদাগর 'মৈনাকের চূড়ার' মত উন্নতশীর্ষ হইয়া মানুষের জয় ঘোষণা করিয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যহিসাবে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। মুকুন্দরামের কাব্যে তৎকালীন সামাজিক জীবনের নিখুঁত চিত্রের বাস্তবতা অনেক সময় Chaucerকে মনে করাইয়া দেয়। ফুল্লরা খুল্লনা—এই দুইটি নারী চরিত্র অঙ্কনে, এবং বিশেষ করিয়া কালবিজয়ী দুর্ব্বৃত্ত—ভাঁড়ুদত্তের চরিত্র-চিত্রে কবির দক্ষতা অতুলনীয়। তথাপি, মহাকাব্যোচিত সমুন্নতি তাঁহার কাব্যে ফুটিয়া উঠে নাই। বরং 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য পদ্যে লিখিত উপন্যাসের আকৃতি ও প্রকৃতি লাভ করিয়াছে।

* অন্যান্য মনসামঙ্গল রচয়িতাদের মধ্যে বংশীবদন, নারায়ণদেব ও বিপ্রদাস পিপিলাইর নাম উল্লেখযোগ্য।

এই মঙ্গলকাব্যগুলির বৈশিষ্ট্য এই :—

(১) এই কাব্যের আখ্যানভাগ (Plot) নায়কের সহিত দেব-দেবীর দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া বিপুলায়তন রূপে পরিস্ফুট হয়।

(২) ইহাতে সৃষ্টি-কথা বর্ণনাপ্রসঙ্গে কাব্যলক্ষ্মীর বন্দনা করা হয়। কবি প্রায়ই স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া কাব্য-রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

(৩) ইহাতে দেবতা মর্ত্ত্যলোকে পূজিত হইবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন।

(৪) ইহাতে সুখদুঃখের বারমাসী গান, চৌতিশা স্তুতি, নারীর পতিনিন্দা-বর্ণনা, রন্ধন-শিল্প বর্ণনা, ফলফুল পশুপক্ষীর আলোচনা—প্রভৃতির অবতারণা করা হয়।

(৫) ইহার ছন্দ সাধারণতঃ পয়ার ও ত্রিপদী।

(৬) দেবচরিত্র ছাড়া কোন কোন কাব্যে মানব-চরিত্র অঙ্কনও (যথা ভাঁড়ুদত্ত, চাঁদসদাগর) ইহাতে দেখা যায়।

(৭) এই শ্রেণীর কাব্যে তৎকালীন ধর্ম্ম, রাষ্ট্র ও সমাজের চিত্র অঙ্কিত হইয়া থাকে।

মহাকাব্য

মহাকাব্য তন্ময় কাব্য। ইহা ব্যক্তি-নিষ্ঠ নহে, বস্তু-নিষ্ঠ ; লেখকের আন্তর অনুভূতির প্রকাশ নহে, বস্তু-প্রধান ঘটনা-বিন্যাসের প্রকাশ ; গীতিকাব্যোচিত বাঁশির রাগিনী নহে, যুদ্ধসজ্জার তূর্য্য-নিনাদ। এতদ্ব্যতীত, ইহা মহাকায়, মহিমোজ্জ্বল, ব্যাপক হিমাদ্রি-কান্তির মত ধীর, গম্ভীর, প্রশান্ত, সমুন্নত ও মহত্ত্বব্যঞ্জক। এই কাব্যে কবির আত্মবাণী অপেক্ষা বিষয়-বাণী ও বিষয়-বিন্যাসই আমাদের অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে আশীর্ব্বচন, নমস্ক্রিয়া অথবা বস্তু-নির্দ্দেশ

দ্বারা কাব্যারম্ভ হয়। মহাকাব্যের আখ্যান-বস্তু পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক.* এবং নায়ক †ধীরোদাত্তগুণসমন্বিত অর্থাৎ সমস্ত সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত; সর্গ-সংখ্যা অষ্টাধিক এবং পটভূমি স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল-প্রসারী। ইহাতে শৃঙ্গার, বীর, শান্ত— এই তিনটির একটি রস মুখ্য বা প্রধান এবং অন্যান্য রস ইহাদের অঙ্গস্বরূপ হইবে। প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে বিভিন্ন ছন্দে প্রকৃতি, যুদ্ধবিগ্রহ, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল প্রভৃতির বর্ণনাও থাকিতে পারে। ইহার ভাষা ওজস্বী ও গাম্ভীর্য্য-ব্যঞ্জক হইবে। নায়কের জয় বা আত্ম-প্রতিষ্ঠার মধ্যে মহাকাব্যের সমাপ্তি হইবে—কারণ, সাধারণতঃ, ইহাতে ট্র্যাজিডির স্থান নাই।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে যাহা মহাকাব্য, তাহার সহিত পাশ্চাত্ত্য এপিকের কোন কোন বৈসাদৃশ্য থাকিলেও উহাদের মধ্যে ভাবগত সাদৃশ্য বর্ত্তমান। পাশ্চাত্ত্য আলঙ্কারিক Aristotle-এর মতে, মহাকাব্য আদি, মধ্য ও অন্ত-সমন্বিত বর্ণনাত্মক কাব্য—ইহাতে বিশিষ্ট কোন নায়কের জীবন-কাহিনী অখণ্ডরূপে একই বীরোচিত ছন্দের সাহায্যে কীর্ত্তিত হয়।

তিনি বলেন -

'An epic should be based on a *single action*, one that is a complete whole in itself, with a biginning, middle and end, so as to enable the work to produce *its own proper pleasure* with all the organic unity of a living creature....As for its metre, the heroic has been assigned it from experience'.

পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্য আলোচনা করিলেও বুঝা যায় যে, ইহা সাধারণতঃ বস্তু-নিষ্ঠ, আদি-মধ্য-অন্ত-সমন্বিত বর্ণনাত্মক কাব্য; ইহার বস্তু-উপাদান জাতীয়-জীবনের ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক তথ্য; ইহার অনুপ্রেরণা অধিকাংশ সময়েই ঐশীশক্তি; ইহাতে মানব, দানব ও দেবদেবীর চরিত্রের সমাবেশ ও প্রয়োজনবোধে অতি-লৌকিক স্পর্শও থাকিতে পারে। মহাকাব্যের পরিসমাপ্তি

* ইতিহাসোদ্ভবংবৃত্ত মন্যদ্বা সজ্জনাশ্রয়ম্—বিশ্বনাথ

† কখনো কখনো এক বা একাধিক নায়কও থাকিতে পারে।

সকল সময়েই শুভান্তিক হইবে এমন কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। ইহাতে জটিল ঘটনাবর্ত্তের সৃষ্টি এবং বহুবিধ চরিত্র-সন্নিবেশ থাকিলেও সমগ্র কাব্যটিতে একটি অখণ্ড শিল্প-সঙ্গত সৌন্দর্য্য-বোধ ও মহত্ত্ব-ব্যঞ্জক গাম্ভীর্য্য থাকিবে। ইহার ভাষা প্রসাদগুণসম্পন্ন, ওজস্বী ও অনুপ্রাস-উপমা প্রভৃতি অলঙ্কার-বহুল। সুতরাং পাশ্চাত্ত্য আদর্শের অনুসরণে আমরা মহাকাব্যের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিতে পারি যে, দৈবী-প্রেরণা অনুপ্রাণিত নানা সর্গে বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত যে-কাব্যে কোন সুমহান্ বিষয়-বস্তুকে অবলম্বন করিয়া এক বা বহু বীরোচিত চরিত্র অথবা অতিলৌকিক-শক্তি-সম্পাদিত কোন নিয়তি-নির্দ্ধারিত-ঘটনা ওজস্বী ছন্দে বর্ণিত হয়, তাহাকে **মহাকাব্য** বলে।

মহাকাব্যের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, অনেক সময় কোন কোন মহাকাব্যের রচয়িতা সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া জানা যায় না। কারণ ইহারা 'একলা কবির কথা' নহে। যুগে যুগে বিভিন্ন অজ্ঞাতনামা লেখকের হাতে পড়িয়া কাব্যের মূল বিষয়টী বর্দ্ধিতায়তন হইয়া উঠিয়াছে, অথবা বিভিন্ন চরিত্র অবলম্বনে বিভিন্নলোকের লেখা একত্র সংগ্রথিত হইয়া মহাকাব্য বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বদেশের হৃৎপদ্ম-সম্ভব এই শ্রেণীর কাব্য যেন 'বৃহৎ বনস্পতির মতো দেশের ভূতল-জঠর হইতে উদ্ভূত হইয়া সেই দেশকেই আশ্রয়চ্ছায়া দান করিয়াছে'। এই শ্রেণীর মহাকাব্যকে *Epic of Growth* বা *Authentic Epic* নামে অভিহিত করা হয়। রামায়ণ, মহাভারত, *The Iliad, Odyssey, Beowulf* এই শ্রেণীর মহাকাব্য। বলা বাহুল্য যে, বিভিন্ন লোকের রচিত এই শ্রেণীর মহাকাব্যের মধ্যেও জাতির সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনুভূত হয়।

কিন্তু একজন গ্রন্থকারের লিখিত যে-মহাকাব্যে কোন জাতির সর্ব্বলোকের সাধনা, আরাধনা ও সঙ্কল্প কোন পরম গুণান্বিত নায়কের মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া ওঠে, এবং জাতি-হৃদয়ের দর্পণরূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়, তাহাকেই আমরা সাহিত্যিক মহাকাব্য বা *Literary Epic* বা *Imitative Epic* বলিয়া গ্রহণ করি। এই শ্রেণীর মহাকাব্য

পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর মত স্ফীতকায়, অসংহত ও অসমঞ্জস কলেবর-মাহাত্ম্যে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনা; ইহার আখ্যানবস্তু, চরিত্র-সৃষ্টি, ভাষা প্রভৃতি মিলিয়া একটী অখণ্ড মহিমময় রস-মূর্ত্তি সৃষ্ট হয়, এবং ইহার শিল্প-চাতুর্য্য লেখকের দূরারোহী কল্পনা ও অনন্যসাধারণ মননশক্তি গুণে আমাদের নিকট চিরন্তন হইয়া থাকে। এই জাতীয় কাব্যাদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

'কালে কালে একটী সমগ্র জাতি যে কাব্যকে একজন কবির কবিত্বশক্তি আশ্রয় করিয়া রচনা করিয়া তুলিয়াছে, তাহাকেই যথার্থ মহাকাব্য বলা যায়'

এই জাতীয় মহাকাব্য পুরাতন কথা-বস্তুর গ্রন্থন-মূলক সৃষ্টি নহে—পুরাতনীকে উপলক্ষ্য করিয়া সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি। অতীত কাহিনী অবলম্বন করিয়া কাব্যকার স্বকীয় যুগের যুগন্ধর কবিরূপে ইহাতে জাতির সুপ্ত-চেতনা ও জীবন-দর্শিকার মানবিক ভাব-মূর্ত্তি দান করেন।* ইহাতে কখনো কখনো রূপকের ব্যঞ্জনা অপেক্ষা কাব্যকারের জীবন-জিজ্ঞাসাই অধিকতর প্রস্ফুট।

এই শ্রেণীর মহাকাব্যের মধ্যে **Vergil**-এর *Æneid*, **Tasso**-র *Jerusalem Delivered*, Dante-র *Divina Commedia*, Milton-এর *Paradise Lost*, **Hardy**-র *The Dynasts* ও মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' উল্লেখযোগ্য।

মহাকাব্য : বাংলা ও ইংরেজী

মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র অনুযায়ী মহাকাব্যের গৌরব সর্ব্বাংশে দাবী করিতে পারে না। অবশ্য তিনি তাঁহার কাব্যকে অষ্টাধিক সর্গে বিভক্ত করিয়াছেন এবং সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র অনুযায়ী উহাতে নগর বন উপবন শৈল সমুদ্র প্রভাত সন্ধ্যা যুদ্ধ মন্ত্রণা প্রভৃতির সমাবেশও করিয়াছেন। কিন্তু সর্গান্তে তিনি নূতন ছন্দ ব্যবহার করেন নাই সর্গশেষে পরবর্ত্তী সর্গকথা আভাসিত করেন নাই, এবং যদিও তিনি বলিয়াছিলেন—

গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত

* *Cf.* There is only the thing which can master the perplexed stuff of epic material into unity; and that is, an ability to see in particular human experience some significant symbolism of man's general destiny—*Abercrombie.*

তথাপি কাব্যে করুণ রসেরই জয় হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, সংস্কৃত মহাকাব্য মিলনান্তক, মধুসূদনের মহাকাব্য বিষাদাত্মক। সর্ব্বোপরি, মধুসূদনের কাব্যের নায়ক রাবণ, এবং রাবণ অনার্য্যবংশ সম্ভূত—সদ্বংশজ এবং ধীরোদাত্তগুণ সমন্বিত নহেন। সুতরাং সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে ইহাকে মহাকাব্য বলিয়া অনেকে স্বীকার করিতে চাহিবেন না। এই প্রসঙ্গে মধুসূদনের উক্তিও মনে রাখিতে হইবে। তিনি বলিয়াছিলেন—'I will not allow myself to be bound by the dicta of Mr. Viswanath of Sahitya Darpan.' এইদিক হইতে দেখিলে, মধুসূদন সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রানুযায়ী মহাকাব্য রচনা করেন নাই, সুতরাং এই জাতীয় ত্রুটি আবিষ্কার করা শোভন হইবে না। মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য তথা গ্রীক নাটক ও সেক্স্‌পীয়র দ্বারা এত গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন যে, মিল্টন তাঁহাকে যে কাঠামো দান করিয়াছিলেন, ছন্দের যে সমুদ্র-কল্লোল শুনাইয়াছিলেন, তাহাই তিনি গ্রীক বা সেক্সপীয়রীয় নাটকের নিয়তিবাদের সহিত সংগ্রথিত করিয়া নাটকীয় রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাও ভুলিলে চলিবে না, মধুসূদন Literary বা সাহিত্যিক মহাকাব্য রচনা করিতেছিলেন। রামায়ণকে তিনি তাঁহার মানবতার আলোকে বিধৌত করিয়া যে-মহাকাব্য রচনা করিলেন, উহা আসলে রোমাণ্টিক মহাকাব্য। কাজেই মেঘনাদবধ কাব্য রামায়ণ-আহৃত কাহিনীর পুনরাবৃত্তি নহে—ইহা নবজাগ্রত বাঙ্গালীর দৃষ্টিতে নিয়তি-লাঞ্ছিত নবমানবতাবোধের সকরুণ মহাকাব্যের রূপে অপূর্ব্ব গীতি-কাব্য। মেঘনাদবধ কাব্য এই দিক দিয়া বাংলা কাব্য সাহিত্যে একক সৃষ্টি। মধুসূদন নিজেও কাব্যখানিকে রীতিমত মহাকাব্য মনে করিতেন না; তিনি তাঁহার বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন—

'You must not, my dear fellow, judge of the work as a regular Heroic Poem. *I never meant it such*'

আমাদেরও মনে হয়, মধুসূদন অত্যাশ্চর্য্য নির্ম্মাণ-কুশলতা (architectonic) গুণে যে মহাকাব্যোচিত কাব্য-বিগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে মিল্টনের

অমিত্রচ্ছন্দের উদাত্ত সঙ্গীত ও বর্ণনার মহিমময়তা (Sublimity) থাকা সত্ত্বেও তাঁহার রাবণ চরিত্রে মিল্টনের শয়তানের পরম দাম্ভিকতা প্রকট হইয়া উঠে নাই। ইন্দ্রজিৎ-সীতা-সরমা-প্রমীলা হোমর বা মিল্টনের চরিত্র-চিত্রের সগোত্র নয়। আসল কথা, মধুসূদনের মন ক্লাসিক-কাব্য-বিলাসী হইলেও, তাঁহার কবিপ্রাণ ছিল প্রধানতঃ রোমাণ্টিক। এই কারণে আকারে 'মেঘনাদবধ কাব্য' মহাকাব্যোচিত হইলেও, ইহার প্রাণ-নন্দিনী সম্পূর্ণ রোমাণ্টিক, এবং মধুসূদন এই কাব্যে জীবনের যে জয়গান করিলেন, তাহা বীররসের নয়, কারুণ্যের। কবি তাই, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন।'

মধুসূদনের কাব্যের তাৎপর্য্য যেমন রাবণ-চরিত্রের প্রতীকতায়, paradise Lost-এর তাৎপর্য্যও তেমন শয়তানের চরিত্রের মধ্যে মানবতা ও অতিলৌকিকতার সম্মিলনে। ইংরেজী সাহিত্যে Tennyson-এর *Idylls of the King*এর মধ্যে অতিকায়তা থাকিলেও মহত্ত্ব-ব্যঞ্জনা না থাকায় উহা গীতিগুচ্ছ হইয়া পড়িয়াছে ; মিল্টনের সজ্ঞান অনুকরণ সত্ত্বেও মহাকাব্যধর্ম্মী *Hyperion* শেষ পর্য্যন্ত কীটসের রোমাণ্টিক কল্পনার স্পর্শে গীতিমূর্চ্ছনায় পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে। Arnoldএর *Sohrab and Rustam*এ আদ্যন্তসমন্বিত বিষয়-বস্তু নাতিদীর্ঘাকার ও সহজ-বোধ্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে রূপ পাইয়াছে। কিন্তু কবিতাটিতে 'fullness of detail' না থাকায় ইহার ক্ষীণাবয়ব যেন পাঠকের মনে কোন বিরাটত্বের অনুভূতি সঞ্চার করে না। এইজন্য ইহাকে মহাকাব্য না বলিয়া খণ্ডমহাকাব্য (*Epic Episode*) বলা সঙ্গত হইবে। কিন্তু Hardyর ঐতিহাসিক মহাকাব্য *The Dynasts* সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যে অন্ধ নিয়তিবাদ তাঁহার কাব্যে দেখা দিয়াছে, তাহা যেন—

> ......Works unconsciously, as heretofore,
> Eternal artistries in Circumstance.

তথাপি, ১৮০৫-১৮১৫ সাল পর্য্যন্ত যে-নেপোলিয়নিক যুদ্ধ ইংলণ্ড ও সমগ্র ইয়োরোপকে প্রকম্পিত করিয়াছিল, তাহারই বিরাট পটভূমিকার উপর

কবি গদ্য ও পদ্য মিশ্রিত বর্ণনা-চাতুর্য্যে ও কথোপকথন রচনায় মহাকাব্যের দেহে নাটকের চলিষ্ণুতা সঞ্চার করিয়াছেন। মহাকাব্যের সঙ্গে নাটকের এই মিলন সত্যই অভিনব।

বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যের' পর হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার'। এই কাব্যে মিল্টন ও কীটসের প্রভাব কিঞ্চিৎ থাকিলেও হেমচন্দ্রের স্থূলভ কল্পনা এমনই যে, উহা বৃত্রের পতন-কাহিনীকে মহাকাব্যোচিত ভাব-গাম্ভীর্য্য দান করিতে পারে নাই। পুরুষ বা নারীচরিত্র সৃষ্টিতে তাঁহার কল্পনা মানুষের মহত্ত্বকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ঘটনার ঘনঘটা, অতি-উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা ও মহানুভবতার বিস্তৃত বিবরণী নিতান্তই ছক-কাটা পরিকল্পনার মত দেখাইতেছে—চরিত্রের প্রাণধর্ম্মে উজ্জীবিত ও উল্লাসিত হয় নাই। সর্ব্বোপরি, হেমচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর ছন্দটি পর্য্যন্ত অপটু পয়ারে পর্য্যবসিত হইয়া কবিতার সর্ব্বাঙ্গীণ দীপ্তি নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছে। হেমচন্দ্রের কবিতায় সংস্কৃত মহাকাব্যের কোন কোন লক্ষণ থাকিলেও, যে-মহিমময়তা মহাকাব্যের বিশেষত্ব, উহা তাঁহার কল্পনায় কাব্যে প্রমূর্ত্ত হইয়া উঠে নাই। তাই 'বৃত্রসংহার' বাংলা সাহিত্যে ব্যর্থ হইয়াছে। নবীনচন্দ্রের কবি-প্রতিভায় আবেগ ছিল, কিন্তু সংযমবোধ ছিল না। তাহার ফলে কবির রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস নামক মহাকাব্য (*Epic Cycle*) সুদীর্ঘ ছন্দোবদ্ধ নিবন্ধের পর্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। নবীনচন্দ্রের অতিরিক্ত ভাবালুতা তাঁহার কাব্যের 'massive grandeur'* এবং 'solemn style'কে ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলিয়াছে।

পরবর্ত্তী কালে যে কয়েকটি মহাকাব্য রচনার দুঃসাহস দেখা গিয়াছিল, তন্মধ্যে মানকুমারীর 'বীরকুমার বধ' (১৩১০), যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'পৃথ্বীরাজ' ও 'শিবাজী', আনন্দমিত্রের 'ভারতমঙ্গল' ও কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য, অতিকায়তা যদি মহাকাব্যের কোন লক্ষণ রূপে পরিগণিত হইত, তবে ইহাদের প্রচেষ্টাকে মহাকাব্য হিসাবে বিচার করা যাইত। ইহাদের কাহারও কাব্য একদিকে যেমন 'Significant symbol of man's

**B. N. Seal : New Essays &Criticism*

general destiny' হইয়া উঠে নাই, তেমনই আবার উহারা পাঠকের মনে কোন সাবলিমিটি বা মহত্ত্ব-বোধও সঞ্চার করিতে পারে না।

মহাকাব্যের যে আলোচনা করিয়াছি, অতঃপর ট্র্যাজিডির সহিত ইহার সম্বন্ধ-নির্ণয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মহাকাব্য প্রসাদাত্মক বা বিষাদাত্মক উভয়ই হইতে পারে, কিন্তু ট্র্যাজিডি বিষাদাত্মক হইবেই। ট্র্যাজিডির নায়ক নিয়তির সহিত দ্বন্দ্বে পর্য্যুদস্ত হইলেও আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চায়, কিন্তু মহাকাব্যের নায়ক নিয়তি বা বিধির নিকট ক্রীড়নক মাত্র। মহাকাব্য অল্পসংখ্যক শিক্ষিতজনের চিত্তবিনোদন করে, ট্র্যাজিডি অধিকতর জনের হৃদয় আকর্ষণ করে। মহাকাব্য পাঠ্য-কাব্য, ট্র্যাজিডি দৃশ্য ও পাঠ্যকাব্যের সমন্বয়; মহাকাব্যের বিপুলতা ও গৌরব মানুষকে সুমহান আলেখ্য দেখাইয়া বিস্মিত করে, ট্র্যাজিডির বিপুলতা তাহাকে দ্রবীভূত করে। মহাকাব্য মন্থর-গতি ঐরাবত, ট্র্যাজিডি বেদনা-বিদ্যুৎগতি উচ্চৈঃশ্রবা; মহাকাব্যের গৌরব তাহার শাখায়িত বিস্তারে ও স্বর্গমর্ত্ত্য-পাতাল-প্রসারী কল্পনায়, ট্র্যাজিডির গৌরব তাহার সংহত সুষীম সঙ্কোচনে এবং জগৎ ও জীবনের অতলস্পর্শ রহস্য-উদ্ঘাটনে। মহাকাব্য একই ওজস্বী ছন্দে ঐশ্বর্য্যশালী, ট্র্যাজিডি বহুবিচিত্র ছন্দ-শিহরণে রোমাঞ্চময়ী; মহাকাব্য বিচিত্র শোভাযাত্রা, ট্র্যাজিডি বেদনার মণ্ডলায়িত সভাস্থল। মহাকাব্যে যাহা আছে, ট্র্যাজিডিতেও প্রায় তাহা আছে, কিন্তু ট্র্যাজিডিতে যাহা আছে, মহাকাব্যে তাহা নাই। এইখানেই ট্র্যাজিডির অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ব।

ট্র্যাজেডি ও মহাকাব্য

আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য রচিত হইতেছে না। ইংরেজীতে তবু Thomas Hardy *The Dynasts* নামক মহাকাব্য লিখিয়াছেন: বর্ত্তমানকালে মহাকাব্যের এই অসদ্ভাবের বিশেষ কারণ আছে বলিয়া মনে হয়। আধুনিক যুগ গণ-তন্ত্রের যুগ। এই যুগে মানুষ সাধারণতঃ ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্ত-বিগ্রহ প্রত্যক্ষ করিতে চায় না। প্রাচীন যুগের মানুষ সশ্রদ্ধ ও সবিস্ময় দৃষ্টিতে কোন মহাপুরুষকে অসাধারণ বলিয়া পূজা করিতে

বর্ত্তমান যুগে মহাকাব্যের অভাব কেন?

পারিত, আধুনিক কালের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-বোধসম্পন্ন মানুষ তেমনটী পারে না। প্রাচীনযুগের বীরপূজা-স্পৃহা এখন বিচিত্র আত্ম-স্তুতিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বর্ত্তমান যুগের ব্যক্তি-নিষ্ঠ কাব্যের দিনে মহাকাব্য অপেক্ষা গীতি-কাব্যের মধ্যেই মানুষের অন্তরের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা অধিকতর রূপে প্রকাশ পাইতেছে। বলা বাহুল্য, এই জাতীয় ব্যক্তি-নিষ্ঠতাই মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যকে' গীতিকাব্যোচিত সৌন্দর্য্য দান করিয়াছে। তৃতীয়তঃ, আধুনিক যুগ-চিত্তের সংক্ষিপ্ত ও রসঘন আনন্দ-বেদনাকে রূপ দান করিবার সামর্থ্য মহাকাব্যের নাই। কারণ, আধুনিক যুগ দ্রুত অধ্যয়নের যুগ; আধুনিক কালে মানুষের জীবনে অবসর অতি অল্প এবং এই স্বল্প অবসর সময়ের উপযোগিতা মহাকাব্যে নাই। চতুর্থতঃ, বর্ত্তমান যুগে উপন্যাস সাহিত্য অতিমাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। মহাকাব্যে গল্পাংশের যে উন্মাদনা ছিল, তাহা উপন্যাস ছোটগল্প প্রভৃতি পাঠেই এখন নিরসন হয়। সুতরাং গদ্য-সাহিত্যও মহাকাব্যের আবির্ভাব অসম্ভব করিয়া তুলিতে আংশিক ভাবে সাহায্য করিয়াছে।

Mock Epic

কোন লঘু বিষয়-বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিবার জন্য মহাকাব্য লক্ষণাক্রান্ত যে কাব্য লিখিত হয়, তাহাকে **Mock Epic** বা বিদ্রূপাত্মক মহাকাব্য বলে। **Pope-এর** ***The Rape of the Lock*** নামক কাব্য **Miss Arabella Fermor** নাম্নী কোন মহিলার কেশ-কর্ত্তনের কাহিনী অবলম্বনে মহাকাব্যোচিত করিয়া লিখিত বলিয়া উহা ***Mock Epic*** নামে খ্যাত। বাংলায় জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'ছুছুন্দরী-বধ' (১৮৬৮) ও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত উদ্ধার' এই শ্রেণীর কাব্য।

নীতিকবিতা

নীতিকবিতায় গল্প, কাহিনী বা নিছক কলাশিল্পের সাহায্যে কবি জ্ঞানগর্ভ নীতিকথা বা তত্ত্ব প্রচার করেন। নীতিকথার তীব্রতা কল্পনার স্পর্শে যাহাতে কোমল ও কান্তরূপ পরিগ্রহ করে, তাহাই কবির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। অর্থাৎ জ্ঞানের কথা, নীতির কথা বা তত্ত্বকথাকে কবিত্ব-সুষমায় মণ্ডিত করিতে না পারিলে এই জাতীয় কবিতা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। **Pope-এর** ***Essay on Criticism,*** কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের

'সদ্ভাবশতক', রঙ্গলালের 'নীতিকুসুমাঞ্জলি', রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা', 'জুতা আবিষ্কার', কুমুদরঞ্জনের 'শতদল', 'যদি', রজনী সেনেব 'অমৃত' এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। রবীন্দ্রনাথের 'জুতা আবিষ্কার' কবিতাটিতে কবি গল্পেব সাহায্যে নীতি প্রচার করিয়াছেন এবং সুরেন মজুমদারের 'সাদবমঙ্গল'ও একখানা নীতিকাব্য।

রূপক

যে-কবিতায় কোন গল্প বা কাহিনীর মধ্য দিয়া অন্য কোন বিশেস অর্থের ইঙ্গিত করা হয়, তাহাকে আমরা ***Allegory*** বা রূপক কবিতা বলি। দ্বিজেন ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ', মধুসূদনের 'যশের মন্দিব', ঈশ্বর গুপ্তের 'সংসার জাতা', 'সংসার সমুদ্র' এই শ্রেণীভুক্ত। ইংরেজী সাহিত্যে 'রূপক কবিতা' আধ্যাত্মিক বা ধর্ম্মমূলক, (***The Hind and the Panther***), রাষ্ট্রনৈতিক (***Absalom and Achitophel***) এবং সামাজিক (***Piers Plowman***)—এই কয়প্রকার দৃষ্ট হয়। বাংলা সাহিত্যেও আধ্যাত্মিক রূপক দ্বিজেন ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ', রাষ্ট্রনৈতিক রূপক যতীন সেনেব 'ভারতী'; সামাজিক রূপক—মোহিতলালের 'আহ্বান'। কবিতার আখ্যানভাগ বা গল্পাংশ স্বল্প হইলে এবং বিষয়বস্তু যদি বিষযাতীত অন্য কোন ভাব-কল্পনাকে ব্যঞ্জিত করে, তবে সেই শ্রেণীর কবিতাকে রূপক না বলিয়া আমরা সাঙ্কেতিক বা প্রতীকী (**Symbolic**) কবিতা বলিতে পারি। রবীন্দ্রনাথের 'দুইপাখী', 'সোনার তরী', 'বালিকাবধূ' ও ইংরেজী সাহিত্যে **Clough**-এর '***Where lies the land***', য়েট্সের ***The Lake Isle of Innisfree*** এই শ্রেণীর কবিতা।

ব্যঙ্গকবিতা

Satire শব্দটি ল্যাটিন **Satura lanx** নামক শব্দ হইতে উৎপন্ন। প্রাচীনকালে গ্রীসদেশে **Satura lanx** নামধেয় একটী থালায় বর্ষারম্ভের সদ্যাগত ফলশস্য পূর্ণ করিয়া নৈবেদ্য সাজাইয়া গ্রীকদেবী **Ceres**-এর পূজা করা হইত। ইহা হইতে গদ্য-পদ্য সমন্বিত ও তীব্র শ্লেষাত্মক কবিতাকে **Satire** বলিয়া অভিহিত করা হয়। পরবর্ত্তী যুগে মানব চরিত্র, আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি সংশোধনের উদ্দেশ্যে যে নীতিকবিতা লিখিত

হইয়া আসিতেছে, তাহাকেই Satire বা ব্যঙ্গকবিতা বলা হয়। লোকশিক্ষা, লোকচরিত্র-সংশোধন ও সমাজের দুর্নীতি-স্খালনের জন্য এই জাতীয় কবিতা উৎকৃষ্ট চাবুক। ইংরেজী সাহিত্যে Dryden-এর *Mac Flecknoe*, Pope-এর *The Dunciad*, বাংলায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'বিধবা বিবাহ', যতীন সেনের 'পাঁকাল-বন্দনা', এবং রবীন্দ্রনাথের 'উন্নতি লক্ষণ', 'হিং টিং ছট' ও 'দুরন্ত আশা'; মোহিতলালের 'দ্রোণগুরু', 'সরস্-সতী'* (অতি আধুনিক কবি-গোষ্ঠী সম্বন্ধে) এই শ্রেণীভুক্ত।

ব্যঙ্গ কবিতা নানাপ্রকারের হইতে পারে। সামাজিক ব্যঙ্গ কবিতার মধ্যে হেমচন্দ্রের 'বাঙ্গালীর মেয়ে', ঈশ্বর গুপ্তের 'অনাচার', রবীন্দ্রনাথের 'নব্যবঙ্গ দম্পতীর প্রেমালাপ'; রাষ্ট্রনৈতিক ব্যঙ্গ কবিতার মধ্যে হেমচন্দ্রের 'নেভার—নেভার', রবীন্দ্রনাথের 'উন্নতি লক্ষণ'; ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যঙ্গ কবিতার মধ্যে যতীন সেনের 'পাঁকাল-বন্দনা', রবীন্দ্রনাথের 'হিং টিং ছট্'; ব্যক্তিগত ব্যঙ্গ-কবিতার মধ্যে Pope-এর *The Epistle to Arbuthnot*, সত্যেন দত্তের 'অ' (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী), 'নাপ্পি-পীরিতি-কথা' (দীনেশ সেন), নব্যদিগ্‌গজ প্রশস্তি

---

* কবিতাটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া নিম্নে উহা উদ্ধৃত হইল—

সরস্-সতী

সারাটা জাতের শির-দাঁড়াটায় ধরেছে ঘুন—
মা'র জঠরেও কাম-যাতনায় জ্বলিছে প্রাণ ?
শুকদেব যথা করেছিল বেদ অধ্যয়ন—
গর্ভে বসেই শেষ করে তাহা বাৎস্যায়ন !

বুলি না ফুটিতে চুরি ক'রে চায়—মোহন ঠাম !
ভাষা না শিখিতে লেখে কামায়ন—কানের সাম।
জ্ঞান হলে পরে মায়েরে দেখে যে বারাঙ্গনা !
তার পরে চায় সারা দেশময় অসতীপণা !

এদেরি পুজোয় ধরা দিয়েছে যে সরস্বতী,
চিনিনে তোমায়, কোন বলে তুমি আছিলে সতী ?
দেখি তুমি শুধু নাচিয়া বেড়াও হাঁস-পা-তালে,—
অঙ্গে ধবল, কুষ্ঠও বুঝি ওষ্ঠে-গালে !

(সুরেশ সমাজপতি), এবং প্রতিষ্ঠানমূলক ব্যঙ্গ কবিতার মধ্যে কালিদাস রায়ের 'প্রবেশ নিষেধ'-এর নাম করা যাইতে পারে।

কোন কবির কবিতাকে বিদ্রূপ করিয়া তাঁহারই অনুকরণে অতিরঞ্জিত করিয়া যে জাতীয় ব্যঙ্গ কবিতা লিখিত হয়, তাহাকে ইংরাজীতে *Parody* বলে। প্যারডি কবিতা শুধু 'শব্দশিল্প' মাত্র নয়, উৎকৃষ্ট প্যারডি মূল কবিতার বিচক্ষণ সমালোচনা-মূলক নূতনতর সৃষ্টি, যাহাকে বার্গসঁ বলেন, 'the art of comic transposition.' ইংরাজীতে Shelleyর *Peter Bell The Third* (ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Peter Bell-এর প্যারডি), Byron-এর *The Vision of Judgment*, (Southeyর A Vision of Judgment-এর প্যারডি) James Joyce-এর *Ulysses* (একাধারে সাহিত্যিক প্যারডি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যারডি-সংগ্রহ), মোহিতলালের 'আমি যদি জন্ম নিতেম ক্যাবলা কলুর কালে', কালিদাস রায়ের 'কেন বঞ্চিত হব ভোজনে', দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাধাকৃষ্ণ সংবাদ', যতীন সেনের 'বঙ্গে শরৎ', সজনী দাসের 'হে বিরাট নদী', সতীশ ঘটকের 'সোনার ঘড়ি'র নাম এই প্রসঙ্গে করা যাইতে পারে।

প্যারডি বা লালিকা

রোমীয় লেখক Horace-এর অনুকরণে লিপি-কবিতার প্রথম সৃষ্টি হয়। এই জাতীয় কবিতায় সাধারণতঃ কোন অনুপস্থিত ব্যক্তি-বিশেষকে উপলক্ষ্য করিয়া কবি কোন নীতিকথা, আলোচনা, প্রেম বা অন্য কোন বিষয় সম্বন্ধে কবিতা রচনা করেন। এই লিপি-কবিতায় যুগ-চিত্তের পরিকল্পনায় যে সকল নরনারী ভিড় করিয়া আসে, তাহাদের চরিত্র-সৃষ্টিতে কবির দক্ষতা একান্ত প্রয়োজনীয়। ইংরেজী সাহিত্যে Pope-এর *Eloisa to Abelard*, এবং বাংলায় মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা কাব্য' উল্লেখ-যোগ্য। মধুসূদন 'বীরাঙ্গনা কাব্যের' লিপি-কবিতার মধ্য দিয়া প্রেমের যে বহুবিচিত্র চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব্ব সম্পদ। এতদ্ব্যতীত, রাজকুমার নন্দীর 'বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর', রবীন্দ্রনাথের 'পত্র', সত্যেন দত্তের 'পুরীর চিঠি', রাধারাণী দেবীর 'পরিণীতার পত্র' এই শ্রেণীর কবিতা।

লিপি-কবিতা

ইংরেজী সাহিত্যের অনুকরণে বাংলায় কয়েক প্রকার কবিতা লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে-কবিতায় কোন ব্যক্তি-চরিত্র তাহার জীবনের কোন সঙ্কট মুহূর্ত্তে এক বা একাধিক শ্রোতার নিকট আত্ম-বিবৃতির মধ্য দিয়া নিজের মনের গভীরতম কথাটী প্রকাশ করে, তাহাকে নাটকীয় একোক্তি বা *Dramatic Monologue* বলে। *Soliloquy* বা আত্ম-ভাষণ এবং *Meditation* বা আত্মধ্যানমূলক কবিতার সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, এই জাতীয় কবিতায় যে ঘটনা-সংস্থান সৃষ্টি করা হয়, তাহাতে এক বা একাধিক শ্রোতার অদৃশ্য উপস্থিতি আমরা মোটেই সন্দেহ করি না। এই অদৃশ্য শ্রোতাই নানারূপ প্রশ্ন ও ইঙ্গিতের সাহায্যে বক্তার বক্তব্য বিষয়ের পরিপূর্ণ প্রকাশের ও চরিত্র পরিস্ফুটনের সাহায্য করে। ব্রাউনিং-এর *The Last Ride Together*, *Andrea del Sarto*, *My Last Duchess*, যতীন্দ্র বাগচীর 'চাষার ঘরে', মোহিতলালের 'নাদির শাহের শেষ' এই শ্রেণীর অন্তর্গত। নাটকীয় একোক্তি জাতীয় কবিতায় ব্রাউনিং নাটকীয় ঘটনা-সংস্থান রচনায় ও নরনারীর মনো-বিশ্লেষণে ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে যে-আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তেমনটি আজ পর্য্যন্ত বাংলায় দেখা যায় নাই।

বিবিধ—
(ক) নাটকীয় একোক্তি

গীতিকবিতা নাট্যগুণ-সমন্বিত অর্থাৎ উহাতে নাটকীয় সন্ধিবিভাগের আভাষ বা ঘটনার গতিক্রম থাকিলে নাট্যগীতি (*Dramatic Lyric*) নামে অভিহিত হইতে পারে। (পৃঃ ৬০ দ্রষ্টব্য) এই শ্রেণীর গীতিকবিতায় কবি কাল্পনিক, ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক চরিত্র-চিত্রের সাহায্যে কোন নাটকীয় ঘটনা-সংস্থান (*Situation*) পরিস্ফুট করেন। সুতরাং ইহাতে তন্ময়তা ও চরিত্রের ভূমিকায় লেখকের আত্মপ্রক্ষেপ হেতু মন্ময়তার গ্রন্থিবন্ধন হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর মধ্যে Keats-এর *La Belle Dame Sans Merci*, Tennyson-এর *The Lotus Eaters*, *Ulysses*, Browning-এর *Saul*, *Abt Vogler*, Arnold-এর *The*

(খ) নাট্যগীতি ও গীতিনাটিকা

Forsaken Merman সত্যেন দত্তের 'কয়াধু', মোহিতলালের 'বেদুইন', রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা', যতীন্দ্র বাগচীর 'পাশার বাজি' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অনেক সময় দুই বা ততোধিক চরিত্রের কথাবার্তাকে এই শ্রেণীর কবিতায় নাট্যরূপ দেওয়া হইলে ইহাকে গীতি-নাটিকা বা 'সংবাদ-কবিতা'ও বলা যাইতে পারে। এই কবিতায় নাট্যগীতির ঘটনা-প্রবাহের আভাষ ততটা নাও থাকিতে পারে। অর্থাৎ ইহার নাট্যাংশ অপেক্ষা গীতি অংশ যেন প্রধান, কিন্তু নাট্যগীতিতে নাট্যাংশ প্রধান না হইলেও গীতি অংশ অপেক্ষা গৌণ নহে। Landor-এর *Menalaus and Helen at Troy*, রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় অভিশাপ', 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ', মোহিতলালের 'মৃত্যু ও নচিকেতা' প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত।

(গ) *Triolet*

ফরাসী সাহিত্যের অনুকরণে ইংরেজী সাহিত্যে সনেটের সগোত্র কয়েক প্রকার অভিনব কবিতার আমদানী হইয়াছিল। তন্মধ্যে *Triolet*, *Rondeau* বা *Rondel* প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে *Triolet* বাংলা কবিতায় সচরাচর দেখা যায়। *Triolet* বা তেপাটি কবিতায় আটটী পংক্তি থাকে। ইহার ছন্দ-রীতি *ABaAabAB*, চতুর্থ পংক্তিতে প্রথম পংক্তির, সপ্তম ও অষ্টম পংক্তিতে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তির পুনরুক্তি করা হয়। ভাবগত দিক হইতে বিচার করিলে প্রত্যেক পুনরুক্তিতে বিভিন্ন রূপ অর্থ-ব্যঞ্জনা লক্ষিত হইবে। উদাহরণ স্বরূপ Austin Dobson ও বীরবলের কবিতা পাশাপাশি প্রদত্ত হইল—

Rose kissed me to-day,	ঊষা আসে অচল শিয়রে
Will she kiss me to-morrow ?	তুষারেতে বাঁধিয়া চরণ।
Let it be as it may,	স্পর্শে তার ভুবন শিহরে
Rose kissed me to-day,	ঊষা হাসে অচল-শিয়রে
But the pleasure gives way	ধরে বুকে নীহারে শীকরে
To a savour of sorrow ;	সে হাসির কনক বরণ।
Rose kissed me to-day	বসো সখি মনের শিয়রে।
Will she kiss me to-morrow ?	হিম-বুকে রাখিয়া চরণ।

৭

নাটক

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ নাট্যসাহিত্যকে কাব্য সাহিত্যের মধ্যে স্থান দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে কাব্য দুই প্রকার—দৃশ্য কাব্য ও শ্রব্য কাব্য। নাটক প্রধানতঃ দৃশ্য কাব্য এবং ইহা সকল প্রকার কাব্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ—কাব্যেষু নাটকং রম্যম্। **নাটক** দৃশ্য ও শ্রব্যকাব্যের সমন্বয়ে রঙ্গমঞ্চের সাহায্যে গতিমান মানবজীবনের প্রতিচ্ছবি আমাদের সম্মুখে মূর্ত্ত করিয়া তোলে।* রঙ্গমঞ্চের সাহায্য ব্যতীত নাটকীয় বিষয় পরিস্ফুট হয় না। নাট্যোল্লিখিত কুশীলবগণ তাহাদের অভিনয়-নৈপুণ্যে নাটকের কঙ্কালদেহে প্রাণসঞ্চার করেন, তাহাকে বাস্তব রূপৈশ্বর্য্য দান করেন। নাটকে অনেক সময় পাত্রপাত্রীদের কথায় নাট্যকার নিজের ধ্যানধারণার কথাও সংযোগ করিয়া দেন। এইজন্য ইহা সম্পূর্ণরূপে বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় (*Objective*) না-ও হইতে পারে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ নাট্যকার নিজেকে যথাসাধ্য গোপনে রাখেন এবং তাঁহার চরিত্র-সৃষ্টির মধ্যে বিশেষ একটি নির্লিপ্ততা (*Detachment*) বর্ত্তমান থাকে। যে-নাটকে এই জিনিষটির অভাব, তাহা নিম্ন শ্রেণীর নাটক হইতে বাধ্য, কারণ নাট্যকার তখন নাট্যোল্লিখিত কুশীলবকে তাঁহার নিজের ভাব-কল্পনার বাহন করিরা তোলেন। ফলে, উহা অত্যুগ্ররূপে প্রচারমূলক নাটক হইয়া দাঁড়ায়।

নাটক কাহাকে বলে

সংস্কৃত নাটকে দেখা যায় যে, প্রথমতঃ পূর্ব্বরঙ্গ বা মঙ্গলাচরণ, দ্বিতীয়তঃ সভাপূজা (সামাজিকগণের), তৃতীয়তঃ কবিসংজ্ঞা বা নাটকীয় বিষয়-কথা

*Drama is the creation and representation of life in terms of the theatre.—*Elizabeth Drew : Discovering Drama.*

এবং তাহার পর প্রস্তাবনা। 'মঙ্গলাচরণে' সূত্রধার (ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, সংস্কৃতজ্ঞ ও অভিনয়-পটু) রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইয়া অভিনয়-কার্য্যের বিঘ্ন-পরিসমাপ্তির জন্য যে মঙ্গলাচরণ

সংস্কৃত নাটক

করেন তাহার নাম 'নান্দী'। প্রস্তাবনার পর সাধারণতঃ প্রথম অঙ্ক আরম্ভ হয়। নাটকীয় কুশীলবগণ 'সূচিত' না হইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতে পারে না। শুধু নায়ক বা আর্ত্ত যে-কোন চরিত্রের প্রবেশের জন্য সূচনার প্রয়োজন নাই। নাটকের ভাষায় গদ্য ও পদ্য উভয়ই ব্যবহৃত হয়। তবে সংস্কৃত নাটকে বিদ্বানপুরুষ সাধারণতঃ সংস্কৃত, বিদুষী মহিলাগণ শৌরসেনী, রাজপুত্র ও শ্রেষ্ঠিগণ অর্দ্ধমাগধী, বিদূষক প্রাচ্য এবং ধূর্ত্ত অবন্তিক ভাষা ব্যবহার করিতেন। নাটকের Plot বা বিষয়-বস্তু খ্যাতবৃত্ত অর্থাৎ প্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত বা রামায়ণ মহাভারতাদি হইতে গৃহীত, কবি-কল্পিত অথবা মিশ্রও হইতে পারে। নায়ক ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরপ্রশান্ত, ধীরোদ্ধত—এই চার শ্রেণীর হইতে পারে।* স্বভাবত, নায়ক দানশীল, কৃতি, রূপবান, কার্য্যকুশল, লোকরঞ্জক, তেজস্বী, পণ্ডিত ও সুশীল হইবে। নাটকে অঙ্গী বা প্রধান রস শৃঙ্গার বা বীর, কখনো বা শান্তও হইতে পারে। অন্যান্য রস অপ্রধান ভাবে থাকিবে—ইহাতে করুণ রস থাকিলে বিয়োগান্ত 'রূপকের'† স্থান নাই। নাটকে পাঁচ হইতে দশটী পর্য্যন্ত অঙ্ক থাকিতে পারে। এই সকল অঙ্কমধ্যে গর্ভাঙ্ক থাকিতে পারে। নাটক দৃশ্যকাব্য বলিয়া ইহা অভিনেয় অর্থাৎ অভিনয় করিয়া ইহা সামাজিকগণকে দেখাইতে হয়। নাটকীয় বিষয়-বস্তুর অবস্থানুরূপ অনুকরণের নাম অভিনয়।

† 'নট অন্যের রূপ ধারণ করিয়া অভিনয় করে বলিয়া নাটকের নাম রূপক'

* 'যে নায়ক আত্মশ্লাঘা করে না, হর্ষবিষাদে অভিভূত হয় না, বিনয় দ্বারা গর্ব্বকে প্রচ্ছন্ন রাখে ও যাহা অঙ্গীকার করে, তাহা নির্ব্বাহ করে, তাহাকে ধীরোদাত্ত বলে। যথা—যুধিষ্ঠির ও রামচন্দ্র। যাহার নায়কসামান্য অনেক গুণ আছে, তাহাকে ধীরপ্রশান্ত কহে। যথা মালতিমাধবাদিতে মাধবাদি। মায়াবী, উদ্ধত, চঞ্চল, অহঙ্কার ও দর্পে পরিপূর্ণ ও আত্মশ্লাঘা পরায়ণ ব্যক্তি ধীরোদ্ধত। যথা ভীমসেন। যে ব্যক্তি নিশ্চিন্ত, নম্র, এবং নৃত্যগীতাদিতে আসক্ত, তাহাকে ধীরললিত বলে। যথা রত্নাবলীতে বৎসরাজাদি।'- (কাব্যনির্ণয়)

এই অভিনয় সাধারণতঃ চার প্রকারের—আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাত্ত্বিক। অঙ্গদ্বারা নিষ্পন্ন অভিনয়কে আঙ্গিক, বচন দ্বারা নিষ্পন্ন অভিনয়কে বাচিক বলে। আহার্য্যাভিনয়ের অর্থ নেপথ্য-বিধান বা বেশ-রচনা। অভিনয়ের দ্বারা সত্ত্বাদিভাবের উদ্রেকে কম্পস্বেদাদি হইলে তাহাকে সাত্ত্বিক অভিনয় কহে।

Classical ও Romantic নাটক

Classical ও Romantic নাটকের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। Classical নাটক প্রাচীন গ্রীক বা রোমীয় নাটকের অনুকরণে লিখিত। ইহাদের মধ্যে মানব জীবনের কাহিনী সংহত ও সংযত রূপে প্রতিফলিত হয়। ইহাতে নাট্যকার কয়েকটী মাত্র দৃশ্য অবতারণা করেন এবং অপ্রয়োজনীয় বা মূল নাট্য বিষয়-বস্তুর প্রতিকূল ঘটনাবলী সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করিয়া মুখ্য বিষয়ের পুষ্টিসাধনে রত থাকেন। কিন্তু রোমাণ্টিক নাট্যকার তাঁহার স্বেচ্ছাবিহারিণী কল্পনার সাহায্যে জীবনের পরিপূর্ণ দিকটী অবন্ধন ভাবে, প্রয়োজন হইলে, আপাতঃ-বিরোধী বিষয়-বস্তুর অবতারণায়, নাটকে প্রমূর্ত্ত করিয়া তোলেন। প্রথমোক্ত নাট্যকারদের মত তাঁহারা নাটকীয় ঐক্যনীতি মানিয়া চলেন না এবং স্বাধীনভাবে নাটকীয় চরিত্র বা ঘটনা সন্নিবেশ করেন। ক্ল্যাসিকেল নাটক এক সুরের নাটক, ইহাতে কোন মিশ্রণ নাই অর্থাৎ ক্ল্যাসিকেল ট্র্যাজিডিতে কোন হর্ষাত্মক, বা ক্ল্যাসিকেল কমেডিতে কোন বিষাদাত্মক আখ্যান-বস্তুর অবতারণা থাকে না। রোমাণ্টিক নাটকে উভয়ের মিশ্রণের সাহায্যেই নাটকের মূল বিষয় পরিস্ফুট করা হয়। রোমাণ্টিক নাটকে চরিত্রগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ সহজতর হইয়া উঠে, এবং নাট্যকার স্থান ও কালের বন্ধন অতিক্রম করিয়া পাঠককে মানবজীবনের অবাধ এবং স্বাভাবিক লীলা-মাহাত্ম্যে মুগ্ধ করেন। ক্ল্যাসিকেল নাট্যকার বিশেষ কোন একটী স্থান ও সময়ের মধ্যে মানব-ভাগ্যকে সংহত করিয়া নাটকীয় কলা-কৌশলের সাহায্যে উহাতে দৈব বা ঘটনাপরম্পরার অনিবার্য্য পরিণতিকে রূপ দান করেন। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন দত্ত প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের রীতি-পদ্ধতির সনাতনপন্থা বর্জ্জন করিয়া রোমাণ্টিক বিয়োগান্ত নাটক রচনা করেন।

'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬০) নাটক লিখিবার পূর্ব্বে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন—

'If I should live to write any drama, you should rest assured, I shall not allow myself to be bound by the dicta of Viswanath of the Sahityadarpan. I shall look to the great dramatists of Europe for models.

সনাতনপন্থী নাট্যকারগণ নাটকে তিনটী ঐক্যনীতি (*Unities*) মানিয়া চলিতেন। যথা—

(১) সময়ের ঐক্য (*Unity of Time*)—নাটকীয় আখ্যানভাগ রঙ্গমঞ্চে দেখাইতে যতক্ষণ সময় লাগে, বাস্তব জীবনে সংঘটিত হইতে যেন ঠিক ততক্ষণ লাগে, এই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। **Aristotle** এই কাল-নির্দ্দেশ করিতে গিয়া ইহাকে **'single revolution of the sun'** অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন।

(২) স্থানের ঐক্য (*Unity of Place*)—নাটকে এমন কোন স্থানের উল্লেখ থাকিতে পারিবে না, যেখানে নাট্য-নির্দ্দেশিত সময়ের মধ্যে নাটকের কুশীলবগণ যাতায়াত করিতে পারে না।

(৩) ঘটনার ঐক্য (*Unity of Action*)—নাটকে এমন কোন দৃশ্য বা চরিত্র সমাবেশ থাকিবে না, যাহাতে নাটকের মূল সুর ব্যাহত হইতে পারে। সমস্ত চরিত্র ও দৃশ্যই নাটকের মূল বিষয় ও সুরের পরিপোষক রূপে প্রদর্শিত হওয়া চাই এবং নাটকটী যেন আদি, মধ্য ও অন্ত-সমন্বিত একটি অখণ্ড সৃষ্টি রূপে পরিস্ফুট হয়।

Aristotle নিজে সময়ের ঐক্য সম্বন্ধে উল্লেখ করিলেও, স্থানের ঐক্য সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নাই। তিনি ঘটনার ঐক্যের উপরই জোর দিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, এই তিনটী ঐক্যনীতি পালন করিলে নাটকের স্বাভাবিকতা অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়। কারণ, এতগুলি বিধিনিষেধের মধ্যে মানবজীবনের স্বাধীন লীলা-প্রদর্শন সম্ভবপর হয় না। ইংরেজী সাহিত্যে **Ben Jonson**

ঐক্যনীতি মানিয়া চলিয়াছেন, এবং Shakespeare মাত্র *The Tempest* এবং *The Comedy of Errors*-এ এই নিয়ম মানিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বত্রই তিনি *Unity of Action* বা ঘটনার ঐক্য মানিয়া নাটকের মূল-বিষয় পরিস্ফুট করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার নাটকের বৈচিত্র্য ও সজীবতা আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে কাল, স্থান ও ঘটনার ঐক্য অনুসৃত হয় নাই। ভবভূতির 'মহাবীর চরিত্রে' দ্বাদশবর্ষের ঘটনা নাট্যাকারে পরিবেশিত হইয়াছে।

কোন নাটক পরিপূর্ণ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে নাট্যকার, অভিনেতা, রঙ্গমঞ্চ ও সহৃদয়* সামাজিক (এবং আধুনিক কালে 'প্রযোজক')—এই কয়েকটী সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে। নাট্যকার ভাব-বস্তুকে প্রাণ দেয়, রঙ্গমঞ্চ, অভিনেতা ও প্রযোজক তাহাকে রূপ দেয় ও সামাজিক তাহাকে প্রত্যক্ষ করে। নাটক রচনাকালে প্রত্যেক নাট্যকারই নাটকীয় আখ্যানভাগ বা *Plot*, নাটকীয় ঘটনা-পরম্পরা (*Action*) সৃষ্টি করিবার জন্য যথাবিহিত চরিত্র-সৃষ্টি (*Characterisation*), নাটকীয় কুশীলবগণের (*Dramatis Personae*) সংলাপ (*Dialogue*), প্রয়োজনবোধে নাটকের স্থানীয় পরিবেশ-সৃষ্টি (*Local Colour*), বিশিষ্ট রচনাভঙ্গী এবং জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে স্বকীয় ধ্যান-ধারণার ইঙ্গিত প্রদান—প্রভৃতি বিষয়ে অবহিত হইবেন। নাট্যকার রাশীকৃত তথ্যস্তূপ হইতে বিশেষভাবে গ্রহণ ও বর্জ্জনের দ্বারা একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু-উপাদান গ্রহণ করিবেন এবং চরিত্র পরিস্ফুটনের জন্য ইহার পারম্পর্য্য ও সঙ্গতি রক্ষা করিবেন। 'চরিত্র বলিতে আমরা এইখানে নৈতিক চরিত্র বুঝিনা। মানুষের প্রবৃত্তি-পরিচালিত

নাটকের প্রয়োজনীয় বিষয়

---

*কাব্যচর্চ্চায় অভ্যাসহেতু যে সকল পাঠকের চিত্ত নির্ম্মল স্বচ্ছতা লাভ করিয়াছে এবং যাহারা কাব্যোক্ত বিষয়-বস্তুর সহিত স্বকীয় চিত্তবৃত্তিকে অভিন্ন করিয়া তুলিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন, তাহারাই 'সহৃদয়'। অভিনব গুপ্ত বলেন—যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাৎ বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয় তন্ময়ীভবনযোগ্যতা তেহত্র হৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ।

অন্তর্নিহিত ব্যক্তি-সত্তা বাহিরেও যখন একটি অনিবার্য্য অথচ পরিণামমুখী কর্ম্মস্রোতে তাহারই জীবনরূপে প্রকাশিত হয়, তখনই উহা তাহার 'চরিত্র' বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে। নাটকীয় সংলাপ কুশীলবগণের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে প্রজ্জ্বোল ও বিশিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং নাটকের স্থানীয় পরিবেশ যথাপ্রয়োজনীয় ভাবে সংলাপ ও অভিনয়-নির্দ্দেশের (*Stage Directions*) সাহায্যে সৃষ্টি করিতে হইবে। নাট্যকার তাঁহাব সৃষ্ট চরিত্রাবলী হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিয়া নাটকের বিষয়-বস্তুকে স্বাভাবিক পরিণতি দান করিতে চেষ্টা করিবেন। কোন আকস্মিক ঘটনা বা অসমঞ্জস চরিত্র-সৃষ্টি নাটকীয় অখণ্ড সৌন্দর্য্যকে যেন ক্ষুণ্ণ না করে। প্রয়োজনবোধে কখনো প্রতিরূপ বা অনুরূপ আখ্যান-বস্তু (*Parallel Plot*) সংগ্রথিত করিয়া তিনি নাটকীয় বিষয়-বস্তুকে রস-ঘন করিতে পারেন। সর্ব্বোপরি, নাটকের কাব্য-সত্য যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই বিষয়ে তাহাকে সজাগ থাকিতে হইবে। Aristotle-এর ভাষায়—"The poet should prefer probable impossibilities to improbable possibilities."

প্রত্যেক নাটকই সাধারণতঃ পঞ্চাঙ্কে* বিভক্ত। যথা—

(১) প্রারম্ভ (*Exposition*).
(২) প্রবাহ (*Growth of Action*).
(৩) উৎকর্ষ (*The Climax*).
(৪) গ্রন্থি-মোচন (*Falling Action or Denouement*).
(৫) উপসংহার (*Catastrophe or Conclusion*).

প্রথম অঙ্কে আখ্যানভাগের সূচনা, দ্বিতীয় অঙ্কে উহার জটিলতাসৃষ্টি, তৃতীয় অঙ্কে নাটকীয় ঘটনার ঘনীভূত অবস্থা বা চরম উৎকর্ষ, চতুর্থ অঙ্কে জটিলতা-মুক্তি ও পঞ্চমাঙ্কে সমাপ্তি বা উপসংহার।

Shakespeare-এর *Julius Caesar* নাটকের অঙ্ক-বিভাগ নিম্নে দেখান হইল :—

প্রথম অঙ্ক—রোমের রাজনৈতিক অবস্থা—অভিজাত সম্প্রদায় গণতন্ত্রের পক্ষপাতী,

* সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে নাটকীয় কাহিনীর মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ ও নির্বহণ—এই পাঁচটি বিভাগের উল্লেখ আছে। মহাকাব্যেও এইগুলি দেখা যায়।

অনুন্নত শ্রেণী রাজতন্ত্রে আস্থাবান। Brutus ও Cassius এর আলাপের মধ্য দিয়া Caesar-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-সম্ভাবনা প্রস্ফুট হইয়াছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক—Caesar-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে এবং Caesar যেরূপ অন্ধবিশ্বাসী, দাম্ভিক অথচ ক্লীবরূপে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার ভবিষ্যতও অনেকটা সূচিত হইয়াছে।

তৃতীয় অঙ্ক—Caesar-হত্যা এবং তাঁহার মৃত্যুতে Brutus ও Antonyর শোকোচ্ছ্বাস। Antonyর জ্বালাময়ী বক্তৃতায় জনগণের চক্ষুরুন্মীলন এবং Brutus-এর বিরুদ্ধাচরণ।

চতুর্থ অঙ্ক—Brutus ও Antony-র মনোমালিন্য। Brutus কর্তৃক Caesarএর প্রেতাত্মা দর্শন Caesarএর মৃত্যুত্তোর মহত্ত্বেরই পরিচায়ক।

পঞ্চম অঙ্ক—Philippi-র যুদ্ধে Brutus ও Cassius-এর পরাজয়, Brutus ও Cassius-এর আকস্মিক আত্মহত্যা, ফলে Caesarism-এর জয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকটি সম্রাটের শেষ জীবনের মর্ম্মন্তুদ ঘটনা অবলম্বনে রচিত। ইহার অঙ্ক-বিভাগ এইরূপ :—

প্রথম অঙ্ক—দিল্লীর সিংহাসন লোভে সাজাহানের পুত্রগণের মধ্যে বিদ্রোহ! বিদ্রোহ দমনান্তে বিজয়ী ঔরঙ্গজীব আগ্রায় প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক—ঔরঙ্গজীব দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন ও মোরাদকে বন্দী করেন। পরাজিত দারা রাজপুতনার মরুভূমিতে সপরিবারে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষমান। এইবার ঔরঙ্গজীব সুজার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন।

তৃতীয় অঙ্ক—গুজরাটের সুবাদার সাহাবাজ দারার পক্ষ অবলম্বন করেন। ঔরঙ্গজীব যশোবন্ত সিংহকে গুর্জ্জরের সুবাদারীর প্রলোভনে দারার পক্ষ হইতে সরাইয়া আনেন।

চতুর্থ অঙ্ক—পরাজিত ও ধৃত দারাকে ঔরঙ্গজীব কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। জিহন খাঁ দারার ছিন্নমুণ্ড আনিয়া ঔরঙ্গজীবকে উপহার দান করেন।

পঞ্চম অঙ্ক—দারার পুত্র সোলেমান বন্দী হইলেন, সুজা আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দারার মৃত্যুতে সাজাহান উন্মত্তবৎ কালাতিপাত করেন। ইহার পর অনুতাপদগ্ধ ঔরঙ্গজীব পিতার সমীপে গমন করিলে সম্রাট মাতৃহীন পুত্রকে ক্ষমা করিলেন।

বলা বাহুল্য, Julius Caesar-এ যেমন নাটকের তৃতীয় অঙ্কে চরম উৎকর্ষ (Climax) দেখানো হইয়াছে, 'সাজাহানে' উহা তেমন সুপরিকল্পিত হয় নাই।

নাটক : শ্রেণীবিভাগ

নাটকের বিষয়-বস্তু ও তাহার পরিণতির দিক হইতে উহাকে প্রধানতঃ কয়েকটী ভাগে বিভক্ত কথা যায়:—বিয়োগাত্মক নাটক (*Tragedy*), মিলনান্ত নাটক (*Comedy*) এবং প্রহসন (*Farce*).

ট্র্যাজিডি

আত্মদ্বন্দ্বে পরাভূত বা অভিভূত মানব জীবনের করুণ কাহিনীকে সাধারণতঃ *Tragedy* বলা হয়। সেক্সপীয়রের ট্র্যাজিডিতে কোন খ্যাতিমান, বিশিষ্ট ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির পতন দেখান হয়। এই জাতীয় নাটকে নায়কের ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতা বা সামান্য ভুল-ভ্রান্তির জন্য জীবনে অনর্থ আসিয়া পড়ে; কখনো দৈব বা অদৃষ্ট-পীড়িত হইয়া তাহাকে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়। নাট্যকার বিশেষ গুরুগম্ভীর বাণীভঙ্গিতে নায়কের জীবনের নিদারুণ বেদনাকে রূপ দান করেন। নায়ক গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইতে থাকে; একদিকে তাঁহার আপনার সঙ্গে আপনার দ্বন্দ্ব, (*Internal Conflict*), অপরদিকে বাহিরের ঘটনাপুঞ্জের সহিত তাঁহার দ্বন্দ্ব (*External Conflict*)। এই দ্বিবিধ দ্বন্দ্ব মূলতঃ আত্ম-দ্বন্দ্বের দুইটী দিক। চারিত্রিক ব্যক্তি-স্বাধীনতা (*Freedom within*) ও আত্মনিরপেক্ষ নিয়তি-লীলার (*Necessity without*) দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে বারবার পরাজিত হইয়াও যে শুধু *Will to power*-এ অনুপ্রাণিত হইয়া নায়ক আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চায়, তাহাই তাহাকে

নায়কসুলভ বৃহৎ মর্য্যাদা দান করে। এই তত্ত্বটিই মোহিতলালের ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে—

দেবতা-দোসর বীর, তারি পরাজয়-কথা,
সে হৃদয়-সাগর-মন্থন ;
নীলাকাশে উষাসম গবক্ষে অমৃত-রাগ,
মৃত্যুজয়ী জীবন-কাহিনী।

শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিডি 'মৃত্যুজয়ী জীবন-কাহিনী' বলিয়াই ইহা আমাদিগকে নায়কের ভাগ্যবিপর্য্যয়েও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করিয়া তোলে।

এখন আমরা Aristotle-এর ভাষায় ট্র্যাজিডির সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে পারি। তিনি বলেন—

Tragedy is an *imitation* of an action that is *serious, complete*, and of a certain *magnitude* ; in language *embellished* with each kind of artistic ornament, the *several kinds* being found in separate parts of the play ; in the form of *action*, not of *narrative* ; through pity and fear effecting the proper *purgation* of these emotions.

সুতরাং রঙ্গমঞ্চে নায়ক বা নায়িকার গতিমান জীবন-কাহিনীর দৃশ্যপরম্পরা উপস্থাপিত করতঃ যে-নাটক দর্শকের হৃদয়ে উদ্রিক্ত ভীতি ও করুণা প্রশমন করিয়া তাহার মনে করুণ-রসের আনন্দ-সৃষ্টি করে তাহাই ট্র্যাজিডি*। আরিষ্টটলের এই সংজ্ঞা হইতে বুঝা যায় যে—

(১) ট্র্যাজিডিতে কোন জীবন ক্রিয়মান হইয়া ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া রূপায়িত হয়।

(২) নাটকীয় ঘটনাবস্তু সুগভীর ও পূর্ণ-বলয়িত আকারে ট্র্যাজিডিতে প্রস্ফুট হয়।

(৩) ভাবগৌরবে, শব্দ-সম্পদ চয়নে ও গীতাদি সংযোগে ইহার বহিরঙ্গের প্রসাধন সংসাধিত হয়।

---

* There are six parts of every tragedy viz Plot, Character, Diction. Thought, Spectacle and Melody. *Aristotle (Bywater's Ed.)*

(৪) নাটকীয় বিচিত্র ঘটনাপুঞ্জ একটী মাত্র পরিণাম-মুখীনতার (*Unity of Action*) স্বরকে উদ্রিক্ত করিবে।

(৫) ট্র্যাজিডি ঘটনাত্মক, বর্ণনাত্মক কাব্য নহে।

(৬) সামাজিকের মনে করুণা ও ভীতির উদ্রেক করতঃ উহা নিরসন করিয়া ট্র্যাজিডি তাহার মানস-স্বাস্থ্য সংবিধান করে।

এতদ্ব্যতীত, Aristotle আরও বলিয়াছেন যে, নাটকের নায়ক জীবনে ভুলভ্রান্তির বশে দৈবদুর্বিপাকে নিপীড়িত হইতে পারেন, কিন্তু তাহার চরিত্রটি সৎ, যথোপযোগী, জীবন-সত্যের অনুগ ও সর্ব্বথা সুসমঞ্জস হইতে হইবে। তাঁহার মতে চরিত্র (*Character*) অপেক্ষা আখ্যান-বস্তু (Plot)-এর প্রভাবই ট্র্যাজিডিতে অধিকতর। কিন্তু সেক্সপীয়র তথা পরবর্ত্তীকালের ইংরেজী নাটকে চরিত্রই নাটকীয় আখ্যানবস্তুকে পরিচালিত করে। এইজন্য, অন্ততঃ সেক্সপীয়ারের নাটক সম্বন্ধে কেহ কেহ *Character is Destiny* অর্থাৎ চরিত্রই নাটকীয় ঘটনা-পুঞ্জের নিয়ামক, এই কথাটি বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে, ঘটনাপুঞ্জ ও আকস্মিক দৈবদুর্ব্বিপাকের (*Circumstances* এবং *Chance*) পীড়নে নায়ক আত্মশক্তি হারাইয়া ফেলে। ইহারা তাহার জীবনে ট্র্যাজিডির অনেকটা হেতু হইলেও নায়কের চরিত্রের ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতাই তাহার ট্র্যাজিডির মূল কারণ। Galsworthy-র *Justice* নাটকে দেখা যায়, সেক্সপীয়রে যাহা নিয়তি, সেখানে উহা সামাজিক বা রাষ্ট্রিক অবস্থা মাত্র। Aristotle ট্র্যাজিডির বিচারে ভাষার শ্রুতিমাধুর্য্য ও দৃশ্য-সজ্জার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বুঝিয়া রাখিতে হইবে, ট্র্যাজিডি অনুকরণাত্মক (*mimetic*) নহে—ইহা জীবনকে অনুবর্ত্তন করিয়া উহাকে রূপান্তরিত করে, গভীর করিয়া দেখে।

সেক্সপীয়রের বিয়োগাত্মক নাটকে মৃত্যুই স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু আধুনিক যুগে মৃত্যুকেই সকল সময় পরিণতিরূপে গ্রহণ করা হয় না। কোন ব্যক্তি-বিশেষের জীবন ঘটনাচক্রে, গ্রহ-বৈগুণ্যে বা নিজের দোষে ব্যর্থ হইয়া গেলে, সেই ব্যর্থতার ইতিহাসটীই বিয়োগান্ত নাটকের উপজীব্য রূপে গ্রহণ

করা হয়। আধুনিক যে-নাটক এইভাবে দর্শকের মনে ব্যর্থতার বেদনা জাগাইয়া তোলে, তাহাই ট্র্যাজিডি বলিয়া পরিগণিত। এইজন্য ইহাকে বিয়োগাত্মক না বলিয়া **বিষাদাত্মক নাটক** বলাই অধিকতর সমীচীন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ট্র্যাজিডি আমাদিগকে আনন্দ দান করে। সংস্কৃত আলঙ্কারিক বলেন—

> করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্
> সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্ ॥

অর্থাৎ করুণ প্রভৃতি রস হইতেও যে শ্রেষ্ঠ সুখ উৎপন্ন হয়, সহৃদয়গণের অনুভূতিই তাহার প্রমাণ। Abercrombie বলেন—

> Tragedy satisfies us even in the moment of distressing.

ট্র্যাজিডি মানবজীবনের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া সামাজিকের সহানুভূতি আকর্ষণ করে এবং তাহার মন করুণা ও ভীতিতে (*Pity and Fear*) পূর্ণ করিয়া দেয়। যখন আমরা দেখি যে, ব্যক্তিগত সামান্য কোন দোষে বা দৈবচক্রে একটী লোক ভীষণ দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছে, তখন স্বভাবতঃই তাহার জন্য আমাদের মনে দুইটী কারণে করুণা সঞ্চারিত হইতে পারে—প্রথমতঃ তাহার বিপদ দেখিয়া আমরা তাহার সঙ্গে সেই মুহূর্ত্তে একাত্ম হই, এবং মনে করি, এমন বিপদ আমাদের নিজের জীবনে সংঘটিত হইলে আমাদের পক্ষেও যে অসহনীয় হইয়া উঠিবে। এরূপ আত্ম-চিন্তায় আমাদের মনে ভীতি উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের অবস্থা তাহার মত না হইলেও, সে-ও মানুষ, সুতরাং মানুষ হিসাবে তাহার জন্য আমাদের হৃদয়ে স্বাভাবিক করুণা উদ্রিক্ত হয় এবং আমরা তাহার বিপদে সহানুভূতি-সম্পন্ন হই। বিশেষতঃ, নাটক দেখিবার সময় আমরা আমাদের অজানিতে নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া এতখানি তন্ময় হইয়া পড়ি যে, নায়ক বা নায়িকার ভাগ্য-লিপি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাগ্য-লিপি যেন নির্দ্ধারিত হইতেছে, এই সত্য-বোধই আমাদের

ট্র্যাজিডি আনন্দ দেয় কেন?

প্রাণে সঞ্চারিত হয়। তাহার ভুলের মধ্যে, আঘাতের মধ্যে, বেদনার মধ্যে আমরা আপনাকে পাই এবং মানব-জীবনের নিয়তি সম্বন্ধে সচেতন হই।

এই ভাবে আত্ম-বিলুপ্তির* মধ্য দিয়া নাটক দর্শনকালে আমাদের যেন নবজন্ম হয়। এইজন্য নায়ক বা নায়িকার দুঃখ, বিপদ, হর্ষ, বিষাদ, প্রেম, নৈরাশ্য, ঘৃণা, ক্রোধ প্রভৃতি আমাদেরই মনোভাব বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। নাটক দেখিতে যাইবার সময় আমরা অত্যন্ত সুস্থ মানুষটি ছিলাম—কিন্তু নাটক দেখিবার সময় আমরা নায়ক বা নায়িকার ভাবে তদ্‌গতচিত্ত হইয়া উঠি, তাহার দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করি, প্রেমের সাফল্যে উল্লসিত হই, নৈরাশ্যে ভাঙ্গিয়া পড়ি, ঈর্ষ্যায় ঈর্ষ্যান্বিত হই, ক্রোধে ক্রুদ্ধ হই, আনন্দে আত্মহারা হই। নাট্যকার সুকৌশলে, কৃত্রিম উপায়ে, এই ভাবগুলি আমাদের মধ্যে উদ্রিক্ত করিয়া দিয়া ইহাদের আকস্মিক ও অত্যুগ্র আত্ম-প্রকাশ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন। ইহাতে এইরূপ মনে করিলে চলিবেনা যে, ট্র্যাজিডি যে-আনন্দ দেয় উহা অভাবাত্মক (*negative*) ; কারণ করুণা ও ভীতি উদ্রেক করিয়া যে মানস-শান্তি সংবিধান করা হয়, উহা নাটক দেখিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের সামাজিকের মনের অবস্থা নয়—উহা উদ্বেলিত মনোভাবের অশ্রু-বিধৌত সাম্যাবস্থা। সুতরাং নাটক দেখিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের সাম্যাবস্থা ও ইহার পর মুহূর্ত্তের শান্ত অবস্থা মূলতঃ প্রায় এক হইলেও পরেরটি তীব্রতর ও গভীরতর। প্রশ্ন উঠিতে পারে—নাটকে করুণা ও ভীতি উদ্রিক্ত হওয়া ও প্রশমিত হওয়া—ইহার মধ্যবর্ত্তী কালেও সামাজিকগণ কি দুঃখ বোধ করেন? ইহার উত্তরে আমরা বলিব যে, নাটকে পরিবেশিত

---

* Aristotle-এর এই মত প্রসঙ্গে Philo M. Buck বলেন যে, অধিকাংশ ট্র্যাজিডিতে দর্শকের আত্ম-বিলুপ্তি অপেক্ষা আর একটী মিশ্র (*Complex*) অভিজ্ঞতাই বড় হইয়া উঠে। নাটকীয় চরিত্রাবলীর বিকাশ-ব্যূহের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়াইয়া, অথচ ইহাদের কাহারও সহিত ব্যক্তিগতভাবে সহানুভূতি না দেখাইয়া, শুধু সকলকে গ্রহণ করিয়া, আবার সকলের অভিজ্ঞতার অতীত হইয়া নাটকের পূর্ণতর অনুভূতি লাভ করাই দর্শকের পক্ষে বেশি স্বাভাবিক।

করুণা ও ভীতি এমন একটি বেদনা-বিধুর জীবনালেখ্য অঙ্কিত করে যে, করুণা ও ভীতি যেন তখন আস্বাদ্য ও আনন্দ-মধুর হইয়া ওঠে।

Aristotle বলেন, কোন লোকের দেহে রক্তাধিক্য হইলে ডাক্তারগণ যেমন কিয়ৎ পরিমাণে রক্ত-মোক্ষণ করিয়া (*Catharsis* or ***Purgation***) তাহাকে নিরাময় করেন, ট্র্যাজিডিও তেমন আমাদের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে বাসনা-কামনা উদ্রেক করিয়া, আবার উহাদের নিরসন করতঃ আমাদের মানস-স্বাস্থ্যের সাম্যবিধান করেন। কারণ, নাটক দেখিয়া আমরা অশ্রুধারার মধ্য দিয়া জীবনের যে রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিলাম, তাহাতে আমাদের মানসিক চিকিৎসা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে—উদ্বৃত্ত বাসনারাশির প্রশমনে আমরা লঘু হইয়া উঠিয়াছি। অন্যের (নায়ক ও নায়িকা) বেদনার মধ্যে আমরা নিজেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অথচ বেদনার আঘাতকে ব্যক্তিগত করিয়া পাই নাই, যেহেতু আমরা তখন সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃত ছিলাম। নাট্যকার গভীর ভাবে আমাদের সুপ্ত বেদনা-সিন্ধু উদ্বেলিত করিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে প্রশমিত করিলে, আমরা অশ্রুবিধৌত হইয়া বর্ষণ-স্নাত শ্যাম প্রকৃতির মত শান্ত, সমাহিত ও কান্ত রূপ পরিগ্রহ করি। ট্র্যাজিডিতে এই মাধুর্য্য আছে বলিয়াই আমরা তাহা দেখিয়া কাঁদি, আবার বলি, 'ভাল লাগিল, আনন্দ পাইলাম।' ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই সক্রেটিস বলেন, 'we smile through our tears'।

কৃত্রিম উপায়ে বাসনা-কামনা উদ্রেক করিয়া আবার তাহাকে প্রশমিত করিবার এই যে নাটকীয় কলা-কৌশল- -artistic subjugation of the awful—ইহাকে Aristotle-এর ভাষায় *Catharsis* বলে। আধুনিক সমালোচক I. A. Richards বলেন যে, করুণা ও ভীতি—এই দুইটি, বিপরীতধর্ম্মী প্রবৃত্তির সমন্বয় সাধনই ট্র্যাজিডির মুখ্য উদ্দেশ্য। করুণায় বিগলিত হইয়া আমরা নায়কের সঙ্গে একাত্ম হই, ভীতিতে আবার তাহার সঙ্গসুখ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হই।

Aristotle ট্র্যাজিডির আনন্দদায়িনী শক্তি বুঝাইতে গিয়া যে-আনন্দের কথা বলিয়াছেন, উহা মূলতঃ নৈতিক হইলেও একালে আমরা উহাকে সাহিত্যের

আনন্দ-রূপেই আখ্যাত করিয়া থাকি। সত্য কথা বলিতে গেলে, তিনি যে Catharsis-এর কথা বলিয়াছেন, তাহা অশিক্ষিত সামাজিকবর্গের কল্পনার বাহিরে। সাধারণ লোক ট্র্যাজিডি ভালবাসে, তাহার কারণ এই নয় যে, সে উদ্বৃত্ত বাসনা হইতে মুক্তি পাইতে চায়—বরং, সে জীবনের বাসনা-কামনার মণ্ডলায়িত চিত্রটিকে আরও আস্বাদন করিতে চায়, বেদনার উৎসবে সে জীবনের মহিমময় দিকটি দেখিতে চায়। Lucas* বলেন—

'Tragedy....is a representation of human unhappiness which pleases us notwithstanding, by the truth with which it is seen and the skill with which it is communicated.. It is man's answer to the universe that crushes him so pitilessly'.

ট্র্যাজিডির আনন্দ-দায়িনী শক্তির কারণ আরও গভীর। ট্র্যাজিডিতে মানবজীবনের নিদারুণ ব্যর্থতা ও অক্ষমতার বাণী ফুটিয়া উঠে সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিডিতেই জীবনের প্রতি বিদ্বেষ বা বীতস্পৃহার পরিচয় নাই। ইহাতে মানুষ বাস্তবের সকল সংশয় মুক্ত হইয়া পরাজয় ও বেদনার একটি অপরূপ অর্থ-ব্যঞ্জনায় পরম আশ্বস্তি লাভ করে। এইজন্য জনৈক সমালোচক বলেন,—

'The great tragic writer says 'Yea' to life in every fibre of his being, however terrible, grim or ghastly it may appear'

গভীর দুঃখকে, ভূমাকে মানুষ 'হৃদামনীষা মনসা' স্বীকার করিয়া নেয়। কারণ, সাহিত্যের মধ্যেই মানুষ নিজেকে অপরের সহিত একাত্ম করিয়া দেখিবার শক্তি অর্জ্জন করে। বিশেষতঃ ট্র্যাজিডিতে জীবনের যে-একটা সমগ্র রূপসৃষ্টি হয়, তাহা বুদ্ধির অতীত, শুধু হৃদয়বেদ্য। বুদ্ধির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মানুষ আত্ম-দর্শনের গভীর চেতনায় যে-রূপের সাক্ষাৎ লাভ করে, তাহাতে তাহার প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়। মৃত্যু বা ব্যর্থতা যে-নাটকের পরিণতি, তাহার মধ্য দিয়া তাহার

*Aristotle-এর Catharsis সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া John Morely বলিয়াছেন—'It is one of the disgraces of the human intelligence, a grotesque monument of sterility. এই উক্তি কৌতুকাবহ বটে।

'*soul-making*' বা আত্মশুদ্ধি হইয়া গিয়াছে, বেদনা তাহাকে অগ্নি-বিশুদ্ধ স্বর্ণ-কান্তি দান করিয়া মহিমময় করিয়া তুলিয়াছে, তাই মর্ম্মান্তিক কাহিনীও তাহার কাছে মধুর হইয়া উঠে। এই অনুভূতির মধ্যে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে বিস্ময়-মধুর অমৃতের আশ্বাস ও পরম প্রাপ্তির সান্ত্বনা-বাণী নিহিত—

'The strange calm which succeeds the spectacle of tragic dissolution, comes not from a sense of defeat but from awe of the fulfilment.'

Milton তাঁহার *Samson Agonistes*-এ এই কথাই বলিয়াছেন—

With peace and consolation hath dismist
And calm of mind all passion spent.

কমেডি ও ট্র্যাজিডির বিভিন্নতা শ্রেণীগত নহে, মাত্রাগত। কমেডির হাস্যরসের সুরটি চড়াইতে চড়াইতে হাস্য ক্রমে অশ্রুজলে পরিণত হইলে তখন উহাই ট্র্যাজিডিতে রূপান্তরিত হইতে পারে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের লঘু দিকটি যখন আনন্দোচ্ছল রূপে, নাটকের নায়ক-নায়িকার মিলন-মাধুর্য্যে পরিসমাপ্তি লাভ করে, তখনই উহাকে আমরা কমেডি (*Comedy*) বলি। ইহার নায়ক আত্মপ্রতিষ্ঠা কল্পে সর্ব্ববিধ ঘটনাচক্র ও বাধাবিঘ্ন অনায়াসে বা অল্পায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া সাফল্যের উচ্চগ্রামে উপনীত হন। ইহার পরিসমাপ্তি হাস্যমধুব ও আনন্দোজ্জ্বল। শারদ আকাশেব সীমাহীন নীলিমায যে অপরূপ স্বচ্ছতা, বাসন্তী সৌন্দর্য্যে যে প্রগল্ভ কান্তি, আকাঙ্ক্ষিত জনের সহিত মিলন মুহূর্ত্তে প্রেম-মুকুলিতার অধরে যে হাস্যারুণ দীপ্তি, শ্রেষ্ঠ কমেডির পবিসমাপ্তিতে সেই স্বচ্ছতা, সেই কান্তি, সেই দীপ্তি।

কমেডি

দার্শনিক-প্রবর Hobbes বলেন যে, আমরা অপরের কোন দুর্ব্বলতার তুলনায় যখন নিজেকে যোগ্যতর মনে করি, তখনই কমেডিতে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। কিন্তু অপরের দুর্ব্বলতা সকল সময়ই হাস্যরসাত্মক নয়। দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে পরাজিত ব্যক্তি হাস্যরস সঞ্চার না-ও করিতে পারেন। এইজন্যই Fielding বলেন, অযোগ্যের আস্ফালনে যখন আত্মম্ভরিতা বা দেখানোর ভাব থাকে, তখনই উহা হাস্যরসাত্মক। কিন্তু

অযোগ্যের ব্যর্থ আস্ফালনে আমাদের মনে হাস্যরস অপেক্ষা নৈতিক ক্রোধের সঞ্চারই বেশি হয়। Meredith বলেন, হাস্যরসকে 'sword of commonsense' বা 'সাধারণ বুদ্ধির ক্ষুরধার তরবারি' বলা যাইতে পারে; ইহার সাহায্যে মানুষের নির্বুদ্ধিতার নিধন সংসাধিত হইয়া থাকে অর্থাৎ মানুষের চারিত্রিক দুর্বলতাকে ইহার আলোতে বিশ্লেষিত করিয়া আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করি। বলা বাহুল্য, মেরিডিথ্ হাস্যরসকে নৈতিক দৃষ্টির সাহায্যে শোধন করিয়া লইয়াছিলেন, ইহার সহিত কাব্য-সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ সামান্যই।

Aristotle অবলম্বনে বলা যাইতে পারে যে, মানব-চরিত্রের যে-কৌতুকাবহ দিকটা পীড়ন করে না, ব্যথা দেয় না, হাস্যরস সৃষ্টি করে. তাহাই কমেডির উপজীব্য। তিনি বলেন—

'A comedy is an imitation of men worse than the average ; worse, however, not as regards any and every sort of fault, but only as regards particular kind, the Ridiculous, which is a species of the ugly. The ridiculous may be defined as a mistake or deformity not productive of pain or harm to others.'

এই কৌতুকের জন্ম আবার ইচ্ছার সহিত অবস্থার, আকাঙ্ক্ষার সহিত প্রাপ্তির, উদ্দেশ্যের সহিত উপায়ের বা কথার সহিত কার্য্যের অসঙ্গতির মধ্যে। অসঙ্গতি ট্র্যাজিডি ও কমেডি—উভয়েরই উপজীব্য। ট্যাজিডির নায়কের সহিত জগতের বিরোধই (Conflict) 'অসঙ্গতিকে' নিদারুণরূপে প্রতিভাত করে এবং কমেডির নায়কের সহিত আমাদের সাধারণ জগতের অসামঞ্জস্য বা বৈষম্যই (Contrast) 'অসঙ্গতিকে' হাস্যারুণ করিয়া তোলে। এইজন্যই একান্ত স্থূলবুদ্ধি যখন নিজেকে বুদ্ধিমান বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, অজ্ঞানী যখন জ্ঞানের স্পর্দ্ধা করেন, কূটবুদ্ধি যখন সরলতার ভাণ করেন, দুষ্প্রাপ্য বস্তু-মোহে কেহ যখন জলৌকার ন্যায় নিষ্ঠার সহিত আত্মসমাহিত থাকেন, তখন আমাদের হাসি পায়। সকল সময়ই যে এই হাসি নির্ব্বিষ হইবে এমন কথা নয়। এই হাসির মধ্যে পরপীড়নেচ্ছা সামান্য পরিমাণে বিদ্যমান থাকিতে পারে। আপাত-অসম্ভব হইলেও বেদনাও হাস্যরসের জন্মভূমি। অপরকে বেদনা দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ

করিবার কামনাও মানুষের অতি সাধারণ মনোবৃত্তি। এই পরপীড়নেচ্ছা মাত্রা ছাড়াইয়া গেলে, অপরের বেদনা দেখিয়া যিনি আত্মপ্রসাদের হাসি হাসিতেছিলেন, তাহার চক্ষুও অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে, এবং যাহার দুর্দ্দশায় তিনি আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, তাহার প্রতি তাহার সহানুভূতি সঞ্চারিত হয়। অর্থাৎ অসঙ্গতির আঘাত যখন মনের অনতিগভীর স্তর ছাড়াইয়া গভীরতর স্তরে পৌঁছায়, তখন হাসি অশ্রুতে পর্য্যবসিত হয়। (রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'কমেডি এবং ট্র্যাজিডি কেবল পীড়নের মাত্রাভেদ। কমেডিতে যতটুকু নিষ্ঠুরতা প্রকাশ হয় তাহাতেও আমাদের হাসি পায় এবং ট্র্যাজিডিতে যতদূর পর্য্যন্ত যায় তাহাতে আমাদের চোখের জল আসে....অসঙ্গতির তার অল্পে অল্পে চড়াইতে চড়াইতে বিস্ময় ক্রমে হাস্যে এবং হাস্য ক্রমে অশ্রুজলে পরিণত হইতে থাকে।') (সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, অসঙ্গতিবোধ ট্র্যাজিডি ও কমেডি—উভয়েরই উপজীব্য হইতে পারে।*) Malvolio যখন Olivia-র প্রেম-স্বপ্নে আত্মবঞ্চনা করে, তখন আমাদের হাসি পায়; কিন্তু কোন লোক জীবনের পরম অভিলষিতকে আজন্মকাল অনুসরণের পর হস্তগত করিযা যখন দেখে সে তুচ্ছ প্রবঞ্চনা মাত্র, তখন তাহাব নৈরাশ্যে আমাদের চিত্ত ব্যথিত হয়। (কমেডির অসঙ্গতিবোধ নানারকমের হইতে পারে। নাটকীয় চরিত্রের মূলগত ভাবের সহিত তাহার সংস্থানের অসঙ্গতি, ভাবের সহিত ভাষার, কথার সহিত কাজের, প্রচারের সহিত জীবন-নিষ্ঠার—প্রভৃতি নানারূপ অসঙ্গতিই কমেডির উপজীব্য।)

প্রাচীন গ্রীক ও ফরাসী কমেডিতে যে হাস্যরস সৃষ্টি করার চেষ্টা হইয়াছে, তাহাও সমাজের বিদ্রূপ-কটাক্ষ-লাঞ্ছিত—*social gesture*—বলিয়া মনে হয়।

কমেডির উদ্দেশ্য

শাস্ত্রসম্মত নাট্য রচনা করিতে গিয়া Ben Jonson তাহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির কোন বিশিষ্ট স্বভাব অতি-রঞ্জনের দ্বারা হাস্যরস সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিতেন। Shakespeare-এর কমেডি আলোচনা

---

*_Cf._ 'What a piece of work is man', cries the tragic Muse; and Comedy echoes with a laugh, 'What a piece of work' !—_Lucas._

করিলে দেখা যায় যে, জীবনের অসঙ্গতিবোধকে তিনি যে ভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কমেডি গণশিক্ষার বাহন হইয়া উঠে নাই; তাহার হাস্যরস যেন সুস্থ সমাজচেতনার উদার ক্ষমাসুন্দর হাসি*। ' Meredith যাহাকে 'the spirit of commonsense in society vigilant but kindly'. বলেন, এই হাসি তাহা অপেক্ষাও সহৃদয়। কারণ এই হাস্যরসে দর্শকের অহমিকা বোধ থাকে না। হাস্যোদ্দীপক চরিত্রের সহিত অভিন্ন হইয়া সামাজিকগণ ক্ষণতরে সমালোচকের আসন হইতে নামিয়া আসিয়া আত্মসাক্ষাৎকার করেন, নিজের দুর্ব্বলতার মধ্যে নিজেকে দর্শন করেন। এই জন্যই সেক্সপীয়রের Falstaff-কে আমরা বিচার করি না, দীনবন্ধুর নদের চাঁদকেও প্রত্যাখ্যান করি না—আমাদের অন্তর্নিহিত Falstaff ও নদের চাঁদের সহিত পরিচয় করিয়া ধন্য হই।' অনেক সময় নায়কের ভুল ভ্রান্তি আমাদের (?) মত গুণান্বিত জনের জীবনে ঘটিতে পারে না, এইরূপ ভাবজনিত আত্মপ্রসন্ন চিত্তে আমরা বলি, 'বেশ হইয়াছে'। কিন্তু অপরের দুর্ব্বলতা বা স্থূলবুদ্ধি দর্শন করিয়া হাস্য করা অপেক্ষা ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতা নায়কের চরিত্রে প্রতিফলিত দেখিয়া হাস্য করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। শ্রেষ্ঠ কমেডি আমাদের মধ্যে সেই হাসির উদ্রেক করিতে পারে। কারণ, ইহা আমাদের আত্মসাক্ষাৎ করাইয়া দেয়। ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা নায়কের চরিত্রে সন্দর্শন করিয়া আমরা সকলের অজানিতে আত্মসংশোধন করিবার সুযোগ পাই। সুতরাং, ট্র্যাজিডি যেমন আমাদের উদ্বৃত্ত বাসনা-কামনা প্রশমন করিয়া মানস-স্বাস্থ্য বিধান করে, কমেডিও তেমন আমাদের মানবসুলভ ত্রুটীবিচ্যুতি ও নির্ব্বুদ্ধিতার পরিণাম অঙ্কনের সাহায্যে আমাদিগকে অশোভন দুর্ব্বলতার হাত হইতে মুক্তি দান করিয়া স্বাভাবিক ও সুস্থ করিয়া তোলে।

**Cf.* 'A Shakespearian comedy is a delightful story, conducted in some romantic region, by gracious and gallant persons thwarted or aided by the mirthful God, Circumstance, and arriving at a fortunate issue' —*Dowden.*

কমেডি জীবনের কোন গভীর সমস্যাকে নাটকীয় উপজীব্য হিসাবে গ্রহণ করে না, শুধু জীবনের লঘুতর দিকটী উপস্থাপিত করে, ইহার অর্থ এই নয় যে, ইহাতে কোন জীবন-জিজ্ঞাসা নাই। আসল কথা এই, কমেডির জীবন-জিজ্ঞাসা মানুষকে কোন পরম রহস্য সন্ধানে নিয়োজিত করে না—বরং মানুষকে সর্ব্বপ্রকার অসঙ্গতির উর্দ্ধে লইয়া যায়। মানুষ এইখানে সজ্ঞানে সুস্থচিত্তে সানন্দে ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতাকে অতিক্রম করে। কমেডিতে মানুষ এই পৃথিবীর মধ্যেই তাহার বিজয়-পতাকা উড্ডীন দেখিতে পায়। যে ঘটনাচক্র তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান, তাহাকে নিষ্পেষিত করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করা এবং 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরাকে' বীরের মত দেহমনপ্রাণ দিয়া ভোগ করাই তাহার বাসনা। পৃথিবীর এই সূর্য্যকরদীপ্ত জীবনের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করাই কমেডির নায়কের লক্ষ্য।* তাই সে বলে—

> মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
> মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

কমেডির আখ্যানভাগ অত্যন্ত উদ্ভট বা কল্পনাপ্রবণ হইলেও নাট্যকারকে ঘটনাপুঞ্জের কেন্দ্রিক সম্ভাব্যতা বা স্বাভাবিকতা রক্ষা করিতেই হইবে। ইহাই উৎকৃষ্ট কমেডির একমাত্র বিশেষত্ব। কমেডিতেও নাট্যকার আখ্যানভাগের প্রারম্ভ, প্রবাহ, উৎকর্ষ ও গ্রন্থি-মোচনের দ্বার উত্তীর্ণ হইয়া সুকৌশলে স্বাভাবিক উপসংহারে উপনীত হন। মোটামুটি ভাবে কমেডিকে কয়েকশ্রেণীতে ভাগ করা যায়—

শ্রেণীবিভাগ

(১) কাব্যধর্ম্মী বা *Romantic Comedy*—যে-কমেডি অত্যধিক কল্পনা-প্রবণ বা কাব্যধর্ম্মী, তাহা রোমাণ্টিক কমেডি (*Romantic Comedy*) নামে অভিহিত, যথা, Shakespeare এর *Twelfth Night*.

(২) সামাজিক বা *Comedy of Manners*—যে-কমেডিতে সমাজের ধর্ম্ম, নীতি, রাষ্ট্র প্রভৃতির বিদ্রূপাত্মক অবতারণা থাকে তাহাকে সামাজিক

* *Cf.* Comedy is critical, and its main use is to teach the world what ails it.—Gordon.

কমেডি (*Comedy of Manners*) কহে। রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন', দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী', অমৃত বসুর 'তাজ্জব ব্যাপার', রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল' ও প্রমথ বিশীর মৌচাকে ঢিল', Sheridan-এর *The Rivals* এই শ্রেণীভুক্ত।

(৩) চক্রান্তমূলক বা *Comedy of Intrigue*—যে-কমেডিতে কুশী-গণ কোন চরিত্রবিশেষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা নাটকীয় পরিণতিদান করে, তাহাকে চক্রান্তমূলক কমেডি (*Comedy of Intrigue*) বলে। এই শ্রেণীর নাটকে চরিত্রাঙ্কন অপেক্ষা আখ্যানভাগ রচনার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়। Dryden এর *The Spanish Friar*, ক্ষীরোদ প্রসাদের 'জয়শ্রী' এই শ্রেণীভুক্ত। এতদ্ব্যতীত, ইংরেজী সাহিত্যে *Comedy of Character* (অথবা *Comedy of Humour*), *Comedy of Dialogue* প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগও দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর নাটকে নাটকীয় চরিত্রাবলীর বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যকে বিদ্রূপ-লাঞ্ছিত রূপে প্রস্ফুট করা হয়। Ben Jonson এর *Volpone*, Moliereএর *L'Avare* এই শ্রেণীর নাটক। কোন নাটকে যদি ঘটনা অপেক্ষা কুশীলবগণের সংলাপ-পরিচালনার দিকে নাট্যকারের বিশেষ দৃষ্টি থাকে, তবে উহাকে *Comedy of Dialogue* বা সংলাপ-মূলক নাটক বলা যায়। Shakespearএর *As You Like It*, *Much Ado About Nothing*, রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' এই শ্রেণীভুক্ত। বলা বাহুল্য, সংলাপের সাহায্যে নাটকীয় চরিত্র বিকশিত হইয়া উঠে, এবং চরিত্রগুলির ক্রিয়াকলাপ আবার নাটকীয় ঘটনারূপে রসঘন হইয়া উঠে।

উপরে কমেডির যে শ্রেণীবিভাগ করা হইল, দেশবিদেশের সকল কমেডিই ইহার আলোকে বিভাগ করা সম্ভব নাও হইতে পারে। শ্রেণীবিভাগ ব্যাপারটীর অসম্পূর্ণ থাকিতে বাধ্য, তাই এইরূপ হয়। কেহ কেহ আবার বিষয়বস্তু পরিবেশন-ভেদে কমেডির নিম্নরূপ শ্রেণীবিভাগও করিতে পারেন।—

(১) কল্পনাত্মক বা *Romantic*—যথা—সেক্সপীয়রের *Tuelfth Night*. (২) ভাবপ্রবণ বা *Sentimental*—যথা—Barrie-র *The Admirable*

Crichton (৩) বাস্তব বা *Realistic*—যথা:—Moliere-র *The Middle Class Gentleman.*

(৫) অদ্ভুতাত্মক বা *Fantastic*, যথা Bridie-র *Tobias and the Angel.*

(৪) বিদ্রূপাত্মক বা *Satirical*, যথা Gogol-র *Inspector General.*

(৬) সামাজিক বা *Social*, যথা Shaw-র *Heart-Break House.*

(৭) ভাবপ্রধান বা *Comedy of Ideas*, যথা Shaw-র *The Man and Superman.*

নাটকীয় বিষয়বস্তু সন্নিবেশ বা কথাবস্তু পরিবেশনের দিক হইতে আরও কয়েকপ্রকার নাটকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য।

ঐতিহাসিক নাটক

ঐতিহাসিক নাটক (*Historical Drama*)—অতীত ইতিহাসের কোন অধ্যায় অবলম্বন করিয়া লিখিত। ইহাতে নাট্যকার ঐতিহাসিক সত্যকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া শুধু সাহিত্যিক বা নাটকীয় প্রয়োজনানুযায়ী দুই চারিটি কল্পিত চরিত্র বা কল্পিত কাহিনীর সমাবেশ করিতে পারেন। কাব্য হিসাবে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিতে হইলে সমগ্র ইতিহাসকে অবিকৃতভাবে গ্রহণ করা যায় না। শুধু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, অতীতের যুগচিত্র হিসাবে নাটকখানি যেন ভাবসত্যের অপলাপ না করে। সংস্কৃতে বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস'; সেক্সপীয়রের *Henry IV*; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত', 'সাজাহান', 'নূরজাহান'; ক্ষীরোদ প্রসাদের 'আলমগীর'; যোগেশ চৌধুরীর 'দিগ্বিজয়ী'; শচীনসেনের 'গৈরিকপতাকা'; মহেন্দ্রগুপ্তের 'মহারাজা নন্দকুমার'; নিশিকান্তের 'বঙ্গেবর্গী'; অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের 'অযোধ্যার বেগম' প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক। নাটকীয় বিষয়বস্তুর পরিণতি অনুযায়ী এই জাতীয় নাটককে ট্র্যাজিডি বা কমেডি শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

পৌরাণিক নাটক

পৌরাণিক নাটক (*Mythical Drama*) রামায়ণ, মহাভারত বা প্রাচীন কোন ধর্ম্মমূলক কাহিনী অবলম্বনে লিখিত। ইহাতে অনেক সময় অতি-প্রাকৃতের সমাবেশ দৃষ্ট

হয়। নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য পৌরাণিক তথ্যসমূহকে নাটকীয় রূপদান করা। ইংরেজী সাহিত্যে *Everyman*, John Heywood-এর *The Four P's*, Byron-এর *Cain*, ও বাংলায় গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল', 'জনা', অমৃতলালের 'হরিশ্চন্দ্র', দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা', ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নরনারায়ণ', মন্মথ রায়ের 'কারাগার এই শ্রেণীর নাটক।

প্রহসন

প্রহসন (*Farce*) নামক আর একপ্রকার নাটকের উল্লেখ সংস্কৃতেও দেখা যায়। সমাজের কু-রীতি শোধনার্থে রহস্যজনক ঘটনাসম্বলিত হাস্যরস-প্রধান একাঙ্কিকা নাটককে সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ 'প্রহসন' বলিতেন। 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকাকারে হইলেও সংস্কৃত মতে প্রহসন। প্রহসনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটনাবিন্যাসের বা চরিত্রের অতিরঞ্জন পরিদৃষ্ট হয় এবং ইহাতে চরিত্র অপেক্ষা ঘটনাবিন্যাসের প্রাধান্য দেখা যায়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, প্রহসনে জীবনের খণ্ডাংশের যেটুকু অতিরঞ্জিত চিত্র দেওয়া হয়, তাহা সামাজিকগণ কোনদিনই গভীর অর্থপূর্ণ বলিয়া মনে করেন না। বিশেষ কোন আদর্শবাদ বা ভাবকল্পনার স্থানও এইখানে নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাস্যরসময় জীবনালেখ্য সৃষ্টিই ইহার উদ্দেশ্য। এইজন্য কেহ কেহ ইহাকে 'the type of drama stuffed with low humour and extravagant wit' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকও বলিয়াছেন—

হাস্যোদ্দীপন-কাব্যন্তু প্রহসনমিতি স্মৃতম্।

বর্ত্তমানকালে 'প্রহসন' বলিতে অতিমাত্রায় লঘু-কল্পনাময়, আতিশয্য-ব্যঞ্জক, হাস্যরসোচ্ছল সংস্থান-মূলক নাটককে বুঝায়। এরিষ্টোফেনিসের '*The Frogs*', Moliere-এর '*Le Bourgeois Gentle Homme*' এবং '*Le Misanthrope*', Sheridan-এর *The Scheming Lieutenant*, অস্কার ওয়াইল্ডের '*The Importance of Being Earnest*', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ, 'অলীকবাবু'; দ্বিজেন্দ্রলালের 'কল্কিঅবতার', 'বিরহ', 'পুনর্জন্ম'; অমৃত বসুর

'তাজ্জব ব্যাপার'; রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা', 'বৈকুণ্ঠের খাতা' এই জাতীয় নাটক।

Extravaganza

প্রহসনে উদ্ভট কল্পনার সহিত নৃত্যগীত-প্রাধান্য থাকিলে তাহাকে *Extravaganza* (অদ্ভুত নাট্য) বলে। সাধারণতঃ পৌরাণিক বা সাময়িক বিষয়বস্তু অবলম্বনে এই জাতীয় নাটিকা রচিত হয়। Extravaganza প্রহসন জাতীয় হইলেও বাক-বৈদগ্ধ্য (wit) ও লঘু-চপলতাই ইহার বৈশিষ্ট্য। আধুনিক কালের Christopher Fry-র *The Lady's Not For Burning*, Thornton Wilder-এর *The Skin of our Teeth* এবং ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা' এই শ্রেণীর নাটক।

গীতি-নাট্য

অপেরা (গীতিনাট্য বা গীতাভিনয়) শব্দটি ইটালী হইতে আগত। ইহা মুখ্যতঃ নৃত্যগীত সম্বলিত নাটক হইলেও গান এই নাটকে গৌণ নহে, মুখ্য। Gay-র *Beggar's Opera* নামক নাটকেও সাহিত্যিক অংশটি মুখ্য নহে, সঙ্গীতই ইহার প্রাণ। আমাদের দেশে 'অপেরা' শব্দটি 'যাত্রার' প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বাংলায় গীতিবহুল এই শ্রেণীর নাটকের মধ্যে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'কিন্নরী', অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'শিরী ফরহাদ', জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের 'ধ্যানভঙ্গ', রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' এবং 'ঋতুউৎসব' সম্পর্কিত নাটকগুলি এই শ্রেণীর।

নৃত্যনাট্য

যে নাটকে নৃত্যের* মধ্য দিয়া নাটকের চরিত্রাবলীর ভাবভাষা অনুকৃত হইয়া বিশেষ কোন ভাবকে রূপায়িত করা হয়, তাহাকে নৃত্যনাট্য (*Dance Drama*) বলা হয়। বলাবাহুল্য, হৃদয়ের ভাব নৃত্যের সাহায্যে হাস্যে লাস্যে ভাবে ভঙ্গিমায় ইঙ্গিতে প্রকাশ করা খুব সহজসাধ্য নহে। তথাপি, সার্থক নৃত্যনাট্যে নাটকীয় ঘটনা ছন্দায়িত কম্পনে সামাজিক-গণের প্রাণ স্পর্শ করে। রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্য এই শ্রেণীর উৎকৃষ্ট নাটক।

---

* 'নৃত্ত' অর্থ অভিনয়শূন্য অঙ্গচালনা, 'নৃত্য' অর্থ ভাবের অভিনয়।

বাংলা সাহিত্যে ইদানীন্তন কালে চরিতনাটক (*Biographical Drama*) নামে এক শ্রেণীর নাটক লিখিত হইতেছে। ইংরেজীতে **John Drinkwater** *Abraham Lincoln* (1918) লিখিয়া এই জাতীয় নাটকের সূচনা করেন। বাংলা সাহিত্যে 'বনফুলই' প্রথম এই শ্রেণীর নাটক রচনা করেন। তাঁহার 'শ্রীমধুসূদন' ও 'বিদ্যাসাগর' খুব সম্ভব এই শ্রেণীর প্রথম নাটক। ইহাদের অনুকরণে মহেন্দ্র গুপ্ত 'মাইকেল' ও 'মহারাজ নন্দকুমার' রচনা করেন। সাম্প্রতিককালে শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রামপ্রসাদ প্রভৃতি মহাপুরুষের জীবনী অবলম্বনে নাটক ছায়াচিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে।

চরিতনাটক

অনেকেই মনে করেন, শুধু সংলাপের মধ্য দিয়া চরিত্র বিশেষ পরিস্ফুট করিলেই নাটক হইবে। কিন্তু কথোপকথন বা সংলাপের মধ্য দিয়া যদি ঘটমান চরিত্রবিকাশ না হয় তবে, আর যাহাই হোক নাটক সৃষ্টি হয় না। আর একটি কথা, যাঁহার চরিত নাটকে রূপায়িত হইবে, তাঁহার আকৃতি প্রকৃতির সহিত নট বা নটীর আকৃতি-সাদৃশ্য নির্ব্বাচন অতি যত্নের সহিত করা প্রয়োজন, যাহাতে সামাজিকগণ তাহাকে দেখিয়া নাটকীয় চরিত্রকে নিঃসন্দিগ্ধভাবে গ্রহণ করিতে পারে। নাটকীয় পরিবেশ রচনায় নাট্যকারকে অবহিত হইতে হইবে, এবং অস্বাভাবিক বিষয়বস্তু অবতারণা দ্বারা নাটকীয় চরিত্রকে অতিমাত্রায় আদর্শায়িত করাও বাঞ্ছনীয় হইবেনা। সর্ব্বোপরি মনে রাখিতে হইবে, নাটক ঘটনাত্মক, দ্বন্দ্বাত্মক—ভাবাত্মক নয়। কাজেই ঘটনা বিন্যাসের পরিপাটিতে চরিত্রটিকে দ্বন্দ্ব-সঙ্কুল চিন্তাবস্থার মধ্য দিয়া পরিবেশন করিতে হইবে। শুধু কোন মহাপুরুষের বা সাধারণ মানুষের জীবনের খণ্ডবিচ্ছিন্ন কাহিনী সংযোজনায় বড় জোর বহু-প্রাসঙ্গিক (episodic) নাটক হইতে পারে, কিন্তু উহাতে চরিতনাটক সার্থক হয় না। আধুনিক কালের কোন কোন চরিত-সাহিত্যে যেমন মহানুভব ব্যক্তির সুলভ মানবিক সংস্করণ উপস্থাপিত করা হয় তেমনই কোন কোন নাট্যকার বাস্তবতার ধুয়া তুলিয়া মহাপুরুষ চরিত্রকেও নিম্নস্তরে নামাইয়া আনেন।

আমরা মনে করি, মহৎ চরিত্র মহৎ হইলেও মানবীয় হইতে বাধা নাই—এবং সেই ভাবেই তাঁহার জীবনীকে নাট্যরূপ দিতে হইবে। অতিমাত্রায় বীরপূজার ভাব বা আত্মসচেতন বিদ্রূপাত্মক চরিত্র-চিত্র—উভয়ই অবাঞ্ছনীয়। প্রয়োজন হইলে, নাট্যকার কাল্পনিক বিষয় এমন সুসমঞ্জসভাবে অবতারণা করিবেন, যাহাতে মূল চরিত্রটী অধিকতর পরিস্ফুট হইতে পারে। ইংরেজী সাহিত্যে Housmar-এর '*Under Fire*' (ভিক্টোরিয়ার জীবন অবলম্বনে), Rudolf Besier (১৮৭৮-১৯৫১)-এর *The Barretts of Wimple Street* (ব্রাউনিং-দম্পতীর জীবন অবলম্বনে), David Scott Daniellএর *The Queen and Mr. Shakespeare* এবং বাংলায় বনফুলের শ্রীমধুসূদন ও বিদ্যাসাগর উল্লেখযোগ্য। 'শ্রীমধুসূদন' ট্র্যাজিডি—কিন্তু ইহার গঠনশিল্প অসংহত, ও নায়কের জীবনের ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতাই তাঁহার মৃত্যুকে অনিবার্য্যরূপে টানিয়া আনিয়াছে। নাটকটির মধ্যে মধুসূদনের জীবনের বিচিত্র-কথা থাকিলেও উহা যেন একবৃন্তধৃত রূপ লাভ করে নাই। গঠন-চাতুর্য্যের সংহতির দিক দিয়া 'বিদ্যাসাগর' অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরণের। শ্রীমধুসূদনের শেষদৃশ্য যেমন অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয়, বিদ্যাসাগরের শেষদৃশ্যও তেমন অসমঞ্জস ও যান্ত্রিক সৃষ্টি মাত্র।

উপন্যাস-নাটক

বাংলা সাহিত্যে নাটকের অত্যন্ত অভাব, এবং কেন, এই আলোচনা যথাস্থানে করা হইবে। আমাদের মনে হয়, ভাল নাটকের অভাবের জন্যই আমাদের রঙ্গমঞ্চে ও ছায়াচিত্রে বিখ্যাত উপন্যাস বা ছোটগল্প অবলম্বনে জনগণের রুচি অনুযায়ী পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন করিয়া প্রযোজকগণ উহাদিগকে নাট্যরূপ দান করেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, অনেক সময় গ্রন্থকারের অঙ্কিত আখ্যানভাগকে এমনভাবে রূপান্তরিত করা হয় যে, মূল ঔপন্যাসিকের উপরও আমাদের শ্রদ্ধাহীন করিয়া তোলা হয়। গণদাবী মিটাইতে গিয়া ঔপন্যাসিক লাঞ্ছিত হইয়া পড়েন, প্রযোজকশ্রেণী আত্মমহিমা কীর্ত্তনে বিভোর হইয়া পড়েন। ঔপন্যাসিক নিজে যখন তাহার উপন্যাসটিকে নাট্যরূপ দান করেন, তখন একটা কথা আমরা বুঝিতে পারি, এই দায়িত্ব সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই। ইংরেজী সাহিত্যে Arnold Bennett-এর *Buried*

Alive উপন্যাসখানাকে গ্রন্থকার *The Great Adventure* নামক সার্থক নাটকে রূপান্তরিত করিয়াছেন। বাংলায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ষোড়শী' ('দেনা পাওনা' উপন্যাস হইতে) 'বিজয়া' (দত্তা), বিরাজ বৌ, রমা (পল্লীসমাজ) 'বিন্দুর ছেলে'—উপন্যাস-অবলম্বিত নাটক। বলা বাহুল্য, ইহাদের মধ্যে 'ষোড়শী'ই নাটক হিসাবে উৎকৃষ্ট হইয়াছে। 'ষোড়শীর' ঘটনাবিন্যাস সুসংহত ও বাহুল্য বর্জিত হইয়া 'কাহিনী অপেক্ষাকৃত বেগবান ও নাটকোচিত হইয়াছে এবং জীবানন্দের চরিত্র সমধিক পরিস্ফুট হইয়াছে'*। তারাশঙ্করের 'দুই পুরুষ' 'কালিন্দী' 'বিংশ শতাব্দী'—ইহারাও তন্নামধেয় উপন্যাসের নাট্যরূপ। তারা-শঙ্করের উপন্যাস যে সমস্যা-সঙ্কুলতা ও বর্ণনাকুশলতা গুণে উল্লেখযোগ্য, নাটকে তাহা তাঁহার পক্ষে বিশেষ সহায় হয় নাই। তাঁহার নাটকগুলিতে ঘটনা-দ্রুতি বা চারিত্রিক দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হয় নাই বলিয়া নাট্যকার হিসাবে তারাশঙ্কর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। আসলকথা, ঔপন্যাসিক প্রতিভা সাধারণতঃ নাটকের পক্ষে উপযোগী বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ঔপন্যাসিক প্রতিভা যেরূপ ধীরমন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে থাকে, নাটকীয় প্রতিভার পক্ষে তেমনটি সমীচীন নহে। নাট্যকার ঘটনাবহুল জীবনকাহিনীকে দ্রুত পরিচালিত করেন। উপন্যাসের পাঠক নিজেও ধীরমন্থর, কিন্তু নাটকের দর্শক গতিশীল জীবনকে স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে চাহেন। উপন্যাসে কাহিনীর জটিলতা ও বিচিত্রতা অনেক সময় উপাদেয় হইলেও নাটকে নাট্যকারকে এমনভাবে বিষয়বস্তু ও চরিত্র-নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়, যাহাতে উহার মূলরস অব্যাহত থাকে। ঘটনাবহুল উপন্যাস মনস্তত্ত্বঘটিত উপন্যাস অপেক্ষা নাট্যাকারে পরিবেশিত হইবার পক্ষে অধিকতর উপযোগী। এইজন্য আমাদের মনে হয়, ***Buddenbrooks, Jean Christophe,*** অপরাজিত প্রভৃতি উপন্যাস নাটকীয় রূপায়নের দিক হইতে অনুপযোগী। বরং বঙ্কিমচন্দ্রের সুসংহত ঘটনা-প্রধান উপন্যাসগুলি নাটকে অধিকতর জমিয়া উঠিতে পারে। বিশেষতঃ, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসশিল্পেও নাটকীয়তার স্পর্শ আছে বলিয়াই ইহা আরও সম্ভব মনে হয়।

*ডাঃ সুবোধ সেনগুপ্ত : শরৎচন্দ্র

অতুলকৃষ্ণ মিত্র (১৮৫৭—১৯১২) বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইলের নাট্যরূপ দান করিয়াছিলেন। অমৃত লাল বসু তারকনাথ গাঙ্গুলীর 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসটিকে 'সরলা' নামে নাট্যরূপ দান করেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁহার 'রাজর্ষি' উপন্যাসখানা 'বিসর্জ্জন' নামে নাট্যরূপ দান করেন। নাটকে অপর্ণা, নয়নরায়, গুণবতী প্রভৃতি নূতন চরিত্র সৃষ্টি করা হইযাছে, 'রাজর্ষি'র হাসি ও তাতার কাহিনী পরিত্যক্ত হইযাছে (ফলে ঘটনাস্রোত লঘুতব হইয়াছে), ; নূতন চরিত্রগুলি নাটকের মূল ভাবের পরিপোষক হইযাছে ; কিন্তু 'রাজর্ষির' পরিণতি ও 'বিসর্জ্জনে'র পরিণতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। নাটকীয় দ্বন্দ্ব শেষ পর্য্যন্ত রঘুপতি, গোবিন্দমাণিক্য ও জয়সিংহের চরিত্রের ত্রিধারায় প্রবাহিত হইয়াছে, এবং রঘুপতির আকস্মিক পরিবর্ত্তন নাটকটীকে Melodrama করিয়া তুলিয়াছে। নাটকীয ভাষায় 'লিরিকের' বাড়াবাড়ি, লঘু ও হাস্যরসাত্মক দৃশ্য অবতারণার ব্যর্থতাও নাটকটীর বিশেষ দোষ। গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রটি উপন্যাসে যেমন উজ্জ্বল ছিল, নাটকে তেমন নাই। চরিত্রগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্র-সমালোচক Thompson বলেন, "The characters..are irresponsible waifs swayed by the strong wind of their creator's emotion, puppets in the grip of a fiercely-felt idea." এতদ্ব্যতীত, নাটকটীর প্রচার-ধর্ম্মী দৃষ্টি শিল্প-সৃষ্টিকে ব্যাহত করিয়াছে। 'রাজর্ষি' অপরিণত রবীন্দ্র-মানসের সৃষ্ট উপন্যাস, 'বিসর্জ্জন' নাটকাকারে অতি-নাটক মাত্র।

প্রাচীন গ্রীক নাট্য-সাহিত্যে সঙ্গীত-সমন্বিত নাটককেই *Melodrama* নামে অভিহিত করা হইত। কিন্তু অধুনা, যে-নাটকে কাল্পনিক বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করিযা চিত্তচমৎকারী, অস্বাভাবিক ঘটনা-বিন্যাসের সাহায্যে আকস্মিক ও লোমহর্ষণ পরিণতি দান করা হয়, তাহাকে আমরা অতি-নাটক (*Melodrama*) বলিয়া অভিহিত করি।

অতি-নাটক

বাংলা নাট্য-সাহিত্যে এই শ্রেণীব নাটকের প্রাচুর্য্য বিস্ময়কর। গিরিশ ঘোষের 'প্রফুল্ল' 'জনা' প্রভৃতি অধিকাংশ নাটক, দ্বিজেন্দ্রলালের 'শাজাহান' ও রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জ্জন' এই শ্রেণীভুক্ত।

আধুনিক যুগে সাঙ্কেতিক নাটক (*Symbolic Drama*) নামে এক প্রকার নূতন নাটকের সৃষ্টি হইয়াছে। আধুনিক যুগের মানুষের জীবন-সমস্যা প্রাচীনকালের যুগ-সমস্যা হইতে অনেক পরিমাণে পৃথক। আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার যুগ। আধুনিক মানব প্রত্যেক জিনিষকে তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়া লইতে চায়। জিজ্ঞাসাই তাহার মনের প্রধান প্রবৃত্তি। এইজন্য মানুষ ক্রমশঃই বহির্জগত হইতে নিজেকে ছিন্ন করিয়া নিজের অন্তরের দিকে মনোনিবেশ করিতেছে—আত্ম-বিশ্লেষণ ও আত্ম-পরীক্ষা দ্বারা মানুষ আত্ম-আবিষ্কার করিতে চাহিতেছে। "জীবনের এই অতীন্দ্রিয় রহস্য ও সাঙ্কিতিকতা সর্ব্বপ্রথম গীতকবিতাব ছন্দে বাঁধা পড়ে। কিন্তু এই লীলাময় বিকাশ যতই সুস্পষ্ট হইতেছে, যতই ইহা ব্যক্তিগত অনুভূতির সীমা ছাড়াইয়া সাধারণ পাঠকের চিত্ত স্পর্শ করিতেছে, বিশেষতঃ মানবমন যতই ইহার আনন্দময় ঘাত-প্রতিঘাত সম্বন্ধে একটা সাগ্রহ কৌতূহল অনুভব করিতেছে, ততই ইহা গীতিকবিতার রাজ্য অতিক্রম করিয়া নাটকের বিষয়ীভূত হইয়া উঠিতেছে। এইরূপ একটা সম্পূর্ণ নূতন রকমের নাট্যসাহিত্য আমাদের চোখের সম্মুখে সৃষ্ট হইতেছে।"* ইহাই সাঙ্কেতিক নাটক। সাঙ্কেতিক নাটক জীবনের তুচ্ছতম বিষয়বস্তুর কল্পনা-দীপ্ত সৌন্দর্য্য পরিবেশনে নিয়োজিত নহে। কল্পনার ব্যঞ্জনা সৃষ্টি অপেক্ষা কোন মানস-সত্য বা নৈতিক বা অনুভূত সত্যকে বিশেষ একটি অর্থ-সমন্বিত মহিমা দান করাই এই ধরণের নাটকের কাজ। Arthur Symons এই জাতীয় বিদ্রোহ-সূচনাকারী নাটক সম্বন্ধে বলেন—

সাঙ্কেতিক নাটক

It is an attempt to spiritualise literature, to evade the old bondage of exteriority....in this endeavour to disengage, the ultimate essence, the soul of whatever exists can be realised by the consciousness'. রোমাণ্টিক নাটকে জীবনের কোন নূতন

* ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অর্থ-ব্যঞ্জনার ইঙ্গিত থাকিতে পারে, কিন্তু সাঙ্কেতিক নাটকে জীবনের কোন বিশিষ্ট অনুভূতি সীমায়িত অর্থদ্যোতনায় মণ্ডিত হয়। এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, প্রতীক অভ্যন্তরীণ বা বহির্গত—দুই প্রকার সত্যেরই পরিচায়ক। জাতীয় পতাকা যেমন কোন জাতির গভীরতম আন্তরিক পিপাসার প্রতীক, তেমনি আবার ইহার বহির্গত প্রেরণাও সামান্য নয়। শতচ্ছিন্ন জাতীয় পতাকা সহস্র লোককে দেশমাতৃকার স্তুতিতে উদ্বুদ্ধ করে, অগণিত দেশসন্তানকে মহান্ আত্মত্যাগে প্রবুদ্ধ করিতে পারে। সুতরাং দেখা যায় যে, প্রতীক মানুষের জীবনের অন্তরতম বাসনার বহির্গত প্রকাশ। দেশ কাল জাতি হিসাবে ইহাদের বিচিত্র মূল্য থাকিতে পারে। আবার কোন কোন প্রতীক জাতীয়তা বা ব্যক্তি-অনুভূতির দিক হইতে শ্রেষ্ঠ মনে হইতে পারে। জাতীয় পতাকা জাতির সর্ব্বমানবের আশা-আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপনা সঞ্চার করিতে পারে, কিন্তু বিবাহের অঙ্গুরীয় বা প্রেমিক-প্রেমিকার ভালবাসার দান ব্যক্তিগত মূল্যের দিক দিয়া শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। ধর্ম্ম সর্ব্বজনগ্রাহ্য বলিয়া ইহার আকারে, রীতিতে ও নিয়ম-নিষ্ঠায় যে প্রতীকতা ব্যবহার হয়, তাহার অর্থ ব্যাপকতর। ক্রশ যেমন খ্রীষ্টানদের মনে যীশুর পরম আত্মত্যাগের ব্যঞ্জনা জাগায়, তেমনি ধানদূর্ব্বা আম্রপল্লব ও কদলীবৃক্ষ হিন্দুর মনে গভীর অর্থ-ব্যঞ্জনা সঞ্চার করে। সুতরাং সাঙ্কেতিক নাট্যকার এমনভাবে তাহার বিষয়বস্তু পরিবেশন করিবেন যে, তাহার প্রতীকতা যেন জীবনের বিশেষ অর্থদ্যোতনায় সর্ব্বজনগ্রাহ্য হইয়া উঠে। একথা অবশ্য সত্য যে, নাট্যকার তাঁহার বিশিষ্ট ভাবকল্পনা ও পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াই তাঁহার প্রতীকতা গ্রহণ করেন, কিন্তু 'If he diverges too widely from themes of universal interest and significance, if his own symbolism is too arbitrary and too individual, he runs the risk of becoming not merely unintelligible but unimportant'. অর্থাৎ প্রতীকতা অত্যন্ত ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত হইলে, উহা সর্ব্বজনীন আবেদনহীন, দুর্ব্বোধ্য বা অর্থহীন হইয়া পড়ে।

সাঙ্কেতিক নাটক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রঙ্গমঞ্চে জমিয়া উঠেনা, কারণ

-নাটকীয় দৃশ্যাবলীর সাহায্যে ও চরিত্রাবলীর রূপায়নে যদি নাট্যকারের ভাষার অতীত কথাটি এইখানে মূর্ত্ত না হয়, তবে নাটকই ব্যর্থ। এই ধরণের নাটকে জীবনের রূপায়ন অথবা দৃশ্যাবলী বা নাটকীয় চরিত্রের বিকাশই মুখ্য নয়,—নাটকীয় বিষয়বস্তুর ব্যঞ্জনাত্মক পরিবেশনই মুখ্য। এই শ্রেণীর নাটকের মধ্যে Maeterlinck-এর *The Blue Bird*, Edmond Rostand-এর *Chanticler*, Yeats-এর *The Countess Cathleen, The Land of Heart's Desire* এবং রবীন্দ্রনাথের অচলায়তন, ডাকঘর, রক্তকরবী প্রভৃতি বিখ্যাত নাটক। সাম্প্রতিককালে শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ চৌধুরী 'জয়হিন্দ বা সোনার স্বপন' নামক সাঙ্কেতিক নাটকটিতে 'পরিকল্পনাব মৌলিকতা ও রূপক ব্যঞ্জনার নৈপুণ্য' প্রদর্শন করিয়াছেন।

এই সকল নাটকের নাটকীয উপযোগিতা সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান, কারণ যাহা মনোজগতের ব্যাপাব তাহাকে বহির্জগতের ঘটনার (action) মধ্য দিয়া প্রকাশ করা খুব সহজ নহে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিরবয়ব ভাব-সত্তাকে নাট্যোপযোগী করিয়া পরিবেশন করা সুকঠিন। এইজন্য মানব-হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশই (*Theatre of the Soul*) ইহাদের উপযুক্ত রঙ্গমঞ্চ। পাদপ্রদীপের সম্মুখে ইহারা অনেক সময অভিনয়োপযোগী না হইলেও পাঠ্য-নাটক হিসাবে ইহাদের মূল্য সুনিশ্চিত। কিন্তু ইহাদের অন্তরাত্মা যদি সহজে সহৃদয়গণের অনুভূতিগম্য না হয়, তখন বুঝিতে হইবে, উহারা সাঙ্কেতিক নাটক হিসাবে ব্যর্থ হইয়াছে।

সমস্যা-মূলক নাটক

আধুনিক ইংরেজী নাট্য-শিল্পে Ibsen ও Bernard Shawএর কল্যাণে যুগান্তর আসিয়াছে। এলিজাবেথীয়, তথা Shakespeare-এর নাটকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া Ibsen-ই প্রথম বাস্তবমুখী নাটক লিখেন। তাঁহার অনুকরণে Bernard Shaw, Galsworthy প্রভৃতি যে-ধরণের বাস্তবতা-প্রধান নাটক লিখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে শিল্প-সঙ্গত সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি অপেক্ষা যুগচিত্তের ভাবনা-কামনা, সংস্কার ও সমস্যাই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। এই সকল নব্যপন্থী নাট্যকারগণ

নাটককে প্রাচীন নাট্যকারদের মত নিছক সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির বাহন রূপে গ্রহণ করিতে চাহেন না। তাঁহাদের মতে নাটক শুধু অবসরবিনোদন বা সৌন্দর্য্য-পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য নয়; ইহার উদ্দেশ্য যুগ-চিন্তা ও যুগ-সমস্যার সমাধান, লোকশিক্ষা দান ও জনমত গঠন। আধুনিক যুগে রাষ্ট্র-সমস্যা, বেকার-সমস্যা, জাতি-সমস্যা, ধর্ম্ম-সমস্যা, যৌন-সমস্যা, বিবাহ-সমস্যা প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার সমস্যা মানুষকে বিব্রত করিতেছে। নাট্যকারগণ কোন একটী সমস্যা অবলম্বন করিয়া কয়েকটী চরিত্র-সৃষ্টির সাহায্যে উহার সর্ব্বাঙ্গীণ আলোচনা রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত করেন। নাট্যকার তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রের মধ্য দিয়া স্বকীয় মতামত ব্যক্ত করেন—সেক্সপীয়রের মত নির্লিপ্ততা রক্ষা করিতে চাহেন না। এই সকল নাটকে plot বা ঘটনা-বিন্যাস এবং প্রশমন দৃশ্য (*Relief Scene*) অবতারণা, স্বগতোক্তি বা আত্ম-ভাষণের স্থান নাই। নাট্যকার শুধু সমস্যাটীকে নানাদিক হইতে নানাভাবে আলোচনা (*Discussion*) দ্বারা উহার যথোচিত মূল্য নিরূপণ করিতে চেষ্টা করেন। এই শ্রেণীর সমস্যা-প্রধান নাটককে ইংরেজিতে *Thesis Drama* অথবা *Drama of Ideas* নামে অভিহিত করা হয়। বলা বাহুল্য, পৃথিবীর কোন দেশের শ্রেষ্ঠ নাটকই সমস্যা-বিহীন হইতে পারে না। তবে, শ্রেষ্ঠ নাটকে নাট্যকার সমস্যাকে নাটকীয় শিল্প-সঙ্গত রূপ-সৃষ্টির অধীন করিয়া প্রদর্শন করেন। ইহাতে নাটকের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই মুখ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু প্রচার-মূলক নাটকে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির প্রশ্নটি গৌণ করিয়া নাট্যকার সমস্যাটীকেই উগ্রতর করিয়া তোলেন। নাটকে প্রচার-মূলক কিছু থাকিতে পারে না, এমন কথা আমরা বলি না। তবে, প্রচারই যেখানে মুখ্য, সেখানে নাটকীয় শিল্প-সৃষ্টি অক্ষুন্ন রহিয়াছে কিনা, ইহাই ভাবিবার বিষয়। কারণ, শ্রেষ্ঠ নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য 'purposeless purpose' অর্থাৎ উদ্দেশ্যকে গৌণ করিয়া সৌন্দর্য্য-বোধটী মুখ্যরূপে সামাজিকের মনে সঞ্চার করা। এই শ্রেণীর নাটকের মধ্যে Ibsen-এর *The Doll's House,* Bernard Shaw-এর *Man and Superman*, Galsworthy-র *The Mob, Justice* বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ', রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জ্জন' ও গিরিশ ঘোষের 'বলিদানে' প্রচারের উগ্রতা পরিলক্ষিত হয়।

নাটক ও উপন্যাস উভয়ই মানব-জীবনের প্রতিচ্ছবি, তবু শিল্প-রূপের দিক হইতে ইহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। নাটক দৃশ্য-কাব্য, উপন্যাস পাঠ্য-কাব্য। নাটকে প্রধান বস্তু ঘটনা-পারম্পর্য্য, উপন্যাসে ঘটনা-বিন্যাস; সাধারণতঃ, নাটক দ্রুতগতি, উপন্যাস ধীর-মন্থর। উপন্যাস আমরা পড়িয়া আনন্দ পাই, নাটক দেখিয়াও আনন্দ পাই। ঔপন্যাসিক পাঠকের কল্পনার উপর বেশি দাবী করেন না, সকল কথাই তিনি সাজাইয়া বলেন ও পাঠকের নিকট প্রত্যক্ষভাবে মূর্ত্ত করিয়া তোলেন। নাট্যকার দর্শকের কল্পনা-শক্তির উপর অধিকতর দাবী করেন। দৃশ্যপট যোজনায় নাটকের অনেক অকথিত বাণী মূর্ত্ত হইয়া উঠিলেও, দর্শক নিজের কল্পনা বলে তাহারও অনেক অধিক অনুমান করেন। এইজন্য বুঝিবার পক্ষে উপন্যাস যত সহজ, নাটক তত সহজ নয়। এতদ্ব্যতীত, নাটকীয় বিষয়বস্তু রক্তমাংসের নরনারীর কথাবার্ত্তায় ব্যক্ত হয় বলিযা ইহা উপন্যাসের বিষয়বস্তু অপেক্ষা অধিকতর জীবন্ত মনে হয়। ঔপন্যাসিকের আবেদন একজন মাত্র পাঠকের নিকট, নাট্যকারের আবেদন বহুর নিকট। এক খণ্ডহীন অবসর সময়ে একাসনে বসিয়া না দেখিলে নাটকের আনন্দ লাভ করা যায় না; কিন্তু উপন্যাস একাসনে বসিয়া আদ্যোপান্ত শেষ না করিলেও ক্ষতি হয় না। ঔপন্যাসিক অধিকাংশ স্থলে যাহা বর্ণনার সাহায্যে প্রকাশ করেন, নাট্যকার তাহাকে দৃশ্যপট-সংযোজনায় ও রঙ্গমঞ্চ-সজ্জার সাহায্যে রূপ দান করেন। ঔপন্যাসিক তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির উত্থানপতন ও পরিণতি সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে আলোচনা করিতে পারেন, কিন্তু নাট্যকারকে সুকঠিন নির্লিপ্ততা (Detachment) অবলম্বন করিতে হয়। ঔপন্যাসিক নিজের মন ও ব্যক্তিত্বের আলোকে তাঁহার কল্পিত নরনারীকে বিচার করেন, নাট্যকার প্রত্যেকটী চরিত্রের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দেন।

নাটক ও উপন্যাস

গল্পে, উপন্যাসে ও নাটকে অতি-প্রাকৃত সংস্থান শিল্প-সৌন্দর্য্যের পরিপোষকরূপে ব্যবহৃত হয়। নাট্যকার ঝড়-ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ বজ্রগর্ভ-মেঘ-প্রকম্পিত বিদ্যুৎ-শিহরিত দৃশ্য-পরিকল্পনায়, অথবা অভাবনীয় সময়ে অভাবনীয় ঘটনা-

সংস্থানের দ্বারা অতি-লৌকিক জগতের উপযোগী পটভূমি সৃষ্টি করেন। নাট্যোল্লিখিত নায়ক-নায়িকার মানসিক দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট করিবার জন্য, অথবা ট্র্যাজিডির বিষাদাত্মক ভাব-মণ্ডল সৃষ্টি করিবার জন্য এইরূপ অতি-প্রাকৃত (*Supernatural*) সমাবেশ প্রয়োজন হয়। অধিকাংশ স্থলে, যে-অদৃশ্য নিয়তিলীলা মানব-ভাগ্য পরিচালিত করিতেছে, তাহার ইঙ্গিত দান করিবার জন্যও নাট্যকার অতি-প্রাকৃতের সমাবেশ করেন।

নাটকে অতি-প্রাকৃত সংস্থান

Shakespeare-এর নাটকে এই অতি-প্রাকৃত দুইটি বিভিন্ন রূপে প্রদর্শিত হয়। অনেক সময় ইহা বাহ্যপ্রকৃতির বিক্ষোভ-পরিকল্পনায় চিত্রিত হয়। ইহার সহিত নায়ক-নায়িকার ব্যক্তিগত জীবনের কোন বিশেষ সম্পর্ক থাকে না, কারণ ইহা মানব-কল্পনার অধীন নহে। *Macbeth*-এ প্রথম দৃশ্যে ডাকিনীগণের ইঙ্গিতপূর্ণ কথাবার্ত্তা ও তরুলতাহীন বিস্তীর্ণ মৃত্যুময় প্রান্তর-পরিকল্পনা এবং মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে ঝড় ও মেঘগর্জ্জনের ইঙ্গিত বিষাদাত্মক নাটকের উপযোগী ভাবমণ্ডল সৃষ্টির সহায়ক। নাট্যকার এইরূপ দুর্ভেদ্য মসীকৃষ্ণ পটভূমি সৃষ্টি করিয়া মানব-ভাগ্যকে সেই প্রাকৃতিক পটভূমিকায় চিত্রিত করিয়া নাটকের সকরুণ ঘনান্ধকার গাঢ়তর ও তীব্রতর করিয়া তোলেন।

অতি-প্রাকৃত কখনো বিকৃত-মস্তিষ্ক, উন্মত্ত অথবা নিয়তি-নির্য্যাতিত নায়ক-নায়িকার উক্তি রূপে নাটকে রূপায়িত হয়। *Macbeth* নাটকে ছায়া-ছুরি (Phantom dagger) ম্যাকবেথেরই আত্ম-কৃত কর্ম্মের প্রতিফল রূপে দোদুল্যমান, *Julius Caesar* নাটকে Brutus-এর সম্মুখে Caesar-এর প্রেত-মূর্ত্তির আগমন একদিকে যেমন Brutus-এর আত্মকৃত কর্ম্মের প্রতিফল-ব্যঞ্জক, তেমনই আবার নবজন্ম-সন্ধানী প্রতিহিংসাপরায়ণ Caesar-এর বিজয়-সম্ভাবনার ইঙ্গিতরূপেও নাটকে পরিস্ফুট। *Julius Caesar*-এ Calpurnea-র স্বপ্নে যেমন অতি-প্রাকৃতের সাহায্যে অনাগত ঘটনার পূর্ব্বাভাস সৃষ্ট হইয়াছে, মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকেও তেমন তপস্বিনীর স্বপ্নে মানসিংহ এবং জগৎসিংহের মধ্যে যুদ্ধ-সম্ভাবনা, কৃষ্ণার স্বপ্নে তাহার আত্মহত্যার ইঙ্গিত এবং

অহল্যার স্বপ্নে কৃষ্ণার ভবিষ্যৎ স্পষ্টরূপে আভাষিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষেও 'কুন্দর' স্বপ্ন ভবিষ্যৎ-সূচনার সহায় হইয়াছে। *Hamlet* নাটকে নায়কের মৃত পিতার প্রেতাত্মা রীতিমত ব্যক্তি-নিরপেক্ষ (objective) সত্তা। Hamlet ব্যতীত Marcellus, Bernardo এবং Horatio-ও ইহা প্রত্যক্ষ করেন। এই নাটকে *Blood and thunder*-ট্র্যাজিডির প্রতিশোধ-পরায়ণ প্রেতাত্মা নবজন্মরূপে, সূক্ষ্মরূপে পরিকল্পিত হইয়া সমস্ত নাটকের অবিচ্ছেদ্য অংশ হইয়া পড়িয়াছে এবং পিতার মৃত্যু সম্বন্ধে নায়কেব সন্দেহকে ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে। কমেডিতে অতি-প্রাকৃত ভীতি-সঞ্চারক রূপে পরিবেশিত হয় না—*A Midsummer-Night's Dream*-এ অতি-প্রাকৃত-পরিবেশ যেন কাব্য-সৌন্দর্য্যের বিমুগ্ধ চিত্র ; *The Tempest*-এ আবার অতি-প্রাকৃত নর-চরিত্রের অধীন করিয়া পরিকল্পিত হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যায় যে, অতি-প্রাকৃত-সমাবেশের প্রধান উদ্দেশ্য নাটকীয় কথাবস্তুর সূচনা ও ব্যাখ্যা। নাটকীয় কলাকৌশলরূপে ইহা কখনো অনাগত কাহিনীর পূর্ব্বাভাষ জ্ঞাপন করে, আবার কখনো ঘটনাসমূহের যথাযথ ব্যাখ্যাদানে সমস্ত বিষয়টি দ্রষ্টার নয়ন-সম্মুখে প্রস্ফুট করিয়া তোলে। কিন্তু কোন নাটকে অতি-প্রাকৃতের সমাবেশ দেখিয়া উহাকে নাট্যকারের ব্যক্তিগত অভিমত বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। নাট্যকার যুগচিত্তের পরিচয় দিতে গিয়া অনেক সময় ইহার অবতারণা করিলেও ইহার কলা-কৌশলের সাহায্যে ট্র্যাজিডির করুণ রস ঘনতর হইয়া উঠে। কিন্তু করুণরসের এরূপ তীব্রতা আমাদিগকে বেদনা-বিধুর ও বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে না। বরং অতি-প্রাকৃত পরিবেশ দেখিযা আমরা শুধু ইহাই মনে করি যে, নাটকের জগৎ আমাদের বাস্তব জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। ইহাতেই অতি-প্রাকৃতের ভীতি-গাঢ়তা মন্দীভূত হয় এবং যাহা একদিকে ভীতি-সঞ্চার করে, তাহাই আবার ভীতি-নিরসন করিতে সমর্থ হয়। আবার, একদিকে ইহা যেমন মানব-ইচ্ছার বহির্ভূত নিয়তি সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন করে, অপরদিকে তেমন মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছার সত্তাকেও স্বীকার করিয়া লয়। *Schlegel* যাহাকে বলেন, '*Necessity without, freedom within*', অর্থাৎ অন্তরে স্বাধীন

ইচ্ছাসম্পন্ন হইলেও, মানুষ বাহিরের নিয়তি-নিয়মকে কিছুতেই ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না, এই দুইটী তত্ত্বই অতি-প্রাকৃতের সাহায্যে যুগপৎ আমাদের গোচর করা হয়। অদৃষ্টের সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে পরাভূত, আত্মবলে দৃপ্ত দুর্জ্জয় মানবাত্মা তখনই উপলব্ধি করে যে, সে একান্ত ভাবে দুর্ব্বল ও নিয়তি পরিচালিত হইলেও যে-মানবিক দুর্ব্বলতার উপর নির্ভর করিয়া সে জীবনযুদ্ধে শক্তির পরিচয় দেয়, উহাই তাহার গৌরব।

বিংশ শতাব্দীতে একাঙ্ক নাটকের প্রাদুর্ভাব বেশি হইলেও ইংরেজী সাহিত্যে ইহা সম্পূর্ণ নূতন নহে। পঞ্চদশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যে ও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে একাঙ্কিকার উল্লেখ আছে। পঞ্চাঙ্ক নাটক ও একাঙ্কিকার মধ্যে শুধু আকারগত নহে, শ্রেণীগত পার্থক্যও বর্ত্তমান। পঞ্চমাঙ্ক নাটকে এক বা বহু ঘটনার সমাবেশ থাকিতে পারে এবং স্থান হইতে স্থানান্তরে, দৃশ্য হইতে দৃশ্যান্তরে নাটকীয় বিষয়বস্তু বা কুশীলবগণের পরিবর্ত্তন ইহাদের মতে অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু একাঙ্কিকায় একটিমাত্র বিশেষ ঘটনা সংস্থানকে সংক্ষিপ্ত পরিধির মধ্যে একটী বিশেষ ভাব-সৃষ্টির সহায় রূপে পরিকল্পিত হয়। ছোটগল্প যেমন বর্দ্ধিতায়ন হইয়া উপন্যাসের স্তরে উপনীত হইতে পারে না, বা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণও যেমন ছোটগল্প নহে, একাঙ্কিকাও তেমন স্ফীত-কলেবর হইয়া পঞ্চমাঙ্ক নাটক হইবাব স্পর্দ্ধা করিতে পারে না, বা পঞ্চমাঙ্ক নাটকের সংক্ষিপ্ত সংস্করণও একাঙ্কিকা নহে। এই জাতীয় নাটকে সুদীর্ঘ কথাবার্ত্তা বা সুগভীর আত্ম-বিবৃতির অবসর নাই—স্বল্প সময়ে একটী সুনির্ব্বাচিত ঘটনার নাটকীয চরম পরিণতি (*Climax*) প্রদর্শন ইহার উদ্দেশ্য।

একাঙ্ক নাটক
(One-Act Drama)

ইহাতে একটী বিশেষ পরিবেশ (*Setting*) বা একটী ক্রম-প্রসারী অবিচ্ছিন্ন দৃশ্য, বা একটী মাত্র চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া নাটকীয় চরম পরিণতি লাভ করে এবং একটী বিশেষ ভাবানুভূতি (*Impression*) সৃষ্টিই ইহার লক্ষ্য। মাঝে মাঝে ঘটনা-প্রবাহের দ্রুত স্রোতে বিস্ময় ও কৌতূহল সঞ্চার করিয়া নাট্যকার চরিত্রের নাটকীয় গতি-বিধান করিবেন।

পঞ্চমাঙ্ক নাটকে নাটকীয় ঘটনাবলী আমাদের নয়ন সম্মুখে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয়। প্রথমাঙ্কে অনাগত কাহিনীর সূচনা বা অতীত ঘটনাবলী বর্ণনা দ্বারা নাট্যকার আমাদিগকে নাটকীয় ঘটনা-স্রোতের কেন্দ্রস্থলে লইয়া আসেন। কিন্তু একাঙ্কিকায় নাটকীয় চরম পরিণতির সামান্য পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে, বা তন্মুহূর্ত্তেই যবনিকা উত্থিত হয়। সুতরাং, যবনিকা উত্থিত হইবার পরই দ্রুত গতিতে ঘটনা-প্রবাহ বিস্তার লাভ করে।

একাঙ্ক নাটকের প্রারম্ভে ঘটনাপুঞ্জ শান্ত বা বিক্ষুব্ধ, উভয়ই হইতে পারে। কিন্তু প্রথম অঙ্কেই সামাজিকগণ যেন বুঝিতে পারেন যে, কী যেন সহসা বিস্ফুরিত হইয়া নাটকের পরিণতি অবশ্যম্ভাবী করিয়া দিবে। প্রথম অঙ্কেই নাট্যোল্লিখিত চরিত্রাবলী ও তাহাদের পারস্পরিক যোগ-সূত্র সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা বাঞ্ছনীয়, এবং ক্রমে বিস্ময় ও কৌতূহল সঞ্চারের মধ্য দিয়া নাটকীয় ঘটনা-বিন্যাস চলিতে থাকিবে।

ঘটনাপুঞ্জ এমনভাবে বিন্যস্ত হইবে যে, নাটকীয় পরিবেশটী যেন বিদ্যুৎ-গর্ভ মেঘের ন্যায় আসন্ন বিপদ-সম্ভাবনায় কম্পমান হয়। যবনিকা উত্তোলনের পরেই পূর্ব্ব-ইতিহাস-বিবৃতি (*Exposition*) রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত হয়। তৎপর নায়কের চরিত্রের ভিতর-বাহিরের দ্বন্দ্ব-চিত্রটী ক্রমেই সুপরিস্ফুট হইতে থাকে এবং ঘটনাপুঞ্জ ক্রম-পরিণতির দিকে (*Growth*) অগ্রসর হয়। অন্যান্য ক্ষীণ দ্বন্দ্ব-স্রোত ইহার সহিত সংযুক্ত হইয়া নাটকীয় ঘটনা-স্রোতকে পরিপুষ্ট করিয়া তোলে। দৈব, নিয়তি বা আকস্মিক ঘটনা যথা প্রয়োজনে নাটকে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে। এইভাবে নাটকীয় ঘটনাজাল ক্রমেই ঘনসন্নিবিষ্ট হইতে থাকে এবং সর্ব্বশেষ চরম শিখরে (*Climax*) উপনীত হয়।

নাটকীয় পরিণতি সন্তোষজনক বা শুভ হইলে তাহাকে **কমেডি** এবং দুঃখজনক হইলে **ট্র্যাজিডি** বলা হয়। কিন্তু নাটকের চরম মুহূর্ত্তের পূর্ব্বে আখ্যান বস্তু সম্যকরূপে কমেডি বা ট্র্যাজিডি রূপে পরিস্ফুট হয় না। কখনো বা নাটকীয় চরম পরিণতি এবং আখ্যান-গ্রন্থি-মোচন (*Resolution*) একই সঙ্গে চলিতে থাকে।

একাঙ্ক নাটকে দুই বা ততোধিক চরিত্র থাকিলেও একটী বিশেষ চরিত্রের

বিকাশই উহার মুখ্য অভিপ্রায় বলিয়া পরিগণিত হয়। স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট বিভিন্ন চরিত্রগুলি পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া নাটকীয় চরম পরিণতিকে সম্ভাব্য করিয়া তোলে। জীবন ও নাটকীয় ঘটনাপুঞ্জের সম্বন্ধে কুশীলবগণের বিভিন্ন ধারণা বা কথাবার্তাই নাটকীয় বৈচিত্র্য সম্পাদন করে। চরিত্র-সৃষ্টির মূলে যাহাতে ভাব-সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়, সে বিষয়ে নাট্যকারকে অবহিত হইবে।

মনে রাখিতে হইবে যে, একাঙ্ক নাটকে, আখ্যানভাগ কখনো চরিত্র, কখনো কোন একটি ভাবকল্পনা, কখনো বা পরিবেশ-সৃষ্টি বা হাস্যরসাত্মক সংস্থান—ইহাদের যে-কোন একটী অবলম্বনে নাটকীয় রসঘনতা সৃষ্টি হইতে পারে। Joe Corrieর *Hewers of Coal* নাটকটিতে আখ্যানভাগ-গ্রন্থনে প্রশংসনীয় নাটকীয় বেগ সঞ্চার করা হইয়াছে এবং চরিত্র-সৃষ্টির বৈচিত্র্যও নাটকটির অন্যতম আকর্ষণ। Norman Mckinnelএর *The Bishop's Candlesticks* একটি চরিত্র-প্রধান নাটক। ইহাতে Persome এবং Sergeant of Gendarmesএর চরিত্র প্রধান চরিত্রটি পরিস্ফুটনে সহায়তা করিয়াছে। ধর্ম্মযাজকের (Bishop) উদারতা, মানবতা-বোধ, অসামান্য ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্যই তাহাকে মহনীয় করিয়া তুলিয়াছে, তাই তাহার দৃষ্টিতে অপরাধী পর্য্যন্ত পশুত্বের স্তর হইতে মানবত্বের মহিমায় মণ্ডিত হইয়া দেখা দিয়াছে। Oliver Conwayর *Becky Sharp*, Galsworthyর *The Little Man*, David Scott Daniellএর *The Queen and Mr. Shakespeare*, Housmanএর *Under Fire*, Maurice Baringএর *The Rehearsal* এবং মন্মথ রায়ের 'বিদ্যুৎপর্ণা' প্রধানতঃ চরিত্র-প্রধান নাটক। W. W. Jacobsএর *The Monkey's Paw* নাটকটিতে Sergent Majorএর চরিত্রটির মাধ্যমে অতিলৌকিক পরিবেশ-শিহরণ নিপুণতার সহিত সৃষ্ট হইয়াছে। গঠন-শিল্পের কুশলতায় Lady Gregoryর *The Rising of the Moon* উৎকৃষ্ট হইয়াছে—ইহাও চরিত্র-প্রধান নাটক। কখনো বা নাট্যকার বিশুদ্ধ একটি হাস্যরসাত্মক সংস্থান সৃষ্টিতে কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন। তখন ইহাতে সামাজিক বা চরিত্রগত কোন অসঙ্গতি মৃদু বিদ্রূপ-লাঞ্ছিত হাস্যোজ্জ্বল রূপ ধারণ করে। এই প্রসঙ্গে

Milneর *The Boy Comes Home* উল্লেখযোগ্য। পরিবেশ-কল্পনায়, আখ্যানভাগ পরিচালনায়, চরিত্র-সৃষ্টিতে এবং সর্ব্বোপরি জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে ভাব-কল্পনার সর্ব্বজয়ী সমাপ্তিতে Syngeএর *The Riders to the Sea* বর্ত্তমান যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি। Lady Gregoryর *The Gaol Gate* নাটকটিতেও Syngeএর নাটিকার অনুরূপ নিয়তি-সচেতনতা দৃষ্ট হয়।

ইহাতেই উপলব্ধি হইবে যে, একাঙ্ক নাটকের বৈচিত্র্য সত্যই বিস্ময়কর। এই জন্যই Herman Ould বলেন—

'It may be neat, compact and rigid ; but it may also be wayward, expansive and flexible. So long as it does not conflict with the fundamental principles of drama, it may venture into a hundred different directions and exploit almost as many themes as the ingenuity and inventiveness of the author can suggest "

ইংরেজী সাহিত্যে Morality, Miracle, Mystery প্রভৃতি নাটকে একাঙ্ক নাটকের বাহ্য লক্ষণ থাকিলেও উহারা আধুনিক একাঙ্কিকার সগোত্র নয়। বিংশ শতাব্দীতেই ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যে একাঙ্কিকার প্রসার লাভ করিয়াছে। ইহার কারণও বোধ হয়, আধুনিক যুগ গতির যুগ। এই যুগে জীবনকে পূর্ণবৃত্ত করিয়া দেখিবার ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য যেমন মানুষের নাই, তেমন আবার পঞ্চাঙ্ক নাটক দেখিবার জন্য সুদীর্ঘ কাল ক্ষেপণও তাহার পক্ষে সব সময় সম্ভবপর নহে। সুতরাং পঞ্চাঙ্ক নাটকের স্থান ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে, এবং একাঙ্ক নাটকই আধুনিক যুগ-মানসের নাট্য-রস-পিপাসা মিটাইতেছে। জীবনের খণ্ডাংশ বা সামান্য ক্ষুদ্র সংঘাতময় ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া যে একাঙ্ক নাটক রচনা হয়, তাহাই এই যুগের উপযোগী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মনে হয়, একাঙ্কিকার ভবিষ্যৎ অসামান্য। ইংরেজী সাহিত্যে যে কয়েকজন একাঙ্ক নাটকে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তন্মধ্যে Synge (*The Riders to the Sea*), Lady Gregory (*The Gaol Gate*), Bennett (*The Stepmother*), Galsworthy (*The Little Man*), Ferguson (*Cambell of Kilmhor*) Drinkwater (*X=O*), Maurice

বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্যে একাঙ্কিকা

Baring (*The Rehearsal*), Olive Conway (*Becky Sharp*), Clifford Bax (*The Poetasters of Ispahan*) Herman Ould (*The Discovery*) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। প্রধানতঃ ইংরেজী সাহিত্যের অনুকরণেই বাংলায়ও সাম্প্রতিককালে একাঙ্কিকা লিখিত হইতেছে। গিরিশচন্দ্র 'বৃষকেতু', 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নামে যে দুইটি নাটক লিখিয়াছিলেন, তাহাদের নাটকীয় কলাকৌশল অত্যন্ত সাধারণ। বাংলা সাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত মন্মথ রায়ই একাঙ্কিকা রচনায় প্রশংসনীয় শিল্প-চাতুর্য্য দেখাইয়াছেন। তাহার একাঙ্কিকাগুলির মধ্যে 'বিদ্যুৎপর্ণা' ঘটনা ও পরিবেশ-সৃষ্টিতে, সংলাপ-কুশলতায় ও চরিত্র-অঙ্কনে সত্যই অনবদ্য হইয়াছে।

প্রবোধ মজুমদারের শুভযাত্রা একখানা উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক নাটক; অধ্যাপক সুধাংশুর স্ত্রী মৃণালিনী প্রথম সন্তান জন্মের পর পাগল হইয়া যায়। তাই তাহার মা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন দ্বিতীয়বার নমিতার সঙ্গে তাহার বিবাহের আয়োজন করেন। বিবাহের দিনেও মৃণালিনী উন্মত্ত প্রলাপ বকিতেছিল। সহসা সে সুস্থ হইয়া ওঠে এবং সুধাংশুর সঙ্গে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে কথা বলিতে থাকে। ইহাতে বিবাহ পণ্ড হইতে পারে দেখিয়া গৃহচিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া হয়। তিনিও বলেন, মৃণালিনী আবার পাগল হইতে পারে, কাজেই বিবাহ বন্ধ করা উচিত হইবে না। সুধাংশুর জীবনের এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে নাটকীয় চরম অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। ইহার পর মৃণালিনী নিজেই সুধাংশুর বিবাহে মত দিয়া বলিয়াছে, 'ভগবান আমার সব সাধ আহ্লাদ কেড়ে নিয়েছেন, কিন্তু আমার জন্য তুমি কেন চিরজীবন কষ্ট পাবে'?—বলিয়াই, সুধাংশুর কোলের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। ক্ষণপরেই বাড়ীর নীচের তলায় চাপা উলুধ্বনি সহকারে সুধাংশুর 'শুভযাত্রা' সুসম্পন্ন হয়।

বিষয়বস্তু পরিবেশনে, চরিত্রাঙ্কনে, সংলাপ-সৃষ্টিতে, নাটকীয় চরমোৎকর্ষ সৃষ্টিতে এবং সর্ব্বশেষ, সকরুণ বিস্ময়-রস সৃষ্টিতে নাট্যকার প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কিন্তু সুধাংশুর জীবনের দ্বিতীয় 'শুভযাত্রা' নাটকটীকে করুণ

রসাত্মক সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছে। নাট্যকারের পরিহাস-রসই (Sense of Irony) ইহাতে শেষ পর্য্যন্ত জয়যুক্ত হইয়াছে।

বনফুলের 'দশভাণ' একাঙ্কিকা মনে হইলেও ইহার 'ভাণ'গুলি বিশুদ্ধ একাঙ্কিকা হয় নাই—ইহাদের মধ্যে সংলাপের চমৎকারিত্ব ও চারুত্ব থাকিলেও নাটকীয় ঘটনা-সংস্থান পরিস্ফুট হয় নাই। 'অন্তরীক্ষে' নামক ভাণটিতে লেখক বিরাট মহাশূন্যে পরলোকগত শ্রেষ্ঠ কবি মনীষীদিগকে সম্মিলিত করাইয়া হিংসায় উন্মত্ত পৃথীতে শান্তি স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছেন। কবি ও সাহিত্যিকগণ সর্ব্বশেষে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া তাহাকে সভাপতিত্বে বরণ করেন। ইহাই নাটকের উপজীব্য। ভাণের বিষয়বস্তু পরিবেশনে ও রবীন্দ্র-স্তুতিতে নাটকীয় অবশ্যম্ভাবিতার সুর নাই—তবে, ইহার রসিকতাটুকু উপভোগ্য। 'জল' নামক ভাণটি রূপক (Symbolic) নাটক। ইহাতে হাইড্রোজেন-অক্সিজেনের ব্যাপারটির মধ্য দিয়া হিন্দু-মুসলমানের বিরাট সমস্যাটির অবতারণা করা হইয়াছে। 'শিককাবাব' নাটকটি নারীমাংসলোলুপ জমিদারের চরিত্রচিত্র একদিকে যেমন বীভৎস রসের সৃষ্টি করিয়াছে, তেমনি আবার লাঞ্ছিত নারীর আত্মসম্মান রক্ষার জন্য সংগ্রামের চিত্রটিকে সকরুণভাবে উপস্থাপিত করিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত, আর যাঁহারা একাঙ্ক নাটক লিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শিবরাম চক্রবর্ত্তী (চাকার তলে), শ্রীঅচিন্ত্য সেনগুপ্ত (নতুন তারা) প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, বাংলা অধিকাংশ একাঙ্কিকাই সংলাপাত্মক —ঘটনাত্মক নহে। শুধু কথোপকথনই নাটক হইতে পারে না, এই সহজ সত্যটি একাঙ্কিকা রচয়িতাদের ভুলিলে চলিবে না। তাঁহাদের মনে রাখিতে হইবে যে, একাঙ্কিকায় জীবনের কোন 'Significant event or idea'-র বিশ্লেষণ বা বর্ণনা নয়, বিচার বা বিনির্ণয় নয়, উহাকে ঘটনাত্মক দৃশ্যকাব্য-রূপে রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শনই একাঙ্কিকার উদ্দেশ্য।

ছোটগল্প ও একাঙ্ক নাটকের মধ্যে কতকটা সাদৃশ্য আছে। উভয়ের মধ্যে জীবনের খণ্ডাংশ প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। কিন্তু একাঙ্কিকা নাটক বলিয়া

উহা দৃশ্য-কাব্য এবং গল্প বর্ণনাত্মক রচনা। দৃশ্যকাব্য বলিয়া একাঙ্কিকার আবেদন প্রত্যক্ষ, ছোটগল্পের আবেদন ক্রমপ্রসারী ও মন্থর। একাঙ্কিকা সংলাপের সাহায্যে চরিত্রাঙ্কনের সাহায্য করে ও নাটকীয়তা সৃষ্টি করে, ছোটগল্পে বর্ণনাই প্রধান এবং মাঝে মাঝে সংলাপ সৃষ্টি দ্বারা উহার নাটকীয়তা গুণ রক্ষা করা হয়। এইজন্যই দেখা যায়, ছোটগল্পেরও সংলাপ-অংশটি পাঠকের অনেক সময় বেশী ভাল লাগে। একাঙ্কিকার গতি দ্রুততর, ছোটগল্পের অপেক্ষাকৃত মন্থর। একাঙ্কিকা নাটক বলিয়া ইহা যত নৈর্ব্যক্তিক, ইহার সাফল্য তত বেশী; ছোটগল্পে লেখক প্রসঙ্গক্রমে ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা সহজেই ব্যবহার করিতে পারেন। এবং ইহার ফলে গল্পটি অধিকাংশ সময় গীতিধর্মী হইয়া উঠিতে পারে। কোন ছোটগল্পকে কাটিয়া ছাটিয়া একাঙ্কিকায় পরিণত করিলে ইহা আকারে ক্ষুদ্রতর হইবার সম্ভাবনাই বেশী—এই হিসাবে একাঙ্কিকা ছোটগল্প অপেক্ষা আরও সংক্ষিপ্ত রসঘন সাহিত্য-শিল্প। Thomas Hardy-র *The Three Strangers* গল্পটির সহিত ইহার একাঙ্কিকা রূপ, *The Three Wayfarers* অথবা যোগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'জীবনে মরণে'র (রবীন্দ্রনাথের 'দালিয়া' গল্পের নাট্যরূপ) সহিত মূল গল্পটির তুলনা করিলেই আমাদের বক্তব্য-বিষয় অনুধাবন করা সহজ হইবে।

ছোটগল্প ও একাঙ্কিকা

আধুনিককালে যাহাকে আমরা নাটক বলি, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তাহা ছিল না। যাত্রা, কথকতা, টপ্পা, খেউড়, হাফ আখড়াই, মঙ্গলকাব্য, কবিগান প্রভৃতিই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রধান সম্বল। তবে সে কালেও যাত্রার ধরন-ধারণে কৃষ্ণলীলা, শিব বা শক্তি মাহাত্ম্য, রামায়ণকথা প্রভৃতি পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে মাঝে মাঝে নাট্যগীত রচিত হইত।

বাংলা নাট্য সাহিত্য

যাত্রা নামক Morality Play হইতে নাটকের সৃষ্টি হয় নাই, ইহা নিশ্চিত। অবশ্য যাত্রার মধ্যে এমন উপকরণ ছিল, যাহাকে ইচ্ছা করিলে নাটকে পরিণত করা যাইত। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজী নাটকের আদর্শে বাংলা নাটকের সৃষ্টি হয়। প্রথম যুগের বাংলা নাটকে সংস্কৃত প্রভাব যথেষ্ট ছিল এবং

নাট্যকারগণ সাধারণতঃ বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক বিষয় অবলম্বনে নাটক রচনা করিতেন।

যতদূর জানা যায়, General Assemblyর গণিত-শিক্ষক তারাচাঁদ শিকদার প্রণীত 'ভদ্রার্জ্জুন' (১৮৫২) নাটকই ইংরেজী আদর্শের রচিত প্রথম বাংলা কমেডি। কেহ কেহ মনে করেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্ত্তিবিলাস নাটক'ই (১৮৫২) বাংলায় প্রথম বিয়োগান্ত নাটক। ১৮৫৩ সালে হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' প্রকাশিত হয়। ইহাতে সেক্সপীয়রের *The Merchant of Venice*-এর সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ইহার ভাষা সরল হইলেও ইহা নাটকোপযোগী নয়। চরিত্র সৃষ্টিতেও লেখক দক্ষতার পরিচয় দেন নাই। হরচন্দ্র ঘোষ (১৮১৭-৪৪) 'কৌরব বিয়োগ' (১৮৫৮), 'চারুমুখ চিত্তহারা' (১৮৬৪) 'রজতগিরিনন্দিনী' (১৮৭০) প্রভৃতি নাটকও লিখেন। ইহার পর রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' (১৮৫৪) প্রকাশিত হয়। ইহাতে সংস্কৃত ও ইংরেজী উভয় ধরণ লক্ষিত হইলেও, ইহার আখ্যানবস্তু অসংযত ও বৈচিত্র্যহীন; নাটকীয় চরিত্রগুলির মানসিক দ্বন্দ্ব অপরিস্ফুট এবং প্রায় সমগ্র নাটকটী লেখকের মতামতে ভারাক্রান্ত। ডাঃ সুশীলকুমার দে বলেন যে, 'নাটকটী একটি সামান্য কৃত্রিম মূল সূত্রের উপর গ্রথিত সংলগ্ন বা অসংলগ্ন দৃশ্যের সমষ্টি মাত্র'*। তবু ইহাই বাংলা ভাষায় প্রথম সামাজিক নাটক। এই লেখক 'বেণী-সংহার' (১৮৫৫), 'রত্নাবলী' (১৮৫৮), 'নবনাটক' (১৮৬৬) প্রভৃতি অনেকগুলি নাটক লিখেন। রামনারায়ণের প্রভাবে তারকচন্দ্র চূড়ামণি ১৮৫৭ সালে 'সপত্নী নাটক' নামে বহুবিবাহমূলক একখানা নাটক লিখেন। ইহা ভাষার কৃত্রিমতা, কথোপকথনের অস্বাভাবিকতা, চরিত্রের বহুলতা ও শোকাবহ ঘটনার আতিশয্যে পীড়িত। এই সময়ে শ্যামাচরণ দত্ত নামে জনৈক ভদ্রলোক 'অনুতাপিনী নবকামিনী' (১৮৫৬) নামে Rowe-র *Fair Penitent*-এর অনুবাদ প্রকাশ করেন। খুন, ব্যভিচার, আত্মহত্যা প্রভৃতি লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটনে ইহা এলিজাবেথীয় *'Blood and Thunder'* ট্র্যাজিডির সগোত্র।

* প্রাচীন বাংলা নাটক ও তাহার অভিনয় (প্রবন্ধ)

রামনারায়ণের পর মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) ও দীনবন্ধু মিত্র বাংলা নাটকে যুগান্তর আনয়ন করেন। মধুসূদন প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের রীতিপদ্ধতির শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া ইংরেজীর অনুকরণে নাটক লিখেন। তাঁহার 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক' (১৮৫৮) তৎকালীন রঙ্গমঞ্চে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। তাঁহার 'পদ্মাবতী নাটকে গ্রীক প্রভাব সুস্পষ্ট। এই নাটকেই তিনি প্রথম অমিত্র ছন্দ ব্যবহার করেন। ইহার পর 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' (১৮৬০) প্রকাশিত হয়। ইহাতে ইংরেজী রোমাণ্টিক নাটকের অনুকরণে বিয়োগবিধুরা নায়িকা (Tragic Heroine), খল-চরিত্র (Villain), প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বী (Rival Claimants), নাটকীয় প্রশমন (Comic Relief) প্রভৃতি আছে। ঘটনাবৈচিত্র্য না থাকিলেও ইহাতে চরিত্র-সৃষ্টি প্রশংসনীয়। এতদ্ব্যতীত, তিনি 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিকেব ঘাড়ে রোঁ' প্রভৃতি বিদ্রূপাত্মক সামাজিক প্রহসন লিখেন।

মধুসূদনের পর দীনবন্ধু মিত্রের (১৮২৯-৭৩) 'নীলদর্পণ' নাটকে বাস্তবতার সুর গভীরতর হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৫) আবও উন্নত ধরণের নাটক। কিন্তু 'লীলাবতী' (১৮৭৬) নাটকে দীনবন্ধু যে অপূর্ব্ব রচনাশক্তি অন্তর্দ্দৃষ্টি, ঘটনা-বিন্যাস-নিপুণতা, চরিত্রাঙ্কন-দক্ষতা ও হাস্যরস-সৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে বাংলা নাট্যসাহিত্যে তাঁহার স্থান নির্দ্দেশিত হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, তিনি 'বিয়ে পাগল বুড়ো', 'জামাই বারিক', 'সধবার একাদশী' প্রভৃতি প্রহসনও লিখিয়াছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪৮-১৯২৫), 'সরোজিনী', 'অশ্রুমতী', 'কিঞ্চিৎ জলযোগ', মনোমোহন বসুর (১৮৩১-১৯১২) 'সতী নাটক' (১৮৭৩) এবং 'হরিশ্চন্দ্র' (১৮৭৪) ও তৎকালে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। জনপ্রিয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৩-১৯১১) একাধারে স্রষ্টা ও বিখ্যাত অভিনেতা ছিলেন। তাঁহার পৌরাণিক নাটক 'জনা', 'বুদ্ধদেব'; ঐতিহাসিক নাটক 'কালাপাহাড়'; সামাজিক নাটক 'বলিদান', 'প্রফুল্ল'; এবং গীতিনাট্য 'আবু হোসেন' উল্লেখযোগ্য। তাঁহার স্বল্পসংখ্যক যে কয়েকখানা নাটক জনসমাজে পরিচিত উহাদেরও অধিকাংশ উৎকৃষ্ট নাটক পদবাচ্য নয়। উহারা যেন একধরণের সহজ আন্তরিকতা-সুলভ ভাবোচ্ছ্বাসময় তৎকালীন রুচির

পরিপোষক ভাববাহন মাত্র। ঘটনার অত্যধিক বাহুল্য, চরিত্রাবলীর অবাস্তবতা, ট্র্যাজিডিতে অযথা হত্যা, আত্মহত্যা বা মৃত্যুর আধিক্য তাঁহার নাটকগুলিকে অতি-নাটকীয় করিয়া তুলিয়াছে। 'প্রফুল্ল' 'জনা' প্রভৃতি নাটক পড়িলে মনে হয়, তিনি বোধ হয় মনে করিতেন, যাহা দুঃখময় (tragic) তাহাই ট্র্যাজিডি। তাই বেদনা-দগ্ধ নায়কের জীবনযুদ্ধে তাহার দুর্ব্বলতার বিস্ময়কর মহিমা তাঁহার নাটকে পরিস্ফুট হয় নাই—নাটক যেন চোখের জলে ভাসিয়া গিয়াছে। তাঁহার নাটকের ভাষায়ও তেমন কোন বিদগ্ধজনোচিত শিল্প-চাতুর্য্য নাই। সর্ব্বোপরি, গিরিশচন্দ্রের নাটকীয় নির্লিপ্ততা ছিল না। অনেকে গিরিশচন্দ্রকে বাঙ্গালার সেক্সপীয়র বলেন, কিন্তু তিনি সেক্সপীয়রের সুদূরপ্রসারী দিব্য-দৃষ্টি ও অলৌকিক প্রতিভার মোটেই অধিকারী ছিলেন না।

দ্বিজেন্দ্রলালের (১৮৬৩—১৯১৩) ঐতিহাসিক নাটকেব মধ্যে 'চন্দ্রগুপ্ত' 'নূরজাহান' ও 'শাজাহান' শ্রেষ্ঠ। 'চন্দ্রগুপ্ত' ও 'শাজাহান' নাটকে আখ্যানভাগ পরিচালনায় ও কোন কোন চরিত্র-সৃষ্টিতে সেক্সপীয়রের প্রভাব লক্ষিত হইলেও উহাতে কাহিনী-বিন্যাস সুবিন্যস্ত হয় নাই এবং নাট্যকার যেন ভাবকেন্দ্র ও কেন্দ্রিক চরিত্র হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। চরিত্র-প্রধান ট্র্যাজিডি হিসাবে 'নূরজাহান' অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষের দাবী করিতে পারে। 'কল্কিঅবতার', 'ত্র্যহস্পর্শ', 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রভৃতি কয়েকটী প্রহসনে দ্বিজেন্দ্রলাল রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের উপর বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার সামাজিক নাটকের মধ্যে 'পরপারে' ও 'বঙ্গনারী' বিখ্যাত। মানবজীবনের দ্বন্দ্ব-বহুল কাহিনী, জীবনের দুঃখদৈন্য ও ঘাতপ্রতিঘাত তাঁহার নাটকে অপরূপ হইয়া ফুটিয়াছে। কিন্তু তাঁহার ভাষা অলঙ্কার-বহুল, বক্তৃতাত্মক, সংযমহীন ও অতিমাত্রায় গীতিপ্রবণ। 'দ্বিজেন্দ্রলাল শিক্ষিতম্মন্য, মার্জ্জিতরুচি, রঙ্গমঞ্চবিলাসী বাঙ্গালী-সমাজের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হইয়া আছেন।'

দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িকদের মধ্যে অমৃতলাল বসু (১৮৫৩—১৯২৯), ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬১—১৯২৭) ও রবীন্দ্রনাথ উল্লেখযোগ্য।

ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটক 'আলমগীর', 'প্রতাপাদিত্য', পৌরাণিক নাটক 'সাবিত্রী', 'ভীষ্ম', 'নর-নারায়ণ' প্রভৃতি বিশেষ পরিচিত। কল্পনার প্রখরতা, ভাষার ওজস্বিতা ও রুচির শালীনতা তাঁহার নাটকের বিশিষ্ট গুণ। অমৃতলাল বসু 'বিবাহ-বিভ্রাট', 'বাবু', 'খাস-দখল', 'চাটুজ্যে-বাড়ুজ্যে' প্রভৃতি হাস্যরসাত্মক নাটকে জীবনের লঘু-আনন্দের দিকটি পরিবেশন করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১—১৯৪১) মূলতঃ কবি এবং তাঁহার অধিকাংশ নাটকে নাটকীয় গুণ অপেক্ষা 'লিরিকের' প্রাধান্যই বেশী। পাঠ্য নাটক হিসাবে ইহাদের মূল্য সুনিশ্চিত। 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জ্জন', 'চিরকুমার সভা' প্রভৃতি তাঁহার বিখ্যাত নাটক। 'রক্তকরবী', 'অচলায়তন', 'ডাকঘর', 'ফাল্গুনী' প্রভৃতি সাঙ্কেতিক নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথ অসামান্য মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন।

রবীন্দ্রোত্তর যুগে নাটক লেখার কাজটা গ্রন্থকারের হাত হইতে ক্রমশঃ পেশাদার থিয়েটারের ম্যানেজার বা অভিনেতার হাতে চলিয়া যাইতেছে। ফলে, তাঁহারাই একাধারে নাট্যকার ও অভিনেতা। বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত উপন্যাসগুলিকে নাট্যরূপ দান করিয়া থিয়েটার বা সিনেমার ম্যানেজারগণ দর্শকের মনস্তুষ্টি করিতেছেন। এই যুগের নাটকের মধ্যে শিশির ভাদুড়ী ও জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'রীতিমত নাটক'; নিশিকান্ত বসুর 'দেবলাদেবী', 'পথের শেষে'; বরদা প্রসন্ন দাশগুপ্তের 'মিশর কুমারী'; মন্মথ রায়ের 'চাঁদসদাগর'; যোগেশ চৌধুরীর 'সীতা'; রবীন্দ্র মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল'; শচীন সেনের 'গৈরিক পতাকা' ও বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের 'মাটির ঘর', প্রমথ বিশীর 'ঋণং কৃত্বা' মঞ্চ-সাফল্যের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য।

উনবিংশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত সাহিত্য, উপন্যাস, ছোটগল্প, গীতিকবিতা ও প্রবন্ধ যে-পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাহা সত্যই বিস্ময়ের বিষয়। যে কোন দেশের সাহিত্য এই ধরণের গীতিকাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প প্রভৃতি সাহিত্য-সৃষ্টিতে গর্ব্ব বোধ করিতে পারে। মহাকাব্য রচনার যুগ হয়তো চলিয়া গিয়াছে, একমাত্র মধুসূদনই মহাকাব্যের প্রথম

ও শেষ স্রষ্টা। সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয়, বাংলা সাহিত্যে নাট্য-সাহিত্যের অভাব। কলিকাতার কয়েকটি বিশিষ্ট স্থায়ী নাট্যালয়ও আছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট নাটক বাংলা-দেশে সৃষ্টি হইল না। নাটক বলিতে আমি তথাকথিত জনপ্রিয় দৃশ্যকাব্যের কথাই বলিতেছি না, নাটক বলিতে আমি তাহাকেই বুঝি, যাহা একাধারে দৃশ্যকাব্য পাঠ্যকাব্য।

বাংলা সাহিত্যে নাটকের অভাব কেন?

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে কয়েকটী নাট্য-প্রতিভার আবির্ভাব হইয়াছিল তন্মধ্যে দীনবন্ধুই বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মধুস্দন চেষ্টা করিলে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হইতে পারিতেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাঁহার নাটকীয় দৃষ্টি তিনি মহাকাব্যে ব্যবহার করিয়াছেন, ফলে. গ্রীক ও সেক্সপীয়রীয় নাটকীয় দৃষ্টি তাঁহার মহাকাব্যের ধীর স্থির মহিমাকে অপূর্ব্ব দ্রুতি দান করিয়াছে। যে তন্ময় দৃষ্টি (Objective Vision) ও চরিত্র-সৃষ্টি-কুশলতা ব্যতীত নাটক রচনা সম্ভব নয়, দীনবন্ধুর তাহা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলি অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছে, এবং সংলাপ-সৃষ্টিতেও তাঁহার সংযমবোধের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়। গিরিশচন্দ্র অসংখ্য নাটক লিখিয়াছেন, এবং এক কালে উহারা মঞ্চ-সাফল্যের দিক হইতে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু নাটকীয় শিল্প-কুশলতার দিক হইতে বিচার করিলে উহাদের অসম্পূর্ণতা অত্যন্ত পীড়াদায়ক মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ যে-ধরণের সাঙ্কেতিক নাটক (Symbolic Drama) লিখিয়াছেন, তাহাও একটি মাত্র ভাব-স্পন্দিত গীতিকাব্য বিশেষ। রবীন্দ্রোত্তর কালে মঞ্চ-সাফল্যের দিক হইতে যে সকল নাটক কলিকাতার মত স্থানেও প্রশংসা লাভ করিতেছে, তাহাও নাটক বলিয়া নয়। এই সকল নাটকে সাধারণের বোধগম্য একধরণের সুলভ দৃশ্যমানতা, ভাব-বিহ্বলতা অথবা উগ্র প্রচারকামনাই পরিলক্ষিত হয়।

এখন কথা হইল, বাংলা নাট্যসাহিত্যের এই দুর্ভাগ্য কেন হইল? সত্য কথা বলিতে কি, আজ পর্য্যন্ত উচ্চশ্রেণীর নাটকীয় প্রতিভাই বাংলা সাহিত্যে

আবির্ভূত হয় নাই। নাটক অত্যন্ত কঠিন শিল্প-কর্ম্ম। ঔপন্যাসিক পাঠকের কানের কাছে বসিয়া নিজের কথা বলিয়া যান, গীতিকবি তাঁহার একতারার গানে পাঠককে বিমোহিত করেন, কিন্তু নাট্যকারকে নাটক রচনা করিয়া তাহাকে রূপ দিবার জন্ম অভিনেতা ও অভিনেত্রীর উপর ছাড়িয়া দিতে হয়। তাঁহার বক্তব্য পরিস্ফুট করিতে অভিনেতা-অভিনেত্রী, সহৃদয় সামাজিকবর্গ ও নিজের সঙ্গে ঐক্যস্থাপন করিতে হয়। তিনজনের মধ্যে এইরূপ ঐক্যসৃষ্টিতে সফলতা প্রদর্শন খুব সহজ কথা নহে। দ্বিতীয়তঃ, নাটক রীতিমত তন্ময় রূপ-সৃষ্টি। এইজন্ম নাট্যকারের পক্ষে সুকঠিন নির্লিপ্ততা (Detachment) অবলম্বন করিতে হয়। 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' জগত-দর্শন তেমন কঠিন কাজ নয়, কিন্তু জগতকে নেহাৎ জগত রূপে, বস্তু-সত্তারূপে প্রত্যক্ষ করা শ্রেষ্ঠ শিল্পী ব্যতীত সম্ভব নয়। জগতের বস্তুগত বিচিত্র সত্তা ও বিচিত্র নরনারীই নাটকে ভিড় করিয়া আসে। নাট্যকারের যদি তন্ময় দৃষ্টি না থাকে, তবে নাটকীয চরিত্রগুলিও তাঁহার আত্মচরিতের বা আত্মচিন্তার প্রতিধ্বনিরূপে প্রস্ফুট হইবে এবং নাট্যকারের পক্ষে চরিত্র-সৃষ্টি ব্যর্থতায পর্য্যবসিত হইবে। আমাদের বাংলা সাহিত্য-সাধকগণের মধ্যে তন্ময় অপেক্ষা মন্ময়-দৃষ্টি গভীরতর বলিয়াই উহা নাটক সৃষ্টির অনুকূল হয় নাই। এইখানে আর একটি কথাও মনে হইতেছে। বাংলাদেশ মূলতঃ গানের দেশ। আমাদের দেশে জনশিক্ষার বাহনরূপে যাত্রা-কথকতা প্রচলিত ছিল, কিন্তু উহাদের মধ্যে নাটকীয় কুশলতা অত্যন্ত ক্ষীণ। এই গানের দেশের অতীতে যাহা ছিল, তাহাও কবিগান, গাজীর গীত, কীর্ত্তন—সকলই গান। বাংলা দেশ সেই গানের সুরটিকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়া রবীন্দ্রকাব্যে গীতিকাব্যের চরম উৎকর্ষে আনিয়া পৌঁছাইয়াছে। গান আত্মধ্যানমূলক, অহংবিদ্ধ কল্পনা-প্রসূত। সুতরাং আমাদের অতীত ও উত্তরাধিকার নাট্যসৃষ্টির প্রতিকূল অবস্থাই রচনা করিয়াছে। জাতিহিসাবে বাঙ্গালী শুধু গানের 'রাজা'ই নহে, বাঙ্গালী অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ। ভাবপ্রবণতা কর্ম্মপ্রবণতার বিরোধী, অথচ নাটকে মানবজীবনের কর্ম্মের দিকটিই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ভাবপ্রবণ জাতির হাতে নাটক অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ ও গীতিকাব্যোচিত হইয়া উঠিবে, ইহা

মোটেই বিস্ময়ের বিষয় নহে। ইংরেজী সাহিত্যে নাটকের অভাব নাই, এক সেক্সপীয়রই সারা জগতের বিস্ময়রূপে অনির্ব্বাণ হইয়া রহিয়াছেন। সেক্সপীয়রের নাটকে কর্ম্মময় মানবজীবনের যে দ্বন্দ্ব-চিত্র পাওয়া যায়, তেমনটি আমাদের নাটকে সম্ভবও নয়। কারণ আমরা জীবনকে কর্ম্মের মধ্যে নয়, ভাবের মধ্যে অনুভব করি। সেক্সপীয়রের চরিত্রাবলী জীবনযুদ্ধে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য দুর্জ্জয় শক্তি প্রয়োগ করেন, কখনো বা নিয়তির সহিত পর্য্যন্ত দ্বৈরথ সমরে অবতীর্ণ হন, আমাদেব নাটকে তাহার সম্ভাবনা নাই। কারণ আমরা অদৃষ্ট-তাড়িত, অদৃষ্ট-পীড়িত জাতি—আমাদের জীবনের সার্থকতা প্রতিকূল ঘটনার পরাজয়ে নহে, উহার নিকট আত্মসমর্পণে, এবং নিজের জীবনের ব্যর্থতাকে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল রূপে ব্যাখ্যা করিয়া এক ধরণের ক্লীব সান্ত্বনা সৃষ্টিতে। এতদ্ব্যতীত, জীবনযুদ্ধে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যে শক্তি, সাহস, নিষ্ঠা ও সংযমবোধের প্রয়োজন, বাঙ্গালী চরিত্রে বহুদিন যাবৎ তাহার অভাব ঘটিয়াছে। বিচিত্র জীবন-দর্শন-প্লাবিত বাংলায় শেষে গানেরই জয় হইল। দেশের দারুণ দুর্দ্দিনে অন্যান্য জাতি যেখানে সুনির্দ্ধারিত কর্ম্মপন্থা অনুসরণে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে চায়, বাঙ্গালী তখন ভাববিহ্বল চিত্তে দৈন্য-মহিমা সম্বন্ধে কবিতা লিখিয়া ফেলে; দুর্ভিক্ষের পীড়নে দেশে সহস্র লোক যখন অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন বাঙালী দুর্ভিক্ষকে ভগবানের শিক্ষার উপায়রূপে গ্রহণ করিয়া 'নয়ন ভরিয়া শুধু কাঁদে', আর বলে, 'তোমার ইচ্ছা কর়হে পূর্ণ আমার জীবন-মাঝে'। এইরূপ জাতিগত ক্লৈব্য থাকিলে সেই জাতির সাহিত্যে নাটক সৃষ্টি কী করিয়া সম্ভব হয় জানি না! প্রতিভার অভাব অপেক্ষা আর একটি বড় অভাব—সুস্থ সক্রিয় জীবন-দর্শনের অভাবই আমাদের নাট্য-সাহিত্যের দারিদ্র্যের কারণ।

জাতীয় জীবন কর্ম্মমুখর না হইলে নাটক সৃষ্টির অনুকূল আবহাওয়া থাকেনা। উনবিংশ শতাব্দী হইতে আজ পর্য্যন্ত আমাদের বাংলা তথা ভারতীয় জাতীয় জীবনে ভাব ও কর্ম্ম-বিপ্লব অনেকই আসিয়াছে। কর্ম্মবিপ্লব যখনই প্রকট হইয়াছে, বাঙ্গালী তখন উহাকে পর্য্যন্ত ভাবদৃষ্টি দ্বারা শোধন করিয়া লইয়াছে। মোটের উপর, জীবনের সকল ব্যাপার আমাদের নিকট কর্ম্ম-মীমাংসায় নহে,

ভাববিলাসে পর্য্যবসিত হইয়াছে। যে-প্রেম পাশ্চাত্ত্য নাটকে এত গভীর ভাবে মানব চরিত্রকে উদ্বুদ্ধ করে, তবু আমাদের দেশে বিলাস মাত্র—অথবা উহা একবিন্দু নয়নের জলে শুধু বেদনার তাজমহল সৃষ্টি করে। তাই আমাদের ট্র্যাজিডি সুলভ অতি-নাটকীয় হাহাকারে সমাপ্তি লাভ করে।

আর একটি কারণেও আমাদের নাট্য-সাহিত্য গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই। আমাদের দেশের জনসাধারণ শিক্ষিত নয়। সুতরাং উৎকৃষ্ট নাট্য-সাহিত্য তাহাদের পক্ষে কিছুতেই উপযোগী নয়। সামান্য 'অশিক্ষিত পটুত্ব' হেতু একমাত্র ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নাটকই তাহারা বুঝিতে পারেন এবং এই শ্রেণীর অতি সাধারণ নাটকই পেশাদার নাট্যালয়গুলি পরিবেশন করিয়া থাকে। দেশের জনসাধারণ শিক্ষিত না হইলে, তাহাদের শিক্ষা এবং আনন্দ দান উপলক্ষেও উচ্চ শ্রেণীর নাটক রচিত হইবার সম্ভাবনা কম। (অবশ্য এইখানে আমি ধরিয়া লইতেছি যে, উপযুক্ত নাটকীয় প্রতিভা-সম্পন্ন লেখকের অভাব নাই)। আরও একটি কথা, নাটক বুঝিবার মত শিক্ষিত রুচি ও মনোবৃত্তি আমাদের এখনো সৃষ্টি হয় নাই।

যাহাই হোক, আমাদের জীবনে নূতন শিক্ষিত সুস্থ সমাজ-চৈতন্য না আসা পর্য্যন্ত নাট্য-সাহিত্য সম্বন্ধে আশান্বিত হইবার কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের সাহিত্যে সেক্সপীয়র নাই বলিয়া দুঃখ করিয়া লাভ নাই। আয়োজন করিয়া নিজের ঢোল নিজে বাজাইয়া বা স্মৃতিসভা করিয়া কাহাকেও সেক্সপীয়রের সহিত অভিন্ন করিয়া আমরা যেন বিদগ্ধ সমাজের নিকট লজ্জা না পাই। সেক্সপীয়রের সঙ্গে যদি তুলনা দেওয়ার এমন ব্যাকুলতা কাহারও থাকে, তবে মনে রাখিতে হইবে, সেক্সপীয়রের প্রায় তুল্য প্রতিভার অধিকারী একজন মাত্র বাঙ্গালী লেখক আজ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন--তিনি বঙ্কিমচন্দ্র।

৮

উপন্যাস

বর্ত্তমান যুগে 'উপন্যাস'-সাহিত্যের জনপ্রিয়তাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ইহার সাহায্যে সমাজের সর্ব্বস্তরের লোকের মনোরঞ্জন করা যেমন সুসাধ্য, তেমনটি আর কোন প্রকার সাহিত্য-শিল্পের দ্বারা হয় না বলিলেই চলে। কিন্তু ইহার সুনির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা দান করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন দেশে এত বিচিত্র রূপে ইহার প্রকাশ পাইযাছে, হইতেছে এবং হইবে, যে আজ পর্য্যন্ত কোন নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা দ্বারা ইহাকে আবদ্ধ করা যাইতে পারিতেছে না। গ্রহ-নক্ষত্র-খচিত সীমাহীন আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া মাটির মানুষের মনের অবচেতনাংশ, তাহার অনন্ত জিজ্ঞাসা ও জীবন-পিপাসা বিভিন্ন ভঙ্গীতে এই শ্রেণীর সাহিত্যে রূপায়িত হইতেছে। ইহার বাহন গদ্য ও পদ্য উভয়ই হইতে পারে, যদিও গদ্যই ইহার উৎকৃষ্ট বাহন হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। Tennysonএর *Enoch Arden*, E. B. Browningএর *Aurora Leigh*, নবীন সেনের 'রঙ্গমতী', ঈশান বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যোগেশ', অক্ষয় চৌধুরীর 'উদাসিনী' পদ্যে উপন্যাস মাত্র; Chaucerএর *Canterbury Tales*কে কেহ কেহ ইংরেজী সাহিত্যে উপন্যাসের জন্মের পূর্ব্বেই জাত-উপন্যাস নামে অভিহিত করেন। বাংলায় 'মৈমনসিংহ গীতিকার' মধ্যেও কেহ কেহ উপন্যাসের ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়াছেন; এবং 'মঙ্গল কাব্যের' অধিকাংশও মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'ও উপন্যাসধর্ম্মী—ইহারাও পদ্যে লিখিত। দ্বিতীয়তঃ, উপন্যাসের আকার সম্বন্ধে কোন সুবিহিত ধারণা আজ পর্য্যন্ত কাহারও নাই। জাপানী সুবৃহৎ উপন্যাস Murasaki Shikibuর *The Tale of Genji*, (Arthur Waley কর্ত্তৃক অনূদিত), স্পেনীয় *Don Quixote* রাশিয়ান *War and Peace*, ফরাসী *Les Miserables*, *Jean Christophe*, আমেরিকান ঔপন্যাসিক John Dos Passosএর ত্রয়ী উপন্যাস

(বাণিজ্যিক সভ্যতার বিস্তারে বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে আমেরিকার পতনের চিত্র), ইংরেজী ত্রয়ী উপন্যাস Bennett-এর *Clayhunger, Hilda Lessways* এবং *These Twain*, H. G. Wellsএর *The World of William Clissold* (৩খণ্ড), এবং *Vanity Fair*, *Tess*, *The Forsyte Saga*, বাংলায় বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' এবং 'অপরাজিত', তারাশঙ্করের 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম'; বনফুলের তিনখণ্ড 'জঙ্গম'; নারায়ণ গাঙ্গুলীর তিনখণ্ড 'উপনিবেশ'; শরৎচন্দ্রের চারিখণ্ড 'শ্রীকান্ত'; সরোজকুমার রায় চৌধুরীর 'ময়ূরাক্ষী-গৃহকপোতী এবং সোমলতা' প্রভৃতির আকার লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে, সাহিত্যিক রূপকর্ম্ম হিসাবে উপন্যাসের আকৃতি ও প্রকৃতি কী বিচিত্র। এইজন্যই জনৈক সমালোচক বলেন—

'No doubt each great man creates his own form—but no novelist has yet created one'. কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, উপন্যাসের আকার, উহার গঠন-নৈপুণ্য, চরিত্র-সৃষ্টি—এই কয়েকটি ছাড়িয়া দিলেও উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে উহার ভাষাই প্রধান দিগ্‌দর্শক। উপন্যাসের এই ভাষা-সমস্যা ব্যাপারে জনৈক সমালোচকের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

'Bad writing is perhaps even more fatal to the novelist than to any other literary artist, though it is fatal to all : because the public of the novelist is more lenient in that matter than the public of the poet. It is easier to be a bad writer and yet succeed in the novel than in any other form of word artistry'.

বলা বাহুল্য, আজ পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিকগণের ভাষাবোধ ও বাক্‌শুদ্ধি-জ্ঞান সম্বন্ধে কোন শৈথিল্য দেখা যায় নাই।

ইংরেজী ও বাংলা—উভয় সাহিত্যেই উপন্যাস অপেক্ষাকৃত আধুনিক সৃষ্টি। গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত জীবন-দর্শন ও জীবনানুভূতি কোন বাস্তব কাহিনী অবলম্বন করিয়া যে-বর্ণনাত্মক শিল্পকর্ম্মে রূপায়িত হয়, তাহাকে উপন্যাস কহে। ঔপন্যাসিকের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য সুন্দর করিয়া, সুরসাল করিয়া

উপন্যাসের গল্পটীকে (Story) বর্ণনা করা। কালক্রমিক ভাবে কাহিনী-বিন্যাসই গল্প। রসাল করিয়া, বিশ্বাস্য করিয়া টলষ্টয় বা স্কট্ বা বঙ্কিমচন্দ্রের মত বলা যাইতে পারে। বলিবার ভঙ্গিটি এমন হইবে যে, পাঠক যেন ইহার পর কি হইবে ইহা জানিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া পড়ে। গল্পটী উপন্যাসের কোন চরিত্র, বা উপন্যাসের ঘটনা-বহির্ভূত অন্য কোন চরিত্র অথবা গ্রন্থকারের নিজের কথায় বলা যাইতে পারে। বর্ণনায় কখনো কখনো নাটকীয়তা, এমন কি গীতিপ্রবণতাও থাকিতে পারে। এইজন্যই মূলতঃ বর্ণনাত্মক হইলেও উপন্যাসে নাটকীয়তা ও গীতিপ্রবণতার লক্ষণ থাকিতে পারে। গল্পটি যখন কার্য্যকারণসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পরিবেশিত হয়, তখনই উহার নাম আখ্যানভাগ (Plot)। আখ্যানভাগ কোন কোন উপন্যাসে অসংলগ্ন বা শিথিল দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক এক বা ততোধিক আখ্যানভাগকে পূর্ণ-মণ্ডল সমগ্রতা দান করেন। উপন্যাসের উদ্দেশ্য, গ্রন্থকার জীবনের যে আলেখ্য দেখিয়াছেন, তাহার বর্ণাঢ্যতা পাঠক-হৃদয়ে সঞ্চারিত করা।

উপন্যাসকে কেহ কেহ 'পকেট থিয়েটার' বা 'ক্ষুদ্র নাট্যবেশ্ম' নামে অভিহিত করেন। নাটকে রঙ্গমঞ্চ ও দৃশ্যাবলী যে কাজ করে, ঔপন্যাসিক বর্ণনার সাহায্যে সেই কাজটি সম্পন্ন করেন। ইহার ঘটনাবলী কয়েকটি চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে। অনেকে মনে করেন, উপন্যাসে ঘটনাই মুখ্য, চরিত্র-সৃষ্টি গৌণ। আবার কেহ কেহ উপন্যাসে কয়েকটি বিশেষ চরিত্রকে ঘটনা-সংঘাতে জীবন্ত করিয়া তোলেন, অথবা চরিত্রগুলির বিশ্লেষণের সাহায্যে তাহাদের ব্যক্তিত্বের পরিচয় প্রদান করেন। আমাদের মনে হয়, ঘটনা ও চরিত্র-সৃষ্টি পরস্পর নিরপেক্ষ নহে—একটি অপরটির সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। চরিত্রই উর্ণনাভের মত আপনার চারিদিকে ঘটনার জাল বুনিয়া ঘটনা-প্রবাহ সৃষ্টি করে এবং ঘটনাই আবার চরিত্র-সৃষ্টির সাহায্য করে। শরৎচন্দ্র বলেন, ঔপন্যাসিকের পক্ষে কতকগুলি চরিত্র, প্লট এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা, এই তিনটি বিশেষ প্রয়োজনীয়—

উপন্যাসের গঠন-রীতি

অন্যান্য গ্রন্থকারদের যা নিয়া বিপদ—প্লট পায় না—সেই প্লট সম্বন্ধে আমাকে কোন

দিন চিন্তা করিতে হয় নাই। কতকগুলি চরিত্র ঠিক করিয়া নেও, তাহাদিগকে ফোটাবার জন্য যাহা দরকার তাহা আপনি আসিয়া পড়ে। আসল জিনিষ কতকগুলি চরিত্র—তাকে ফোটাবার জন্য প্লটের দরকার, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা আনিয়া যোগ করিতে হয়।*

সুতরাং ঔপন্যাসিক সুবিহিত ও সুসমঞ্জস ঘটনা-বিন্যাসের সাহায্যে চরিত্র-সৃষ্টির সহায়ক হইবেন, ইহাই মুখ্য কথা। চরিত্র ও ঘটনাবলীর বিন্যাসের মধ্য দিয়া জীবনের প্রবাহ সৃষ্টি হয়। পাত্রপাত্রীগণের কথোপকথন উপন্যাসের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। সাবলীল, সহজ ও স্বাভাবিক সংলাপ উপন্যাসের চরিত্র-বিকাশের সহায়ক। এতদ্ব্যতীত, যে-দেশের, যে-কালের, যে-সমাজের উপন্যাস লেখা হইতেছে, সেই দেশ-কাল-সমাজের রুচি, আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি অনুযায়ী যথাযোগ্য পটভূমি নির্ব্বাচন ও যুগ-চিত্ত অঙ্কন-প্রচেষ্টাও উপন্যাসে চলিতে পারে। কোন বিষয়ের অযথা দীর্ঘ বর্ণনা শোভনীয় নয়। ইহা পাঠকের পক্ষে ক্লান্তিকর হইতে পারে। কোন কোন ঔপন্যাসিক বিশেষ কোন স্থান বা জেলার অধিবাসীদিগের আচার-ব্যবহার বা জীবন-যাত্রার আখ্যান লইয়া উপন্যাস রচনা করেন। এই জাতীয় উপন্যাসে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান থাকে। Thomas Hard-র উপন্যাসে *Wessex*-এর মানব-চিত্র, গর্কি বা ডষ্টোভেস্কির উপন্যাসে রাশিয়ার বিশেষ পরিবেশ ও তারাশঙ্করের গল্পে ও উপন্যাসে বীরভূম জেলার প্রাকৃতিক পরিবেশ-রচনা আছে। এই জাতীয় উপন্যাসকে আঞ্চলিক উপন্যাস বা ***Regional Novel*** কহে।

ইহার পর উপন্যাসের ভাষা। ইহাকে উপন্যাসের চিৎ-শক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, কারণ একমাত্র সহজ ও সাবলীল ভাষার গুণেই গ্রন্থকার পাঠকের কল্পনা-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন। সর্ব্বশেষ কথা, প্রত্যেক ঔপন্যাসিকই জীবন ও জগতের যে-রহস্য উদ্ঘাটন করিলেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য বা আলোচনাও উপন্যাসের ফাঁকে ফাঁকে থাকিতে পারে। কোন কোন ঔপন্যাসিক বিশেষ কোন তত্ত্বকথা বা জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাহার ধ্যানধারণা

অভিনন্দনের উত্তর।

(*Criticism of life*) অথবা কোন সামাজিক বা নৈতিক প্রশ্ন সম্বন্ধে মীমাংসার সন্ধান দিতে চাহেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, খোলাখুলি ভাবে উপন্যাসে এই প্রচার কার্য্য থাকিলে উপন্যাসের শিল্প-সঙ্গত সৌন্দর্য্য ক্ষুণ্ণ হয়। কারণ, শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক স্পষ্টভাবে উপদেষ্টার বেদীতে আরোহণ করেন না—জীবনের গতি-প্রকৃতি পাঠকের সম্মুখে উদঘাটিত করিয়া অপ্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদান করিতে পারেন। ঔপন্যাসিকের শিল্প-সৃষ্টির রূপ-বন্ধন (*pattern*) যাহাই হোক না কেন, শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক জীবনের যে-চিত্র অঙ্কন করেন, তাহা নাটকের আখ্যান-ভাগের মত সুবিহিত না হইলেও ক্ষতি নাই। আপাত-অসংলগ্নতাও যদি জীবনরসে উচ্ছলিত হইয়া ওঠে, এবং উপন্যাসটি পূর্ণ-বৃত্ত জীবনের আভাস না দিলেও যদি জীবনের অন্তহীন সম্ভাবনা—'not rounding off, but opening out'-এর ব্যঞ্জনা দান করে, তবেই তাঁহার খ্যাতি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া থাকিবে।

উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার

কাজেই শ্রেষ্ঠ উপন্যাস আখ্যানভাগ, চরিত্র-চিত্র, পরিবেশ-কল্পনা ও বাণীভঙ্গি মিলিয়া সুসম্বদ্ধ একটি রূপ-শিল্প মাত্র। ইহার শ্রেষ্ঠত্ব লেখকের জীবন-দর্শনের উপর নির্ভর করে। যুগে যুগে উপন্যাসের বহির্গত রূপ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, যুগ-মানব-পিপাসা বিভিন্ন রসসৃষ্টির দাবীও করিতে পারে, নবনব জিজ্ঞাসায় ঔপন্যাসিক জীবনের রহস্য উদঘাটিত করিতে পারেন। কিন্তু দেখিতে হইবে, তাঁহার জীবন-জিজ্ঞাসা (*Criticism of life*) কতখানি গভীর করিয়া, বিস্তৃত করিয়া, সত্য করিয়া জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ নরনারীর ভাগ্যকে পরিস্ফুট করিয়াছে, তাহাদের ক্ষণ-প্রাণ জীবনকে চিরন্তনের মহিমা দান করিয়াছে। এমনই অপূর্ব্ব সৃষ্টি Tolstoy-এর *War and Peace*; পরিবেশ-রচনা-কুশলতা, ঐতিহাসিক যুগ-চেতনা, আখ্যানভাগ-পরিচালনা ও বিশিষ্ট বাণীভঙ্গি—সব মিলিয়া যেন এই পরিপূর্ণ সঙ্গীত বিচিত্রমধুর কণ্ঠে জীবন-প্রীতির জয়ধ্বনি করিয়াছে। Dostoevskyর উপন্যাস *Idiot* এবং *The Crime and Punishment* অনুরূপ সম্মানের অধিকারী; Balzac-এর *Pere Goriot*, Flaubert-এর *Madame Bovary*, Sienkiewiez-এর *Quo Vadis*, Dickens-এর

David Copperfield, Fielding-এর *Tom Jones*, Thackerayর *Vanity Fair*, Meredithএর *The Egoist*, D. H. Lawrence-এর *Sons and Lovers* কয়েকটী উৎকৃষ্ট উপন্যাস। কিন্তু R. Rollandএর উপন্যাস *Jean Christophe*, Hugoর *Les Miserables*, Galsworthyর *The Forsyte Saga*, Hardyর *Tess*, *The Return of the Native* মহৎ উপন্যাস।

বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্র নাটক ও উপন্যাস, কাহিনী ও গীতিকাব্য একই পাত্রে পরিবেশন করিয়া জীবনের রূপ দেখিয়াছেন—'বাংলার মাটিতে ঐ একটিমাত্র সাহিত্যিক দেওদার বৃক্ষ জন্মিয়াছিল'। তাঁহার বিষবৃক্ষ, আনন্দমঠ, সীতারাম, রাজসিংহ উৎকৃষ্ট উপন্যাস, কিন্তু কৃষ্ণকান্তের উইল ও চন্দ্রশেখর মহৎ সৃষ্টি। তাঁহারই পার্শ্বে শরৎচন্দ্রের দেনাপাওনা, বিরাজ বৌ, পল্লীসমাজ, গৃহদাহ উৎকৃষ্ট সৃষ্টি, কিন্তু একমাত্র 'শ্রীকান্ত'-ই মহৎ উপন্যাস বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'চোখেরবালি' ও 'ঘরে বাইরে' সার্থক উপন্যাস। 'গোরা' আকারে 'মহাকাব্যোচিত' হইলেও উপন্যাসের নায়কের চরিত্র-কল্পনা যেমন নিরাকার বিদেহী সত্তা, ইহার জীবন-দর্শনও তেমনই ভাবসত্যবর্জ্জিত অবাস্তব, উদার কল্পনা মাত্র। একমাত্র 'শেষের কবিতাই' কাব্যধর্ম্মের গৌরবে বিজয়ী হইয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' বা 'শেষপ্রশ্ন' গদ্যে প্রবন্ধ বিশেষ। আধুনিক কয়েকখানা উপন্যাস—বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী', তারাশঙ্করের 'কবি', বনফুলের 'রাত্রি' মহৎ সৃষ্টির পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

উপন্যাসে নীতি ও বাস্তবতা

কেহ কেহ উপন্যাসকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার বাহন করিয়া তুলিবার পক্ষপাতী। দেশের আর্থিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, নৈতিক—নানা সমস্যাই উপন্যাসে গৃহীত হইতে পারে—কিন্তু উপন্যাস শিল্পকর্ম্ম, এই কথা যাহারা বিস্মৃত হইতে চাহেন, তাঁহারা সেই সেই সমস্যা সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখিলেই পারেন। উপন্যাসে নীতির প্রাধান্য সম্বন্ধেও একই কথা। উপন্যাসে যে নীতি-প্রাধান্য থাকিবে, উহা উপন্যাসের বহির্গত কোন প্রকার নৈতিকতা (morality) নহে, উহা লেখকের

জগৎ ও জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ অনুভূতির সংশ্লেষণাত্মক পরম সঙ্গতির নীতি মাত্র—উহা জীবনেরই পরম স্বীকৃতি। এই হিসাবে ঔপন্যাসিক জীবন-নীতির প্রতি দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিতে পারেন না। কেহ কেহ আবার বলেন যে, 'বাস্তবানুগামিতাই' উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি। 'বাস্তবানুগামিতা' বলিতে তাঁহারা যদি লেখকের ভাব বা মানস-দীপ্তি-নিরপেক্ষ যথাযথ চিত্রাঙ্কন ক্ষমতা বুঝাইতে চাহেন, তবে সর্ব্বদেশের উপন্যাস সাহিত্য তাঁহাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে এবং বাংলা উপন্যাসের অতি-আধুনিক কয়েকটি উপন্যাস বঙ্কিম-শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস অপেক্ষা উন্নততর মনে হইবে। উপন্যাসে যে বাস্তবতা থাকিবে, উহা বাস্তবের বাস্তবতা নহে—উহা ভাবের বাস্তবানুগামিতা এবং ভাবাতিরেকও এইখানে কাব্য-সত্যে নিয়ন্ত্রিত হইয়া উঠিবে। এইজন্য জনৈক সমালোচক বলেন—

Realism must be kept within the sphere of art by the presence of the ideal element. Romance must be saved from extravagance by the presence of poetic truth.

উপন্যাসকে সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যায় :—

(১) ঐতিহাসিক উপন্যাস—এই জাতীয় উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সমসাময়িক জীবনের বিষয়বস্তু লইয়া উপন্যাস রচনা করেন না। তিনি অতীতমুখী—অতীতের কাহিনীকে তিনি উপন্যাসে প্রাণবান করেন। অতীতের প্রতি ঔপন্যাসিকের শ্রদ্ধা, বিস্ময় ও প্রেম-বিমুগ্ধ চিত্তই তাঁহার উপন্যাসকে মাধুর্য্য দান করে। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের পক্ষে অতীত জীবনের ইতিহাস, অতীতের রীতি-নীতি, সংস্কার, প্রচলিত গান, আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের অবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন থাকিতে হইবে, নতুবা তাঁহার উপন্যাসে কালবিরোধ-দোষ (*Anachronism*) ঘটিতে পারে এবং তিনি যে-কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে। অবশ্য, রূপ-সৌষম্য সৃষ্টি করিবার জন্য লেখক দুই এক জায়গায় ঐতিহাসিক তথ্যঘটিত ভুল করিলেও তেমন ক্ষতিকর হয় না। 'ইতিহাসের উদ্দেশ্য কখন কখন উপন্যাসে সুসিদ্ধ হইতে পারে। উপন্যাসে লেখক সর্ব্বত্র

সত্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ নহেন। ইচ্ছামত অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন।'* কিন্তু অতীতের বিশেষ যুগ-শাসিত জীবন-যাত্রার কাহিনীটি তাঁহার লেখায় জীবন্ত হইয়া উঠিতে হইবেই। ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

'ইতিহাস পড়িব না আইভান্‌হো পড়িব? ইহার উত্তর অতি সহজ। দুই-ই পড়ো। সত্যের জন্য ইতিহাস পড়ো, আনন্দের জন্য আইভান হো পড়ো।....কাব্যে যদি ভুল শিখি, ইতিহাসে তাহা সংশোধন করিয়া লইব।' †

ইংরেজী সাহিত্যে Scott-এর *Ivanhoe*, Thackeray-র *Esmond* ও বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ', রমেশচন্দ্র দত্তের 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত', 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা', রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি', 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস।

শ্রেণীবিভাগ

ঐতিহাসিক উপন্যাসকে আবার শুদ্ধ ও মিশ্র, এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। শুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস রাষ্ট্রনৈতিক এবং সামাজিক—এই দুই ভাগে বিভক্ত। উপন্যাসে যখন বিশুদ্ধ ইতিহাস-রসই মুখ্য হইয়া দাঁড়ায়, তখন উহা রাষ্ট্রনৈতিক অথবা সামাজিক অবস্থাকে মুখ্য করিয়া তুলিতে পারে। প্রথম শ্রেণীতে Strutt-এর *Queenhoo Hall*, বঙ্কিমের রাজসিংহ, রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষি; দ্বিতীয় শ্রেণীতে Anatole France-এর *Thais*, Thackerayর *Esmond* ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেণের মেয়ে'র নাম করা যায়।

মিশ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস-এর আবার দুইটি বিভাগ—ইতিহাসের ছায়ায় কাল্পনিক সৃষ্টি (যথা, Scott-এর *Kenilworth*, *Ivanhoe*, George Eliot-এর *Romola*, Tolstoy-এর *War and Peace*, রমেশচন্দ্রের 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা', 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত') এবং কাল্পনিক কথা-মণ্ডিত ঐতিহাসিক উপন্যাস (যথা রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শশাঙ্ক', 'ধর্ম্মপাল'; অনুরূপা দেবীর 'ত্রিবেণী')।

---

* বঙ্কিমচন্দ্র ; রাজসিংহ—বিজ্ঞাপন   † সাহিত্য

(২) সামাজিক উপন্যাস—যে উপন্যাসে সমাজের রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন বিষয়-বস্তুর অবতারণা থাকে, তাহাকে সামাজিক উপন্যাস কহে। Kingsleyর *Yeast*, Dickens-এর *Hard Times*, রমেশচন্দ্রের সংসার, সমাজ; বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল; শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ, পল্লীসমাজ এই শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীর উপন্যাসে কোন সমস্যা বা মতবাদ-প্রচার উগ্র হইয়া উঠিলে তাহাকে উদ্দেশ্য-মূলক উপন্যাস (*Purpose Novel*) বলা হয়। Glad Kov-এর *Cement*, বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী', শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী', 'শেষপ্রশ্ন'; রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' ও প্রফুল্ল সরকারের 'বিদ্যুৎ-লেখায়' প্রচারের কামনা উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' নামক উপন্যাসখানা রাষ্ট্রনৈতিক জীবন-ঘটিত হইলেও সার্থক সৃষ্টি। কোন উপন্যাসে আখ্যানভাগ-নিয়ন্ত্রণ-কৌশল অপেক্ষা যদি চরিত্র-চি ত্রও চরিত্র-বিশ্লেষণ মুখ্য হইয়া দাঁড়ায়, তবে তাহাকে মনস্তত্ত্বমূলক (*Psychological*) উপন্যাস নামে অভিহিত করা যায়। ইংরেজীতে Meredith, D. H. Lawrence ও বাংলায় শরৎচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর উপন্যাস সৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ত।

(৩) কাব্যধর্ম্মী উপন্যাস—আখ্যানভাগ নিয়ন্ত্রণ-কুশলতা বা চরিত্রসৃষ্টি-নৈপুণ্য অপেক্ষা গ্রন্থকারের কবিদৃষ্টি যে-উপন্যাসের জীবন-দর্শনকে স্নিগ্ধ ও মধুর করিয়া তোলে, তাহাকে কাব্যধর্ম্মী উপন্যাস বলা যাইতে পারে। ইংরেজীতে যাহাকে রোমান্স বলে, তাহা খাটী উপন্যাস নহে—কারণ উহা বাস্তবজীবন বিমুখীন। তথাপি ইহার উচ্ছ্বাসময় বর্ণাঢ্যতা ও বাস্তববিমুখীনতা ইহাকে কাব্য-সৌন্দর্য্যে অভিষিক্ত করে বলিয়া ইহাকেও কাব্যধর্ম্মী উপন্যাসের শ্রেণীভুক্ত করা অন্যায় হইবে না। এই হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র মত রোমান্সকেও কাব্যধর্ম্মী উপন্যাস বলা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' ও মণীন্দ্রলাল বসুর 'রমলা' এবং V. Woolf-এর *The Waves* এই শ্রেণীর উপন্যাস।

(৪) ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস—ইংরেজী ও বাংলা উভয় সাহিত্যেই খুন, আত্মহত্যা, জখম, খানাতল্লাশ বা গোয়েন্দা-বিভাগের পুলিশের অশেষ কৃতিত্বপূর্ণ

একজাতীয় লোমহর্ষণ উপন্যাস আছে। ইহাদিগকে ডিটেকটিভ্ উপন্যাস বলে। এই জাতীয় উপন্যাসে আখ্যানভাগ অতি জটিল ও সর্পিলগতি। ঘটনার অভাবনীয় বিন্যাসে ও লোমহর্ষণ অদ্ভুত কাহিনী-সৃষ্টিতে এই শ্রেণীর উপন্যাসের কৃতিত্ব। ইহাদের মধ্যে জীবনের কোন গভীর তত্ত্ব বা তথ্যালোচনা থাকে না, জীবনের নারকীয় দিকটাই ইহাতে উদ্ভাসিত হয়। অনেকের ধারণা, এই জাতীয় উপন্যাস পাঠে সাধারণ বুদ্ধি ও কূটবুদ্ধি প্রখরতা প্রাপ্ত হয়। যাহাই হোক, অবসর-বিনোদনের পক্ষে অনেকে এই ধরণের উপন্যাস পছন্দ করেন। ইংরেজী সাহিত্যে Conan Doyle, Edgar Wallace, Dorothy L. Sayers, Agatha Christie বাংলায় পাঁচকড়ি দে, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের 'দারোগার দপ্তর', বনফুলের 'পঞ্চপর্ব্ব', শরচ্চন্দ্র সরকারের 'গোয়েন্দাকাহিনী', অম্বিকাচরণ গুপ্তের গোয়েন্দা গল্প, ১৩১৫, ক্ষেত্রমোহন ঘোষের আদবিনী, ১৮৯৪ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

উপরের শ্রেণী-বিভাগ ছাড়া অন্যরূপ দৃষ্টিভঙ্গী-বিচারে উপন্যাসকে আরও কয়েক প্রকার ভাগ করা যায় যথা—

(৫) বীরত্ব-ব্যঞ্জক উপন্যাস (*The Novel of Adverture*) :—এইজাতীয় উপন্যাস সাধারণতঃ কোন বীরত্ব-ব্যঞ্জক কাহিনী অবলম্বনে লিখিত হয়। Stevenson-এর *Kidnapped*, Marryat-এর *Mr. Midshipman Easy*, মনীন্দ্রলাল বসুর 'অজয়কুমার' এই শ্রেণীভুক্ত। বাংলা সাহিত্যে খাঁটী বীরত্ব-ব্যঞ্জক উপন্যাস নাই বলিলেই চলে।

(৬) কাহিনী-উপন্যাস :—যে-জাতীয় উপন্যাস প্রচলিত কোন গাথা বা জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া লিখিত (যথা Blackmore-এর *Lorna Doone*, দীনেশ সেনের 'শ্যামল ও কজ্জল') অথবা পৌরাণিক কোন কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়, (যথা দীনেশ সেনের 'জড় ভরত', 'বেহুলা') তাহাকে কাহিনী-উপন্যাস বলা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর উপন্যাসে শিল্পকলা বিশেষ উন্নত ধরণের দৃষ্ট হয় না। বাংলা সাহিত্যে 'হরিদাসের গুপ্তকথা' এবং বটতলার উপন্যাসসমূহ বিশেষ উৎকর্ষের দাবী করিতে না পারিলেও নেহাৎ কাহিনী-পরিচালনার সহজ

দক্ষতায় এককালে উহারা সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন করিতে পারিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কল্পনার ঈষৎ স্পর্শ থাকিলেও মূলতঃ ইহারা কাহিনী-প্রধান।

(৭) লোমহর্ষণ উপন্যাস (*Novel of Terror*)– এই জাতীয় উপন্যাসে অতিলৌকিক ভীতিপ্রদ পরিবেশ রচনা করা হয়। ইংরেজীতে Horace Walpoleএর *The Castle of Otranto*, Beckfordএর *Vathek* উল্লেখযোগ্য।

(৮) পত্রোপন্যাস (*Epistolary Novel*)—উপন্যাসের চরিত্রাবলীর লিখিত পত্রের সাহায্যে যখন আখ্যান-বস্তুর বিস্তৃতি সাধন করা হয়, তখন উহাকে পত্রোপন্যাস বলা যাইতে পারে। এই জাতীয় উপন্যাসে চরিত্রাঙ্কনই মুখ্য। Richardson-এর *Pamela* ও শৈলজানন্দের 'ক্রৌঞ্চ-মিথুন' এই জাতীয় উপন্যাস।

(৯) আত্ম-জীবনীমূলক উপন্যাস (*Autobiographical Novel*)– যে-উপন্যাসে পাত্রপাত্রীগণ নিজের কথা নিজেই বলিয়া যায়, এবং তাহাদের উক্তির সাহায্যে চরিত-চিত্র ও আখ্যানভাগ পরিচালিত হয়, তাহাকে আত্মজীবনী-মূলক উপন্যাস বলা হয়। ইহা আবার একোক্তি বা অনেকোক্তিমূলক হইতে পারে। *David Copperfield*, 'ইন্দিরা', 'নীলাঙ্গুরীয়', একোক্তি-মূলক; *The Woman in the White*, রজনী, ঘরে-বাইরে, জাগরী অনেকোক্তি-মূলক উপন্যাস। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তে' আত্ম-চরিতের স্পর্শ আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন; সজনী দাসের 'অজয়' আত্ম-চরিতের ছদ্মবেশধারী উপন্যাস; প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'মহাস্থবির জাতক' আত্মজীবনী-মূলক উপন্যাস।

(১০) হাস্যরসাত্মক উপন্যাস (*Humorous Novel*)– যে-শ্রেণীর উপন্যাসে জীবনের বা কোন ভাব-কল্পনার অসঙ্গতির দিকটি লেখক সস্নেহে গ্রহণ করিয়া নিজেও হাসেন, পরকেও হাসাইতে পারেন, তাহাই হাস্যরসাত্মক উপন্যাস। হাস্যরসিক যখন সামাজিক কোন সমস্যাকে বিদ্রূপ-কটাক্ষ-লাঞ্ছিত করিয়া দেখেন, তখন তাঁহার সৃষ্টি বিদ্রূপাত্মক (যথা: যোগেন্দ্র বসুর 'মডেল ভগিনী') হইয়া উঠে। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কল্পতরু' (১২৮১) খুব সম্ভবতঃ বাংলা সাহিত্যে প্রথম হাস্যরসাত্মক উপন্যাস। এই গ্রন্থে লেখকের 'রঙ্গদর্শন-প্রিয়তার ঈষৎ

মধুর হাসি ছত্রে ছত্রে প্রভাসিত আছে'। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী', 'ফোক্‌লা দিগম্বর', (১২০৭) যোগেন্দ্র বসুর শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী (১১০২), চন্দ্রনাথ বসুর 'পশুপতি সম্বাদ' (১২৯০) ও কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কোষ্ঠির ফলাফল' এই শ্রেণীর উপন্যাস।

এতদ্ব্যতীত, বাংলায় বৈপ্লবিক জাতীয় আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করিয়া কয়েকখানা উপন্যাস লিখিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়', শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী', গোপাল হালদারের 'একদা', বনফুলের 'অগ্নি', দীপক চৌধুরীর 'পাতালে এক ঋতু'র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'একদা' আধুনিক উপন্যাস-সাহিত্যে গঠন-শিল্পে ও মননশীলতার সহিত মানব-রসের সম্মিলনে সার্থক সৃষ্টি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। উপন্যাসটিতে 'একদিনের পরিধির মধ্যে পূর্ব্বস্মৃতির পর্য্যালোচনার সাহায্যে বহুবর্ষ বিস্তৃত কাহিনীটি' বিধৃত হইয়াছে। ফলে, ইহার নির্ম্মাণ-শিল্পের সহিত আধুনিক ইংরেজী উপন্যাসে যাহাকে '*Stream of Consciousness*' বা চেতনা-প্রবাহী-উপন্যাস আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার প্রচুর সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই শ্রেণীর উপন্যাসে মানুষের চেতনার সুপ্ত গভীরের গোপনকথা, তাহার ব্যক্তিগত সংস্কার ও বিশ্বাস স্মৃতি-রোমন্থনে ধরা পড়ে। V. Woolf-এর *Mrs. Dalloway* এবং Joyce-এর *Ulyssis*-এ যেমন একদিনের কাহিনী রচনা করা হইয়াছে, 'একদা'য়ও তাহাই করা হইয়াছে। এই উপন্যাসগুলিতে স্থান কাল ও সময়ের ঐক্য মানিয়া নেওয়া হইয়াছে।

বাংলা সাহিত্যে আরও দুইপ্রকার উপন্যাস আছে, উহাদিগকে পরিপূরক (যথা, কপালকুণ্ডলার পরিপূরক দামোদর মুখোপাধ্যায়ের মৃণ্ময়ী, শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তের পরিপূরক প্রমথ বিশীর 'শ্রীকান্তের' পঞ্চম ও ষষ্ঠ পর্ব্ব) এবং সমাপক উপন্যাস (যথা, শরৎচন্দ্রের 'শেষের পরিচয়ের' সমাপক রাধারাণী দেবীর 'শুভদা') নামে অভিহিত করা যায়। এই জাতীয় উপন্যাসের শিল্প-চাতুর্য্য মূল লেখকের তুলনায় দীনতর, ইহা বলাই বাহুল্য।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের স্রষ্টা হইলেও ইতিপূর্ব্বে প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪—৮৩) 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৫৫৮) লিখিয়া বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের বীজ বপন করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহার পূর্ব্বে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস' (১৮২৩) প্রকাশিত হয়। 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা ভাষায় প্রথম সামাজিক উপন্যাস হইলেও ইহাতে ঔপন্যাসিক কলাকৌশল তেমন দৃষ্ট হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রই (১৮৩৮—১৮৯৪) প্রথম বাংলা উপন্যাস সৃষ্টি করিয়াছেন। সেক্সপীয়রের নাটকীয় কল্পনা ও স্কটের বর্ণনা-নৈপুণ্য—এই দুইয়ের সমন্বয়ে তাঁহার উপন্যাস অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে। Plot বা আখ্যায়িকা-রচনায়, স্বাতন্ত্র্য-বিশিষ্ট চরিত্র-সৃষ্টিতে এবং সর্ব্বোপরি বাস্তবের উপর পরম রমণীয় একটি আদর্শের ছায়া-সঞ্চারে বঙ্কিমের উপন্যাস অতুলনীয়। কল্পনা ও বাস্তব, ইতিহাস ও রোমান্সের এমন অভিনব সমন্বয়-সাধন আজ পর্য্যন্ত কাহারও উপন্যাসে সংসাধিত হয় নাই। তাঁহার প্রথম স্তরের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৫৬), 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৭), 'মৃণালিনী' (১৮৬৯), প্রভৃতি উপন্যাসে কবি বঙ্কিমের কল্পনা-বিলাস। দ্বিতীয় স্তরের 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫) 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' (১৮৭৮) লোক-রঞ্জনের মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন; তৃতীয় স্তরে—'আনন্দমঠ' (১৮৭২), 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪), 'সীতারাম' (১৮৮৭), প্রভৃতিতে তিনি মানবজীবনের সমগ্র বৃহত্তর কর্ত্তব্য বা ধর্ম্মবোধকে কেন্দ্র করিয়া উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। মোটের উপর, কাব্য, নাটক ও উপন্যাস—এই তিনটির রস একত্র পরিবেশনে বঙ্কিমচন্দ্র অদ্বিতীয়।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িকদের মধ্যে তারকনাথ গাঙ্গুলীর সামাজিক উপন্যাস 'স্বর্ণলতা', রমেশচন্দ্র দত্তের (১৮৪৮—১৯০৯) 'বঙ্গবিজেতা', 'মাধবী-কঙ্কন', 'রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা', 'মহারাষ্ট্র-জীবন-প্রভাত' প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং 'সমাজ' ও 'সংসার' নামক দুইখানা সামাজিক উপন্যাস, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর (১৮৪৭—১৯) 'মেজ বৌ', 'যুগান্তর'; দামোদর মুখোপাধ্যায়ের (১৮৫৩—১৯০৭) 'বিমলা'; সঞ্জীবচন্দ্রের (১৮৩৪—১৮৮৯) 'জালপ্রতাপ',

মাধবীলতা ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর (১৮৫৫—১৯০৬) 'মডেল ভগিনী' ও 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইহারা প্রত্যেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য প্রতিভা-দীপ্তির অন্তরালে কোনমতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে-আদর্শবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহারই ধারা উন্নত, প্রশস্ত ও দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১—১৯৪১) হাতে। রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর কল্পনায়, অনির্ব্বচনীয় ভাব-দৃষ্টিতে ও সত্য-সন্ধানী মনোবিশ্লেষণ-শক্তিতে যে-ধরণের মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ-মূলক উপন্যাস রচিত হইয়াছে, তাহা বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব্ব সামগ্রী। তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে 'নৌকাডুবি', 'চোখের বালি', 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'শেষের কবিতা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের দুরারোহিনী কল্পনার ঊর্দ্ধশাখায় যে ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাই শরৎচন্দ্রের (১৮৭৬—১৯৩৮) উপন্যাসে সাধারণের উপজীব্য রূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বাস্তব জীবনের চিত্রটি হৃদয়ের স্পর্শে সঞ্জীবিত হইয়াছে। আত্মঘাতী সমাজ-জীবনের অন্তরাল-নিহিত বেদনা-বাষ্প এবং বাংলার উপেক্ষিত ও অনাদৃত মনুষ্যত্ব শরৎ-সাহিত্যে রূপ লাভ করিয়াছে। তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে 'বিরাজ বৌ', 'দেবদাস', 'পল্লীসমাজ', 'শ্রীকান্ত', 'চরিত্রহীন' ও 'গৃহদাহ' বিখ্যাত।

উনবিংশ শতাব্দীতে যে কয়েকজন মহিলা ঔপন্যাসিক খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কুসুমকুমারী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, নিরুপমা দেবী, অনুরূপা দেবী, সীতা দেবী, শান্তা দেবী ও অমলা দেবীর নাম পাঠক সমাজে পরিচিত। ইঁহাদের উপন্যাস সাধারণতঃ নারী-সুলভ ভাবপ্রবণতা ও উচ্ছ্বাস-বহুলতায় ভারাক্রান্ত। কুসুমকুমারীর 'প্রেমলতা' (১৮৩৩); স্বর্ণকুমারীর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বিদ্রোহ', সামাজিক উপন্যাস 'কাহাকে', নিরুপমার 'দিদি'; অনুরূপার 'মন্ত্রশক্তি', 'মহানিশা'; সীতা দেবীর 'রজনীগন্ধা', শান্তা দেবীর 'চিরন্তনী'; অমলা দেবীর 'সুধার প্রেম' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। শরৎচন্দ্রের সমসাময়িকদের মধ্যে একমাত্র নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের উপন্যাসে উগ্র বাস্তবতার সুর পাওয়া যায়। যৌন ও অপরাধতত্ত্বমূলক উপন্যাস রচনায় তিনি কৃতিত্ব,

দেখাইয়াছেন। 'অগ্নি-সংস্কার', 'শুভা' ও 'রক্তের ঋণ' তাঁহার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

শরৎচন্দ্র পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যে আদর্শবাদই জয়ী হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে জীবনের আদর্শ, রবীন্দ্রনাথে ভাবের আদর্শ ও শরৎচন্দ্রে হৃদয়াবেগের আদর্শই বড় হইয়া দেখা দিয়াছিল।

পরবর্ত্তীকালে, প্রধানতঃ নরেশচন্দ্রের প্রভাবে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় পাদের অতি-আধুনিক সাহিত্য-বিলাসী সম্প্রদায় বাংলা সাহিত্যে অকুণ্ঠ বাস্তবতার আমদানী করিয়াছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের পর তারাশঙ্করের আবির্ভাবই বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যকে অগ্রগতির দিকে পরিচালিত করে।

শরৎচন্দ্রের মানবতাবোধ ও প্রীতি-স্নিগ্ধ সমাজ-সচেতনতা তারাশঙ্করে বিস্তৃত রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। ধাত্রীদেবতা, কবি, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, কালিন্দী ও আরোগ্য নিকেতন তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস। শরৎচন্দ্র আবেগ-প্রধান, তারাশঙ্কর বুদ্ধিপ্রধান; শরৎচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তি-সচেতন, পরোক্ষভাবে সমাজ-সচেতন; তারাশঙ্কর প্রত্যক্ষভাবে সমাজসচেতন, পরোক্ষভাবে ব্যক্তি-সচেতন। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও সরোজকুমার রায় চৌধুরী বাংলা সাহিত্যে 'আঞ্চলিক উপন্যাস' সৃষ্টি করিবার কৃতিত্ব দাবী করিতে পারেন। তাঁহাদের উভয়ের লেখায় যে-ধরণের বাস্তবতা বড় হইয়া দেখা দিয়াছে, তাহা সুস্থ জীবন-রসিকের দৃষ্টি-সম্ভূত।

'পথের পাঁচালী' ও অপরাজিত' লিখিয়া বিভূতিভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে অভিনব আত্মকেন্দ্রিক ভাবদৃষ্টি ও মনোবিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। 'আরণ্যক' উপন্যাসে তাঁহার প্রকৃতি-প্রীতি কাব্য-রূপাশ্রয়ী হইয়া উঠিয়াছে। 'বনফুলের' জীবন-দর্শন যেমন স্বচ্ছ কাব্য-সৌন্দর্য্যে স্নিগ্ধ, চরিত্রাঙ্কন-ক্ষমতাও তেমন নিপুণ ও সুদৃঢ়। তাঁহার 'রাত্রি' বাংলা সাহিত্যে একটি অবিস্মরণীয় কাব্য-উপন্যাস। ইহাতে যে শুধু সৌন্দর্য্য-পূজারীর প্রকৃতি-পূজা আছে তাহাই নয়; চরিত্র-সৃষ্টির দিক দিয়াও এই উপন্যাসটি মহিমময়। 'লক্ষ্মীর আগমন'ও একটি অপূর্ব্ব কাব্যধর্ম্মী উপন্যাস।

আধুনিক কালে যাহারা বাংলা উপন্যাস সাহিত্য সমৃদ্ধ করিতেছেন, তন্মধ্যে বিভূতি মুখোপাধ্যায়, সরোজ রায় চৌধুরী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ বসু, মনোজ বসু, প্রবোধ সান্যাল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আধুনিক উপন্যাস 'সমস্ত বিশ্বব্যাপী জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপরীক্ষিত সত্য, মানস ও জিজ্ঞাসা, কৌতূহলের বাহন হইয়া উঠিয়াছে। হৃদয়ের প্রত্যেক সমস্যাই আজকাল অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিবেশের সহিত অচ্ছেদ্য বলিয়া অনুভূত হইতেছে—পটভূমিকার অনির্দ্দেশ্য বিশালতায় ইহার আকৃতি-প্রকৃতির বিশেষ রূপ অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে'।*

---

* ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৯

ছোটগল্প

ছোটগল্প একদিকে যেমন নূতন, অপরদিকে তেমন পুরাতন। ইতালীয় সাহিত্যে *Gesta Romanorum* (1330), Baccaccio-র *Decameron* (1348-53), ইংরেজী সাহিত্যে বাইবেল, Chaucer-এর গল্প, *Æsop's Fables*, সংস্কৃতে বিষ্ণুশর্ম্মার 'হিতোপদেশ' ও 'পঞ্চতন্ত্র', সোমদেবের 'কথাসরিৎ-সাগর', বৌদ্ধ সাহিত্যের 'জাতকের গল্প', 'দিব্যাবদান' প্রভৃতি গল্প-সাহিত্য ছোটগল্পের চিরন্তন আবেদনেরই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আধুনিক ছোটগল্প একপ্রকার নূতন রূপ-সৃষ্টি। প্রাচীনকালের গল্পের মত ইহারা যথেচ্ছ-বিহারী, প্রগল্‌ভ ও নিরুদ্দেশ-পন্থী নহে। আধুনিক গল্প-লেখক বিষয়বস্তু, চরিত্র-সৃষ্টি, কথোপকথন, পরিবেশ-সৃষ্টি, বাণীভঙ্গি প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধে একান্তভাবে আত্ম-সচেতন।

ছোটগল্প

গল্প এবং আকৃতিতে ছোট হইলেই ছোটগল্প হয় না। আকৃতিগত ব্যতীত প্রকৃতিগত এবং মর্ম্মগত অনেক বিভিন্নতা ইহাকে উপন্যাস হইতে পৃথক শ্রেণীভুক্ত করিয়াছে। *E. A. Poe* (১৮০৯–৪৯) বলেন, যে-গল্প অর্দ্ধ হইতে এক বা দুই ঘণ্টার মধ্যে এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া শেষ করা যায়, তাহাকে ছোটগল্প বলে; *H. G. Wells* বলেন যে, ছোটগল্প ১০ হইতে ৫০ মিনিটের মধ্যে শেষ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ছোটগল্প প্রসঙ্গে Poe বলেন—

> In the whole composition there should be no word written of which the tendency, direct or indirect, is not to the *one pre-established design*....undue brevity is just as exceptionable here as in the poem; but undue length is yet more to be avoided.

আসল কথা এই যে, ছোটগল্প আকারে ছোট হইবে বলিয়া ইহাতে জীবনের পূর্ণাবয়ব আলোচনা থাকিতে পারে না; জীবনের খণ্ডাংশকে লেখক যখন রস-নিবিড় করিয়া ফুটাইতে পারেন, তখনই ইহার সার্থকতা। জীবনের কোন একটি বিশেষ মুহূর্ত্ত কোন বিশেষ পরিবেশের মধ্যে কেমন ভাবে লেখকের কাছে প্রত্যক্ষ হইয়াছে, ইহা তাহারই রূপায়ন। আকারে ছোট বলিয়া এখানে বহু ঘটনা-সমাবেশ বা বহু পাত্রপাত্রীর ভিড় সম্ভবপর নহে। ইহাতে অনাবশ্যক কথা, অনাবশ্যক ভাষা, অনাবশ্যক চরিত্র ও ঘটনা প্রভৃতিকে নিষ্ঠুর ভাবে বর্জ্জন করিয়া লেখক শুধু একটি রসঘন নিবিড় মুহূর্ত্তের,—one pre-established design-এর জয়োল্লাস পরিকল্পনায় মগ্ন থাকেন এবং আত্মকেন্দ্রিক মনোভিনিবেশের সাহায্য গ্রহণ করেন। ছোটগল্পের আরম্ভ ও উপসংহার নাটকীয় হওয়া চাই। সত্য কথা বলিতে কি, কোথায় আরম্ভ করিতে হইবে এবং কোথায় সমাপ্তির রেখা টানিতে হইবে, এই শিল্প-দৃষ্টি যাহার নাই, তাহার পক্ষে ছোটগল্প লেখা লাঞ্ছনা বই কিছুই নয়। স্বল্প-সংখ্যক সুনির্ব্বাচিত ঘটনার সাহায্যে ইঙ্গিত-পূর্ণ পরিণতি লাভই ছোটগল্পের উদ্দেশ্য। বিশেষতঃ, সারাটি গল্পে লেখকের যে মানস-স্পর্শ থাকে, তাহাই তাহাকে গীতি-কাব্যোচিত মাধুর্য্য দান করে। উপন্যাস বা নাটকে পরিতৃপ্তি আছে, ছোটগল্পে ইঙ্গিত-মধুরতা আছে। অথচ, এই ক্ষুদ্র কলেবরের মধ্যে নিগূঢ় সত্যের ব্যঞ্জনায়ই ইহার সার্থকতা। ছোটগল্পের প্রকৃতি ও গঠন-রীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আপনার অজানিতে যেন বলিয়া ফেলিয়াছেন—

ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু'চারিটী অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হ'য়ে হইল না শেষ।

'শেষ হ'য়ে হইল না শেষ',—ইহাকেই আমরা ব্যঞ্জনার মাধুর্য্য বলিয়াছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ছোটগল্প লেখকের আত্ম-সচেতন সৃষ্টি। ইহাতে বিশেষ প্রকারের গঠনরীতি, বিষয়বস্তু-চয়ন, চরিত্র-সৃষ্টি, কথোপকথন, পরিবেশ-সৃষ্টি, বাণীভঙ্গি প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। ইহার বিষয়বস্তু বিচিত্র ও উহার পরিবেশও ততোধিক বিচিত্র হইতে পারে। এই সম্বন্ধে কোন সুনির্দ্ধারিত সীমারেখা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া চলে না। ইহাতে লেখক পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তি, অনুভূতি অথবা অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত আলোড়িত করিতে পারেন, কিন্তু সকল সময়ই তাঁহাকে বিশেষ একটি রস-পরিণামকে (*Unity of Effect*)* মুখ্য করিতে হইবে; সুতরাং যে কোন অবান্তর কাহিনী বা রসভঙ্গকারী ব্যাপার সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। লেখক ব্যঞ্জনাত্মক সূচনা হইতে গল্পের জাল বুনিয়া যাইবেন এবং উহা যেন স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করে। *Plot* বা বিষয়বস্তু সাধারণতঃ স্থান কাল ও ঘটনার ঐক্য মানিয়া চলিবে। লেখক স্বাতন্ত্র্য-বিশিষ্ট কয়েকটি চরিত্র দুই একটি রেখায় বা ইঙ্গিতে আঁকিয়া যাইবেন। সাধারণতঃ সাবলীল, গতিশীল, স্বচ্ছ কথোপকথনের (*Dialogue*) মধ্য দিয়া চরিত্র সৃষ্টি করা লেখকের উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। গল্পের চরিত্রগুলির কথাবার্ত্তা যেন পরস্পারের, এমন কি তাহাদের নিজের উপরও আলোকপাত করে, এইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পরিমিত বর্ণনা দ্বারা লেখক পরিবেশ বা আবহাওয়া (*Environment*) সৃষ্টি করিবেন। কোন কোন গল্পে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য (*Local Colour*) ফুটাইতে হইলে লেখক স্থানবৈশিষ্ট্য নিষ্ঠার সহিত বর্ণনা করিবেন। গল্পের বাণীভঙ্গি (*Style*) বিশিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। এইজন্য শব্দচয়ন, উপমা বা অলঙ্কার প্রয়োগ এবং ভাব ও বিষয়ানুযায়ী ভাষা ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখা বিধেয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বোপরি উহার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা-দীপ্তির উপর নির্ভর করে।

উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে, ছোটগল্প

---

* *Cf*: Singleness of aim and singleness of effect are...the two great causes by which we have to try the value of a short story as a piece of art—*Hudson*.

মানবজীবনের গভীরতর রহস্য ভেদ করিতে চায় না, জীবনের অবিরাম স্রোতে ক্ষণপ্রাণ ও ক্ষণবিলীয়মান যে তরঙ্গ উঠিতেছে, পড়িতেছে, ভাঙ্গিতেছে, তাহাকেই লেখক স্থিরদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন। ইহাতে নাটক উপন্যাসের বা মহাকাব্যের বিস্তৃতি নাই—জীবনের খণ্ডরূপ এইখানে একটি বিশেষ রূপে (*Form*) ধরা দেয়। এই রূপসৃষ্টিকে সার্থক করিবার জন্য লেখক গল্পের উপাদান ও ভাব বিন্যাস একটি মাত্র রসপরিণামমুখী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পের ইহাই আদর্শ।

সংজ্ঞানির্ম্মাণ যেমন সুকঠিন, শ্রেণীবিভাগ ততোধিক কঠিন। তথাপি আমরা ছোটগল্প সাহিত্যকে বিষয়বস্তুর দিক হইতে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেছি। বলা বাহুল্য, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর দিক হইতে একটি গল্পই বিভিন্ন শ্রেণীতে উদাহৃত হইতে পারে এবং অন্য কোন দৃষ্টিভঙ্গী হইতেও ছোটগল্পের শ্রেণীবিভাগ চলিতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আজ পর্য্যন্ত বাংলা ছোটগল্প অশেষ বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে। ইহাদের মোটামুটি শ্রেণীবিভাগ—

(১) প্রেমবিষয়ক—এই শ্রেণীর গল্পে প্রেমের বিচিত্র লীলা, বিচিত্র পরিবেশে, বিচিত্র অবস্থায় এমনভাবে অঙ্কিত হয় যে, প্রেমের একটি মাত্র রস-পরিণাম গল্পে মুখ্য হইয়া উঠে। এই শ্রেণীতে Turgenev-এর ***The District Doctor***, Gorki-র ***Boless***, বঙ্কিমচন্দ্রের রাধারাণী, রবীন্দ্রনাথের একরাত্রি, শেষরাত্রি, নষ্টনীড়; প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ভস্মশেষ', মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সর্পিল', 'মহত্তর', 'বৃহত্তর' প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

(২) সামাজিক—এই জাতীয় গল্পে বিশেষ কোন সামাজিক পরিবেশ-রসই মুখ্য হইয়া উঠে। এই শ্রেণীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের হালদার গোষ্ঠী, পোষ্টমাষ্টার; রবীন্দ্র মৈত্রের উদাসীর মাঠ; শৈলজানন্দের কয়লাকুঠি, নারীমেধ, বধূবরণ; শরৎচন্দ্রের মহেশ, বিন্দুর ছেলে, অভাগীর স্বর্গ; কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'থাকো'; তারাশঙ্করের পিতাপুত্র, জগদীশ গুপ্তের 'রামের টাকা'; নরেন মিত্রের 'রস' এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

(৩) প্রকৃতি ও মানুষ—এই শ্রেণীর গল্পে প্রকৃতির পটভূমিকায় চরিত্রাঙ্কন করা হয় এবং প্রকৃতি মানুষের সুখদুঃখের পশ্চাৎ-পট রূপে ব্যবহৃত হয়। রবীন্দ্রনাথের তারাপদ, অতিথি ও মনোজবসুর বনমর্ম্মর এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

(৪) অতি-প্রাকৃত—এ শ্রেণীর গল্পে অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক রহস্য গল্প টিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে অথবা উহারই মৃদু শিহরণে গল্পটি রহস্য-মধুর বা ভয়াবহ রূপকান্তি লাভ করে। ইহাদের মধ্যে Gogol-এর *Christmas Eve*, H. G. Wells-এর *The Red Room*, Mary Coleridge-এর *The King is Dead, Long live the King*, রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিতপাষাণ, নিশীথে, সম্পত্তি সমর্পণ; সুবোধ ঘোষের 'ন তস্থৌ', জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরীর 'শেষ দেখা', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মর্কট', অচিন্ত্য সেনের 'ছায়া', বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাসি', 'অভিশপ্ত', অমলাদেবীর মহামৃত্যু, রাখাল সেনের 'শেষ খেয়া' (সপ্তপর্ণ) উল্লেখযোগ্য।

(৫) হাস্যরসাত্মক—এই শ্রেণীর গল্পে আখ্যানভাগ বা চরিত্রচিত্র অপেক্ষা হাস্যরস-মধুরতার স্পর্শই গল্পটির সার্থকতার একমাত্র হেতু হইয়া দাঁড়ায়। Zola-র *The Fete at Coquerville*, Woodhouse-এর *The Custody of the Pumpkin*, রবীন্দ্রনাথের অধ্যাপক, রাজটিকা; প্রভাতকুমারের রসময়ীর রসিকতা, মাষ্টার মশাই, বলবান জামাতা; কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশ নন্দিনীর দুর্গতি', বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের কায়াকল্প, ওরা ও আমরা, রাজশেখর বসুর খোকার কাণ্ড, ভূশণ্ডীর মাঠ; সম্বুদ্ধের (অমূল্যকুমার দাসগুপ্ত) 'দি গ্রেট ইষ্টার্ণ কোশ্চেন', জগদীশ গুপ্তের 'জ্যাঠানন্দ' এই শ্রেণীভুক্ত।

(৬) উদ্ভট—(*Fantasy*) এই শ্রেণীর গল্পে অসম্ভব বা অবাস্তব কাহিনী বাস্তবতা-অতিক্রান্তী রূপ পরিগ্রহ করে। ইহাদের মধ্যে বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের 'নারায়ণী সেনা', কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভগবতীর পলায়ন'-এর নাম করা যাইতে পারে।

(৭) সাঙ্কেতিক বা প্রতীকী (Symbolic)—যে-শ্রেণীর গল্পের পাত্রপাত্রী বা পরিবেশ উহাকে না বুঝাইয়া অন্য কোন অর্থকে ব্যঞ্জনা করে এবং ব্যঞ্জনার সেই মাধুর্য্যই গল্পের মুখ্য আবেদন হইয়া উঠে, তাহাদিগকে প্রতীকী গল্প বলা যায়। এই শ্রেণীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের তাসের দেশ, গুপ্তধন, ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মরু ও সঙ্ঘ' উল্লেখযোগ্য।

(৮) ঐতিহাসিক—অতীত ইতিহাসের পটভূমিকায় লিখিত ঐতিহাসিক রোমান্স এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, যথা—রবীন্দ্রনাথের দালিয়া ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃৎপ্রদীপ, চন্দনমূর্ত্তি, তখমোবারক; বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্নতত্ত্ব। কোন কোন গল্পে দেখা যায়, ইতিহাসাশ্রিত যুগটি পর্য্যন্ত গল্পে রূপ লাভ করে। যথা :—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের চুয়াচন্দন, অমিতাভ; হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'সেলিনা'।

(৯) বৈজ্ঞানিক—বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বা দৃষ্টিভঙ্গি যে-গল্পে প্রধান হইয়া থাকে, তাহা বৈজ্ঞানিক গল্প বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। H. G. Wells-এর *The Stolen Bacillus*, প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সয়তানের দ্বীপ', সুবোধ ঘোষের 'শক্ থেরাপী', 'সুন্দরং', গোত্রান্তর এই শ্রেণীভুক্ত।

(১০) গার্হস্থ্য—পারিবারিক বা গৃহ-জীবনের কাহিনী অবলম্বন করিয়া মুখ্যতঃ এই শ্রেণীর গল্প জন্মিয়া উঠে। ইহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ব্যবধান, মধ্যবর্ত্তিনী; বনফুলের তিলোত্তমা, রবীন্দ্র মৈত্রের লাউ-ডগা, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের খেলা, ঠেলাগাড়ী; রামপদ মুখোপাধ্যায়ের 'সুব্রতর বিবাহ' উল্লেখযোগ্য।

(১১) মনস্তাত্ত্বিক—নরনারীর মনো-নিভৃতি মনস্তত্ত্ব-রশ্মির আলোকে বিশ্লেষিত হইয়া যেখানে গল্পের রস জমাইয়া তুলিয়াছে সেই শ্রেণীর গল্পকে মনস্তাত্ত্বিক গল্প বলা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'পোষ্টমাষ্টার', শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি', সুবোধ ঘোষের 'অমিয় গরল ভেল', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টোপ' উল্লেখ করা যায়।

(১২) মনুষ্যেতর—আধুনিক কালে প্রাণীজগত-বৈচিত্র্যও লেখককে

অভিভূত করিয়াছে। যে-গল্পে ইহাদের কথাই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে, অথচ গল্পটি প্রাচীন কাহিনী-গল্প (*Fables*) পর্য্যায়ের নহে, তাহাদিগকে আমরা এই শ্রেণীভুক্ত করিতেছি। ইহাদের মধ্যে Balzac-এর *Passion in the Desert*, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঘিনী', প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিণী', তারাশঙ্করের 'নারী ও নাগিনী', বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বুধির বাড়ী ফেরা', প্রমথ বিশীর 'নীলমণির স্বর্গলাভ' উল্লেখযোগ্য।

(১৩) বাস্তব-নিষ্ঠ—যে-গল্পে জীবনের কোন অধ্যায় বা কাহিনী অকুণ্ঠ বাস্তবতা-মণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পায়, যাহাতে বিষয়বস্তু কোন আদর্শ বা ভাবজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে নাই, সেই শ্রেণীর গল্পকে আমরা বাস্তব-নিষ্ঠ গল্প বলিতে পারি। ইহাদের মধ্যে প্রবোধ সান্ন্যালের 'অঙ্গার', মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নমুনা', প্রাগৈতিহাসিক; শৈলজানন্দের 'নারীমেধ', 'বধূবরণ', অচিন্ত্য সেনের 'বস্ত্র', বাণী রায়ের 'ময়নামতীর কড়চা' স্মরণীয়।

(১৪) ডিটেকটিভ্ গল্প—যে-শ্রেণীর বর্ণনাত্মক গল্পে নরহত্যা জাতীয় বিশেষ কোন সমস্যা কোন পুলিশ বিভাগীয় কর্ম্মচারীর সূক্ষ্মবুদ্ধি ও সন্ধান-তৎপরতায় মীমাংসিত হয়, তাহাকে ডিটেকটিভ গল্প বলে। Poe-র *The Purloined Letter*, *The Murders in the Rue Morgue* (*1941*), Conan Doyle-এর *The Red-Headed League*, Dorothy Sayers-এর *The Nine Tailors*, এবং বাংলায় পাঁচকড়ি দে, সুরেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

(১৫) বিদেশী পটভূমিকাযুক্ত গল্প—বাংলা তথা ভারতের বাহিরের বিদেশী পরিবেশের মধ্যে চিরকালের নরনারীর চরিত্রাঙ্কন করিয়া অনেকে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অবিনাশ চন্দ্র বসুর 'বম্বের মোহ', প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 'মাতৃহীন', রাখাল সেনের 'সহযাত্রা' স্মরণীয়।

উপন্যাস ও ছোটগল্পের পার্থক্য শুধু আকৃতিগত নহে, প্রকৃতিগতও, এই

কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। উপন্যাসের বিস্তৃত পটভূমি ইহার উপযোগী নহে, কারণ ছোটগল্প-লেখক সমগ্র জীবনের রূপ দান করেন না। ছোটগল্প স্বয়ং-সম্পূর্ণ এক প্রকার শিল্প-সৃষ্টি—ইহার পৌর্ব্বাপর্য্য নাই, ইহা জীবনের খণ্ডাংশের মহিমোজ্জ্বল কান্তি। অবশ্য, উপন্যাসে যত বিষয়ে আলোচনা হইতে পারে, এইখানেও তাহা সম্ভব, কিন্তু ছোট পরিধির মধ্যে। উপন্যাস বিস্তৃত, ছোটগল্প সংহত; উপন্যাসে পরিতৃপ্তি, ছোটগল্পে ব্যঞ্জনার অতৃপ্তি। উপন্যাস পাঠককে সবই বুঝাইয়া দেয়, ছোটগল্প তাহাকে বুঝিবার অবকাশ দেয়। সুতরাং যে-লেখক বৃহৎ আখ্যান-রচনায় সিদ্ধহস্ত, যিনি বহুবিধ চরিত্র-সৃষ্টিতে নিপুণ, এবং জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ আলোচনায় অনলস, তাঁহার পক্ষে ছোটগল্প-লেখক না হইয়া ঔপন্যাসিক হওয়া শ্রেয়ঃ। কিন্তু যিনি আখ্যানভাগ অপেক্ষা চরিত্র-সৃষ্টিতে অধিকতর পটু, যাঁহার পরিতৃপ্তি অপেক্ষা ইঙ্গিতের দিকেই লক্ষ্য বেশী, তাঁহার পক্ষে উপন্যাস না লিখিয়া ছোটগল্প লেখাই বিধেয়। এইজন্য যাহারা আত্মভাবপরায়ণ, তাহাদের ছোটগল্প যতখানি রস-নিবিড় হয়, অপরের ততখানি হয় না। এই প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচকের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি বিশেষভাবে স্মরণীয়—

উপন্যাস ও ছোটগল্প

"No man ought to embark upon a career of short story writing who is not aware that he himself lives a hundred short stories a day, and that he is not unlike anybody else in the world in this." অর্থাৎ গ্রন্থকার ব্যক্তি-জীবনে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা প্রসূত হইলেও তাঁহাব অভিজ্ঞতা যেন অন্য দশজনেরই মত হয়। আর একটি কথা, উপন্যাসে কোন বিষয় সম্বন্ধে যতটা বিচার-বিশ্লেষণ, তর্ক-বিতর্ক বা মতবাদ প্রচার চলে, ছোটগল্পে উহার স্বল্প অবয়ব হেতুই সেই জিনিষটি চলে না। যিনি গল্পকে প্রচারের বাহন করিতে চাহেন, তাহার শিল্প সৃষ্টি ব্যাহত হইবার সম্ভাবনাই অধিক। ছোটগল্প বর্দ্ধিতায়তন হইলে উপন্যাস হয় না। ছোটগল্পের আকার একটু বড় হইলে (যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের 'যুগলাঙ্গুরীয় বা সঞ্জীবচন্দ্রের 'দামিনী', রবীন্দ্রনাথের

'নষ্টনীড') তাহাকে অনেকে বড় ছোটগল্প (*Long Short Story*) বলিতে পারেন, কারণ আকার বিস্তৃত হইলেও উহার রস-পরিণাম একটিই। এই আকার যদি আরও বিস্তৃত হইয়া গল্পের রস-পরিণাম খণ্ডিত হইয়া উঠে, তবে উহা ক্ষুদ্র উপন্যাসের (*Novelette*) পর্য্যায়ে চলিয়া যাইতে পারে। Henry James-এর *The Turn of the Screw*, Stevenson-এর *Dr. Jekyl and Mr. Hyde*, বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' বা 'রজনী' এবং রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' এই শ্রেণীভুক্ত মনে করা যাইতে পারে।

কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, লেখক ছোটগল্পের আঙ্গিক-কৌশল অগ্রাহ্য করিয়া উহাকে গল্প-পরম্পরায় (*Sequence of Stories*) উপস্থাপিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে গ্রন্থকার ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ত ও সংহত রস-গাঢ়তার সহিত ঔপন্যাসিক লক্ষণ সংযোজিত করিয়া আখ্যানবস্তু বা চরিত্রের বিকাশ সাধন করেন। এই জাতীয় গল্প-সাহিত্যের মধ্যে Stevenson-এর *Arabian Night*, Conan Doyle-এর *Sherlock Holmes*-সংক্রান্ত গল্প-নিচয় এবং প্রমথ চৌধুরীর 'চার ইয়ারী কথা', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ঘনাদার গল্প', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ব্যোমকেশের ডায়েরী' স্মরণীয়।

বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্যে ছোটগল্প

আমাদের দেশের সঙ্কীর্ণ-পরিসর বৈচিত্র্যহীন জীবন-যাত্রার সহিত ছোটগল্পের একটি স্বাভাবিক সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য আছে। ইহা যেমন আমাদের সমাজ সম্বন্ধে খাটে, তেমনি আর একটি সাধারণ কারণ আছে, যে জন্য ছোটগল্পের প্রচলন সহজ হইয়াছে। আধুনিক যুগের মানুষের জীবনে অবসর কম, কাজ বেশী। সুতরাং ইহারই মধ্যে আনন্দ পাইতে হইলে তাহাকে সুবৃহৎ উপন্যাসের আশ্রয় গ্রহণ করাও সম্ভবপর নয়। ইংরেজী, ফরাসী, রুশীয় এবং আমেরিকান সাহিত্যে অতুলনীয় ছোটগল্প আছে। ইংরেজীতে ষ্টিভেন্‌সন্‌, হেনরী জেমস্‌, ওয়েল্‌স, বেনেট, ক্যাথারিন্‌ ম্যানস্‌ফিল্‌ড্‌, মম্‌, গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি, ডি. এইচ. লরেন্স; ফরাসীতে এনাটোল ফ্রাঁ, দোদে মোপাসা, ব্যালজাক; রাশিয়ায় গোগল, শেখভ, কুপ্রিন, আন্দ্রিভ্‌, টলষ্টয়; আমেরিকায় ই. এ. পো, ব্রেট্‌হার্ট, এবং ও. হেনরী প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখক।

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে ছোটগল্প লিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার গল্প আধুনিক ছোটগল্প বলিতে যে শিল্প-সৃষ্টি বুঝায়, তাহা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের পথ-প্রদর্শক ও শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা। 'আমাদের এই বাহ্যতঃ তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর জীবনের তলদেশে যে একটি অশ্রু-সজল ভাবঘন গোপন প্রবাহ আছে, রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য্য স্বচ্ছ অনুভূতি ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দ্দৃষ্টির সাহায্যে সেগুলিকে আবিষ্কার করিয়া পাঠকের বিস্মিত মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়াছেন।' তাঁহার কোন কোন গল্পে হাস্যরস বা কৌতুক-প্রিয়তা, কোথাও জীবনের গভীর সকরুণতা বা খণ্ডক্ষুদ্র ভুলভ্রান্তি অসামান্য কবিত্ব-সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। একটি মাত্র ভাবের সুর যেন তাঁহার গল্পকে কাব্যিক অনুভূতির মৃদু প্রলেপে আচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে গীতিকবিতার মাধুর্য্য দান করিয়াছে। ফলে, তাঁহার অধিকাংশ গল্পই গীতিকাব্যধর্ম্মী হইয়া উঠিয়াছে। জীবনের কুশ্রীতা নগণ্যতা রবীন্দ্র-কবিদৃষ্টিতে বিধৌত হইয়া নির্ম্মল রসচেতনায় একাকার হইয়া উঠিয়াছে, সেই শ্রেণীর রসচেতনা পরবর্ত্তী বাংলা গল্প-সাহিত্যে দেখা যায় না। একমাত্র শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পে বাংলার বঞ্চিত-বেদনা ভাষা পাইয়াছে এবং গল্পগুলি যেন হৃদয়াবেগের প্রেরণায় মর্ম্মস্পর্শী মূর্ত্তি লাভ করিয়া মানবতা বা মনুষ্যত্বের স্তুতিরূপে উর্দ্ধায়িত হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সাধনার মধ্যবর্ত্তীকালে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার গল্পে জীবনের ছোটখাটো ঘটনা হাস্যোজ্জ্বল কৌতুকরসিকতার সংযত অথচ লঘুকোমলস্পর্শে বিচিত্র রূপ লাভ করিয়াছে। প্রভাতকুমার গভীর বা মর্ম্মস্পর্শী বা একান্ত আত্মকেন্দ্রিক গীতিকাব্যধর্ম্মী না হইলেও, ছোটগল্পে একটী সহজ অথচ বিস্ময়কর এবং অভ্রান্ত পরিণতির অর্থ-ব্যঞ্জনা ও রূপকথা-সুলভ ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করিতে তাঁহার ক্ষমতা অনন্যসাধারণ। তাঁহার সূক্ষ্ম সংযমজ্ঞান ও স্বাভাবিকতাবোধই তাহাকে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। ছোটগল্প-সাহিত্যে বিশিষ্ট দৃষ্টি ও বাণীভঙ্গির পরিচয় দিয়াছেন প্রমথ চৌধুরী মহাশয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধে বলেন, 'গল্প-সাহিত্যে তিনি

ঐশ্বর্য্য দান করেছেন। অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে মিলেছে তাঁর অভিজাত মনের অনন্যথা, গাঁথা হয়েছে ভাষার শিল্পে'। পরবর্ত্তীকালে ভাবদৃষ্টি নয়, বাস্তবদৃষ্টিই গল্পের ভূষণরূপে পরিগণিত হইয়াছে এবং মানুষ অপেক্ষা মানুষের সমাজই গল্প-লেখকদের কাছে বড় হইয়া উঠিয়াছে।

এই ধরণের বাস্তবদৃষ্টি ও বস্তুতন্ত্রের সূত্রপাত শৈলজানন্দের কয়লাকুঠি-সংক্রান্ত গল্পেই প্রথম দেখা যায়। তারাশঙ্কর ও সরোজকুমার শৈলজানন্দের ধারারই অনুপন্থী হইলেও তারাশঙ্করের গৌরব ইঁহাদের অপেক্ষা বেশি। আধুনিক বাস্তবতামূলক সমস্যাকে গ্রহণ করিলেও তারাশঙ্কর ইহারই মধ্য দিয়া মনুষ্যত্বের গভীর রহস্যকে স্পর্শ করিয়াছেন। তাহার 'জলসাঘর' ও 'রসকলি' সার্থক সাহিত্য-রচনার নিদর্শনরূপে গৃহীত হইতে পারে। তারাশঙ্করের অধিকাংশ ছোটগল্প ও উপন্যাসের অন্যতম বিষয় বিলীয়মান মধ্যযুগীয় জমিদার বংশ। আধুনিক কালের সংস্পর্শে এই মধ্যযুগীয় সভ্যতার পরাজয় যেমন তারাশঙ্করের দৃষ্টির যথার্থতা প্রতিপন্ন করে, নূতন সভ্যতাকে গ্রহণ করিবার ঔদার্য্য এবং আধুনিকতাও তেমন তাহার প্রতিভার বিশিষ্টতাকে প্রতিপন্ন করে। মানব জীবনের 'বিন্দুবিসর্গ' অবলম্বনে 'বনফুল' যে-শ্রেণীর নাতিদীর্ঘ ব্যঞ্জনা-দীপ্ত গল্প রচনা করিয়াছেন, বাংলা সাহিত্যে তাহা অভিনব।

রোমাণ্টিক কল্পনা-স্নিগ্ধ সুকুমার গল্পরচনায় মণীন্দ্রলাল বসু, শরবিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোজ বসু দক্ষতা দেখাইয়াছেন। বাংলার প্রকৃতিকে রোমাণ্টিক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিবার যে নৈপুণ্যের পরিচয় বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়াছেন, তাহাই তাঁহার খ্যাতি অনির্ব্বাণ রাখিবে। অকুণ্ঠ বাস্তবনিষ্ঠ গল্প লেখকদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য সেন ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে বুদ্ধদেবের আদর্শ ডি. এইচ. লরেন্স ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ ব্যালজাক্। হাস্যরসাত্মক গল্পরচনায় রাজশেখর বসু, বিভূতি মুখোপাধ্যায় ও অমূল্য দাশগুপ্ত শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' ও 'পরশুরামের কুঠার' বাংলা গল্প-সাহিত্যে বাস্তবনিষ্ঠতার একটি বিশেষ স্তর সূচনা করিতেছে। মানুষের মনোবৃত্তি বিশ্লেষণে তিনি কঠোর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নির্ম্মম সততার পরিচয় দিয়াছেন।

প্রবন্ধ-সাহিত্য

গদ্য সাহিত্যে প্রবন্ধের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, এই বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। Saintsbury প্রবন্ধকে '*work of prose art*' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সাধারণতঃ কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া লেখক কোন বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যে আত্মসচেতন নাতিদীর্ঘ সাহিত্য-রূপ সৃষ্টি করেন, তাহাকেই প্রবন্ধ বলা হয়। প্রবন্ধের ভাষা ও দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে বৈচিত্র্য থাকিলেও ইহা সাধারণতঃ গদ্যে, এবং নাতিদীর্ঘ করিয়া লিখিতে হইবে। অবশ্য, Lockeএর *An Essay on the Human Understanding*, Mill-এর *Liberty*, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র বা 'কমলাকান্তের দপ্তর' এবং শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য' পড়িলে মনে হইবে যে, দৈর্ঘ্য ইহার পক্ষে অশোভন নয়। Pope-এর *Essay on Man* বা সুরেন্দ্র মজুমদারের 'মহিলাকাব্য', কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'প্রবাসীর জন্মভূমি দর্শন', সত্যেন দত্তের 'আমরা', কালিদাস রায়ের 'আসাম' কবিতাকারে প্রবন্ধ বিশেষ। সুতরাং প্রবন্ধ পদ্যে লেখা যাইতে পারে না, এমন কথা বলাও সঙ্গত হইবে না। কিন্তু সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়া গদ্যে লিখিবার রীতিটিই সর্ব্বদেশে গৃহীত হইয়াছে।

প্রবন্ধ-সাহিত্য

প্রাচীন সাহিত্যে Platoর কথোপকথন (*Dialogues*), Pliny এবং Senecaর পত্রাবলী, Plutarch-এর নৈতিক রচনাবলী, Ciceroর *De Senectute*, Marcus Auerelius-এর *Meditations*-এ প্রবন্ধের লক্ষণই বিদ্যমান। Dryden-এর *An Essay of Dramatic Poesy*, Oscar Wilde-এর *The Critic as an Artist* এবং রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত'-এর কয়েকটি রচনা কথোপকথনের আকারে পরিবেশিত হইলেও উহারা মূলতঃ

প্রবন্ধই। Donne-এর *Sermons* বা রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন'-গ্রন্থের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতাবলী, এমনকি 'স্ত্রীর পত্র' নামক তাঁহার ছোটগল্পটিও প্রবন্ধের সগোত্র। ইহাতেই বুঝা যাইবে যে, প্রবন্ধের রূপ-বন্ধ কত বিচিত্র। স্মৃতি-কথামূলক রচনা (যেমন রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি'), আত্মচরিত জাতীয় রচনা, চিঠিপত্র (যথা, রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র', 'চিঠিপত্র') বা ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা (যথা, বিদ্যাসাগরের 'ব্রজবিলাস') প্রভৃতিও ছদ্মবেশী প্রবন্ধ মাত্র।

সাহিত্যের যাহা চিরন্তন উদ্দেশ্য—সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি ও আনন্দ দান, তাহাই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, ইহা বলাই বাহুল্য। 'বস্তুনিষ্ঠ' প্রবন্ধ আমাদের বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণতর দৃষ্টিকে সমুজ্জ্বল ও জ্ঞানের পরিধিকে প্রশস্ত করিয়া তোলে ও মন্ময় বা 'ব্যক্তিগত' প্রবন্ধ জ্ঞানের বিষয়কে হাস্যরসমণ্ডিত পুষ্প-পেলবতা দান করিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করে।' *Wisdom in a smiling mood*' পরিবেশনই এই জাতীয় আধুনিক প্রবন্ধকারের বিশেষত্ব। অধিকন্তু, শেষোক্ত শ্রেণীর প্রবন্ধ পাঠকের চারিদিকে একটি নিভৃত ভাবমণ্ডল (*atmosphere*) সৃষ্টি করে। উহাতে লেখকের কম্পমান ব্যক্তি-চিত্ত অসীম আকুতি রূপে পাঠকের প্রাণস্পর্শ করে।

বিষয়মাত্রই চিরপুরাতন ও সীমাবদ্ধ; ভঙ্গীই তাহাকে চলিষ্ণু ও প্রাণবান করিয়া তোলে। প্রবন্ধ সাহিত্যের বিচারে তাই এই বিষয়বস্তুর ও প্রকাশের

শ্রেণী-বিভাগ
তন্ময় ও মন্ময় প্রবন্ধ

ভঙ্গীই মুখ্য। বিষয়বস্তুর প্রাধান্য স্বীকার করিয়া যে সকল বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ লিখিত হয়, তাহাদিগকে তন্ময় বা বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ (*Formal or Informative Essay*) বলা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর প্রবন্ধ কোন সুনির্দ্দিষ্ট সুচিন্তিত চৌহদ্দি বা সীমারেখার মধ্যে আদি, মধ্য ও অন্ত-সমন্বিত চিন্তা-প্রধান সৃষ্টি। লেখক 'গরু' সম্বন্ধে লিখিতে বসিয়া 'গোপালক' সম্বন্ধে একটি কথাও ইহাতে বলিবেন না। কারণ, তাঁহাকে অতিমাত্রায় সংযত ও নিষ্ঠাবান হইতে হইবে। ইহাতে লেখকের পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি বা জ্ঞানের পরিচয়ই মুখ্য হইয়া উঠে। এই জাতীয় প্রবন্ধে লেখকের ব্যক্তি-চিত্তের সহিত পাঠকের বুদ্ধির যোগ হইতে পারে, কিন্তু তাহার হৃদয়ের সহিত কোন সংযোগ সাধিত হয় না। লেখক অধিকাংশ সময় ইহাতে তাঁহার জ্ঞানের

পরিধি দেখাইয়া আমাদিগকে বিস্মিত করেন অথবা তাহার অনন্যসাধারণ চিন্তাশীলতা বা বুদ্ধির প্রখরতায় বিস্মিত করেন। তাঁহার স্থান পাঠকের সহিত একাসনে নহে, তিনি যেন বেদীর উপর সমাসীন আচার্য্য বা গুরুদেবের মত পাঠককে নেহাৎ অপোগণ্ড শিশু মনে করিয়া জ্ঞানের আলো-কণিকা বিতরণ করেন। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার দত্ত ও রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কোন বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা-ভূয়িষ্ঠ গ্রন্থ (*Treatise* বা *Monograph*), জীবনচরিত, বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক—আলোচনা-মূলক রচনা বা সম্পাদকীয় প্রবন্ধ—এই শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে।

আর এক শ্রেণীর প্রবন্ধে লেখকের ব্যক্তি-চিন্তা অপেক্ষা ব্যক্তি-হৃদয়ই প্রধান। ইহাদিগকে মন্ময় বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ (*Familiar* বা *Intimate Essay*) নামে অভিহিত করিতে পারি। Montaigne এই শ্রেণীর প্রবন্ধের প্রথম শিল্পী। ব্যক্তিগত সৌরভই তাঁহার *Essais*-এর (১৫৮০) শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। ইহারা বস্তুনিষ্ঠ নয়, ব্যক্তি-নিষ্ঠ; চিন্তাপ্রধান নয, ভাবপ্রধান। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ আমাদেব বুদ্ধি চিন্তা বা জ্ঞানের পিপাসা মিটায়, কিন্তু ব্যক্তিগত প্রবন্ধ জ্ঞানের বিষয়কে পর্য্যন্ত লঘুকল্পনা-প্রদীপ্ত করিয়া হাস্যোচ্ছল রূপে আমাদিগকে মুগ্ধ করে। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ গুরুগম্ভীর প্রশ্ন বা জীবন-সমস্যা অবলম্বনে সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়া মীমাংসার সন্ধান করিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিগত প্রবন্ধবিদ্ বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য্যকে আত্মগত ভাবরসে স্নিগ্ধ করিয়া পাঠকের চারিদিকে সুন্দর, শান্ত ও কান্ত একটি ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করেন। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধে লেখকের বিচারবুদ্ধি ও চিন্তাশীলতা প্রধান, ব্যক্তিগত প্রবন্ধে লেখকের অনুভূতি-স্নিগ্ধ সরস হাস্য-মধুর আত্ম-স্পর্শ প্রধান। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধে লেখক নিজেকে পাঠকের কাছে প্রতিষ্ঠিত করেন, ব্যক্তিগত প্রবন্ধে লেখক পাঠকের সহিত অভিন্ন হইয়া, একান্ত আপনার জনের মত আপনার কথাটি বলিয়া যান। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধে লেখক আত্মপ্রচার করেন, ব্যক্তিগত প্রবন্ধে আত্ম-নিবেদন করেন; একজনকে আমরা শ্রদ্ধা করি, আর একজনকে ভালবাসি।

মন্ময় ব্যক্তিগত প্রবন্ধ

বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধের আলোকে আমাদের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইতে পারে, ব্যক্তিগতপ্রবন্ধের মৃদু আলোক-রেখায় আমরা একটি বিশেষ লোককে চিনিতে পারি, এবং সেই 'আলোকে নিজেরে চিনি'। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সাধারণতঃ গুরুগম্ভীর, কিন্তু ব্যক্তিগত প্রবন্ধের বিষয়বস্তু আকাশের তারকা হইতে মাটির প্রদীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং পরমপিতা পরমেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া দীনতম উপলখণ্ড পর্য্যন্ত ইহার বিষয়ীভূত হইতে পারে। সেইজন্য Robert Lynd বলেন—

'Sometimes it is neraly a sermon, sometimes it is nearly a short story. It may be a fragment of autobiography, or a piece of nonsense. It may be satirical or vituperative or sentimental. It may deal with any subject from the Day of Judgement to a pair of scissors'.

এবং T. G. Williams বলেন—

The essay serves for exposition, for debate, for persuasion, for satire as well as for diversion and it can contract itself to the dimensions of a newspaper paragraph or enlarge itself into a volume.

অতি পুরাতন, অতি-পরিচিত বিষয়কে এই শ্রেণীর প্রবন্ধবিদ্ আত্মনিষ্ঠ কল্পনা দ্বারা রঞ্জিত করিয়া প্রকাশ করেন, কারণ বলিবার ভঙ্গীই তাঁহার নিকট চরম। তিনি একান্তভাবে আত্মনিষ্ঠ, অকপট ও খেয়ালী। সুনির্দ্দিষ্ট সীমার বন্ধন তাহার পক্ষে বরং পীড়াদায়ক, তাই তিনি বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে অবলীলাক্রমে পর্য্যটন করেন। এমনও হইতে পারে যে, প্রবন্ধকার 'হ্রদ' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া সমুদ্র-সন্দর্শন করেন, আবার সমুদ্র-স্নান শেষ করিয়া বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া 'বেলা যায়' কবিতা স্মরণ করেন। অথবা, 'ভুবনেশ্বরের মন্দির' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে ভুবনেশ্বরের 'নাক্সভমিকা' গাছের দিকে চাহিয়া তিনি নিজের অগ্নি-মান্দ্যের কথা স্মরণ করতঃ হ্যানিম্যানের গুণকীর্ত্তন করেন ; আবার, 'নাক্সভমিকা' হইতে 'চায়না'র গুণাগুণ বর্ণনান্তে সহসা যখন তিনি চীন-জাপানের রণোন্মত্ততায় নিজেকে হারাইয়া ফেলেন, তখনও আমাদের এতটুকু ক্লান্তি আসে না। তাহার স্বতঃস্ফূর্ত্ত অথচ আপাত-অসংলগ্ন স্বগতোক্তি-মূলক রস-কল্পনায়—ডাঃ জনসন

যাহাকে *loose sally of the mind* বলেন—আমরা বিস্মিত ও আনন্দিত হই। সুতরাং বলা যাইতে পারে—

'The mere egotism of the author freely confessed or subtly dissembled forms the chief delight of the essay—and the thoughts of the author at length become the thought of the reader, his passions become our passions, his humours ours, his vices and follies ours'.

বলা বাহুল্য, ইংরেজীতে যেমন সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বিষয়ে জ্ঞানের প্রবন্ধ আছে, বাংলাতেও সেই ধরণের প্রবন্ধের অভাব নাই। কিন্তু আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যে যে ধরণের মন্ময় প্রবন্ধের বিস্ময়কর প্রাচুর্য্য, সে-ধরণের প্রবধ বাংলায় নাই বলিলেই চলে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তবে'—যাহাকে অন্যত্র আমি বাঙ্গালার 'জীবন-বেদ' বলিয়াছি, তাহাতে যে ব্যক্তি-নিষ্ঠতা বা মন্ময়তা আছে, তাহাও বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তি-চিত্ত ও জাতি-চিত্তের সমন্বযে পরিস্ফুট—নিছক আত্ম-নিষ্ঠতা সেইখানে পরিপূর্ণ রূপে মূর্ত্ত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের গিরিশিখর-শায়িনী কবি-প্রতিভা ইহার উপযোগী নহে। 'বীরবলে বুদ্ধি আছে, শ্লেষ আছে, বাকবৈদগ্ধ্য আছে, কিন্তু কোথায় যেন হৃদয়ের স্পর্শের অভাব রহিয়াছে'। আধুনিক দুই একজন সুরসিক সাহিত্যিক আত্মকথার ধরণে নিবন্ধ লিখিয়া এই শ্রেণীর প্রবন্ধের সম্ভাবনা প্রদর্শন করিয়াছেন।

বাংলায় এই জাতীয় প্রবন্ধের দৈন্যের যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়াও আমাদের বিশ্বাস। বাঙ্গালী সাধারণতঃ ভাবপ্রবণ ও অধ্যাত্মবাদী। জীবনকে সহজ সরল রস-দৃষ্টির মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ করিতে যেন আমাদের প্রাণ সায় দেয় না। জীবনকে গভীর করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি যেমন আমাদের জাতিগত দার্শনিকতার পরিচায়ক, জীবনের আনন্দ-বেদনাকে লঘুকান্তি-হাস্যোজ্জ্বল করিয়া দেখিবার অক্ষমতাও আমাদের জাতীয় জীবনে হাস্যরসের একান্ত অসদ্ভাবের পরিচায়ক। এই জন্যই আমাদের দেশে Lamb, Chesterton, E. V. Lucas, Alpha of the Plough, Robert Lynd, Belloc বা Jerome. K. Jeromeএর মত প্রবন্ধ লেখা তেমন চলিতেছে না। আর একটি কারণেও ব্যক্তিগত প্রবন্ধ আমাদের

দেশে হইতেছে না। আমাদের দেশে কোন লেখক ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে রস-সাহিত্য সৃষ্টি করিলে অনেকেই তাহাকে ভুল বুঝিতে পারেন। বাঙ্গালী পাঠক সাধারণতঃ লেখকের মধ্যে আদর্শের মহিমা সন্ধান করেন; লেখকও যে দোষগুণে মানুষ এবং তাহার ব্যক্তি-চরিত্রের দুর্ব্বলতা-প্রসূত রস-সৃষ্টিও যে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখিবার যোগ্য, এই কথা অনেকেই ভাবিয়া দেখেন না।

Belles-Lettres

Belles-Lettres (রম্য রচনা) শব্দটি খুব সম্ভব Swift ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম ব্যবহার করেন (১৭১০)। প্রাচীন কালে ব্যাকরণ-শাস্ত্র, বাগ্মিতা ও কাব্যকলাকেই 'রম্যরচনা' বলা হইত। পরবর্ত্তী কালে Belles Lettres বলিতে কল্পনা-কান্ত ও শিল্প-সঙ্গত যে-কোন সাহিত্যকেই বুঝানো হইত। প্রবন্ধ বা সমালোচনা-সাহিত্যও রম্য-রচনার অন্তর্গত বলিয়া মনে করা হয়। আধুনিক কালে বাংলায় 'রম্যরচনা' বলিতে এক শ্রেণীর লঘু কল্পনাময় হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধকে বুঝায়। কিন্তু 'রম্যরচনা' ও 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধে' পার্থক্য সুস্পষ্ট। 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধ' রমণীয় রচনা বলিয়া 'রম্যরচনা' রূপে পরিগণিত হইতে পারে, কিন্তু 'রম্যরচনা' ব্যক্তিগত না-ও হইতে পারে। ব্যক্তিগত প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি (পৃঃ ১৭০)। আধুনিক রম্যরচনা (*Belles-Lettres*) সম্বন্ধে জনৈক বিখ্যাত সমালোচক বলেন—

"Modern usage applies the word more often to the '*little hills* than to the *mountain peaks* of literature and denotes the *essay* and the *critical study* rather than the epics of Homer or the plays of Shakespeare."*

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রম্যরচনা যাহারা লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বীরবল, যাযাবর, বিরূপাক্ষ, সৈয়দ মুজতবা আলী প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

প্রবন্ধের মধ্যে লেখকের ব্যক্তিত্ব-সৌরভ সঞ্চার করিবার ক্ষমতার উপরই ব্যক্তিগত প্রবন্ধের উৎকর্ষ নির্ভর করে। লেখক গীতিকবির ন্যায় আত্মসচেতন

---

* *Encyclopaedia Britannica*

ও অহংবিদ্ধ কল্পনাপ্রবণ। তাই বলিয়া তাঁহার অহমিকা পাঠককে পীড়া দেয় না, তাঁহার সহিত আত্মীয়তা সৃষ্টি করে। লেখকের ব্যক্তিগত ভাবনা-কামনা ও জীবন-দর্শন এমন ভাবে প্রবন্ধে রূপায়িত হইয়া উঠে যে, পাঠক উহাকে নিজের ব্যক্তিগত ভাবনাচিন্তা বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হয়। তাঁহার হাসি পাঠককে হাসায়, তাঁহার বেদনা পাঠকের চিত্তেও কৃষ্ণ রেখা টানিয়া দেয় এবং তাঁহার প্রেমকাহিনী পাঠককে প্রেমোৎফুল্ল করিয়া তোলে। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ এমন গভীরভাবে আত্ম-ধ্যানমূলক বলিয়াই ইহাকে অনেকে *Lyric in prose* বা গীতিধর্ম্মী গদ্যরচনা নামে অভিহিত করেন।

ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ও অন্যান্য সাহিত্যিক রূপ-কর্ম্ম

ব্যক্তিগত প্রবন্ধ-শিল্পী রোমান্স স্রষ্টা নহেন। কারণ, রোমান্সের উপজীব্য অসম্ভব ও কাল্পনিক বিষয়বস্তু; ব্যক্তিগত প্রবন্ধের বিষয়বস্তু জীবনের বাস্তবানুভূতি। ঐতিহাসিক যেমন জীবনকে ঘটনাপরম্পরার মধ্য দিয়া দেখেন, এই শ্রেণীর প্রবন্ধ-শিল্পী তেমনটি দেখেন না। জীবনের সীমাহীন ঘটনাপুঞ্জের যে কোন একটাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট। দার্শনিক যেমন জীবনের পরম সত্য উদ্‌ঘাটনে আত্মনিয়োজিত, তিনি তদ্রূপও নহেন ; ঔপন্যাসিক যেমন জীবনের বর্ণনাত্মক রূপ-সৃষ্টি করেন, তিনি তাহাও করেন না এবং নাট্যকারের মত জীবনকে কর্ম্মময় শোভাযাত্রার মধ্য দিয়াও প্রকাশ করেন না। কিন্তু তাঁহার আত্ম-ধ্যানে ইঁহাদের প্রত্যেকেরই স্পর্শ থাকিতে পারে। জীবনের বৈচিত্র্যের মধ্যে সুর-সঙ্গতি সন্ধান তাঁহার কাম্য নয়—তিনি শুধু অপরূপ জীবনকে দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া যান এবং অপরূপের সৌন্দর্য্য যেখানে যতটুকু ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাই গ্রহণ করেন এবং জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার ও বেদনা-মধুরতার বিস্ময়-রহস্যকে আপন মনের মমতা-মেদুর মৃদু আলোক-সম্পাতে উজ্জ্বল করিয়া তোলেন।

শ্রীরামপুরের মিশনারীগণই প্রথমে ধর্ম্মপ্রচারার্থে প্রবন্ধ-সাহিত্য সৃষ্টি করেন। তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টা ব্যাহত করিবার জন্য রাজা রামমোহন

রায়ের (১৭৭৪—১৮৩৩) বেদান্তসূত্র (১৮১৫) প্রকাশিত হয়। মার্শম্যান, কেরী, রবিনসন, পিয়ার্সন প্রভৃতি মিসনারীগণ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বাক্‌বিতণ্ডায় যোগদান করিতে গিয়া শিক্ষা বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ১৮১৭ সালে প্রকাশিত

বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য

মৃত্যুঞ্জয়ের 'বেদান্তচন্দ্রিকা' অনেকাংশে প্রবন্ধ-লক্ষণাক্রান্ত। এই যুগের অন্যান্য প্রবন্ধ-সাহিত্যের মধ্যে কিমিয়া বিদ্যার সার, ঐন্দ্রজালের ইতিহাস, জ্যোতিষ গোলাধ্যায়, ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা, বিজ্ঞানসেবধি প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। তবে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ বা রামমোহন যে-ধরণের প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা সাহিত্য-গুণোপেত নয় বলিয়া প্রবন্ধ-সাহিত্যে ইহাদের মূল্য ঐতিহাসিক মাত্র। উনবিংশ শতাব্দীর প্রবন্ধ-সাহিত্য পুষ্টির দিক দিয়া কেরী-সম্পাদিত 'দিগ্‌দর্শন', মার্শম্যান সম্পাদিত 'সমাচার দর্পণ', ঈশ্বরগুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র দানও এই স্থলে স্মরণীয়।

ইঁহাদের পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের (১৮২০—৯১) 'আত্মচরিতে' তাঁহার ব্যক্তি-হৃদয় সাবলীল ও প্রসাদগুণসম্পন্ন হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সাহিত্য গুণোপেত, তাল-লয়-সমন্বিত প্রসাদগুণ বিশিষ্ট বাংলা গদ্যের তিনিই জনক। বোধোদয়, শকুন্তলা, সীতার বনবাস তাহার অবিস্মরণীয় গ্রন্থ। অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮২০—১৮৮৭) চারুপাঠ (তিন খণ্ড), বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় প্রভৃতি প্রবন্ধ পুস্তক তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্য‍ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। তাহার ভাষা লালিত্যপূর্ণ না হইলেও সরল এবং সহজবোধ্য। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৫—১৮৯৪) 'পারিবারিক প্রবন্ধ' ও 'সামাজিক প্রবন্ধ' সহজ সরল পরিচ্ছন্ন ভাষায় লোকশিক্ষার উপযোগী প্রবন্ধ-গ্রন্থ। হাস্য-পরিহাসকুশল রাজনারায়ণ বসুর (১৮২৬—১৯০০) 'সেকাল আর একাল', রামগতি ন্যায়রত্নের (১৮৩২—৯৫) সমালোচনামূলক 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮—৯৪) ধর্ম্ম,

অর্থনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, সমালোচনা প্রভৃতি নানাবিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার 'বিবিধ প্রবন্ধ' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের মিতাক্ষরগাঢ় ভাষা আজ পর্য্যন্ত বাংলা গদ্য-সাহিত্যে তুলনাহীন। দার্শনিক প্রবন্ধ হিসাবে দ্বিজেন্দ্র ঠাকুরের (১৮৪০—১৯২৬) 'তত্ত্ববিদ্যা' ও 'গীতাপাঠের ভূমিকা' উল্লেখযোগ্য। কালীপ্রসন্ন ঘোষের (১৮৪৩—১৯১০) চিন্তামূলক 'প্রভাত চিন্তা' 'নিশীথচিন্তা' 'নিভৃতচিন্তা' এবং হাস্যরসাত্মক 'প্রমোদ লহরী' ও 'ভ্রান্তিবিনোদ' প্রবন্ধ-সাহিত্যে স্মরণীয়। কালীপ্রসন্নের ভাষা ওজস্বিনী ও তাঁহার প্রবন্ধ গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। চন্দ্রনাথ বসুর (১৮৪৫—১৯১১) 'শকুন্তলাতত্ত্ব', 'সংযমশিক্ষা' ও 'ত্রিধারা' মূল্যবান প্রবন্ধ পুস্তক। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর (১৮৫৩—১৯৩১) শিক্ষা, সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধমালা এবং 'তৈলদান' নামক লঘু রস-রচনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই যুগের অন্যান্য প্রবন্ধ সাহিত্যের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধ্যাত্ম-উপলব্ধিমূলক 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান', রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'নানাপ্রবন্ধ', ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভয়ের কথা' ও রজনী গুপ্তের 'আর্য্যকীর্ত্তি' শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। ইহাদের পর রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১)। সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্বদেশ, ধর্ম্ম, সাহিত্য-বিচার প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধে কোথাও তত্ত্ব, কোথাও তথ্য, আবার কোথাও সূক্ষ্ম অনুভূতি বা যুক্তি-নিষ্ঠা মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্রই রবীন্দ্র-মানসের বিশিষ্ট কবি-দৃষ্টি প্রবন্ধকে কাব্য-শ্রী দান করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পাঠে আমরা বিস্মিত, মুগ্ধ ও বিমোহিত হই, কিন্তু কখনো রবীন্দ্রনাথের সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার নিজের সুখদুঃখের ভাগী হইতে পারি না; 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধে' যে হৃদয়ের স্পর্শ থাকে, তাহা অপেক্ষা বুদ্ধির দীপ্তি ও ভাবৈশ্বর্য্যের সূক্ষ্মতাই তাঁহার প্রবন্ধে বেশি পরিলক্ষিত হয়। একমাত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭০-৯৯) প্রবন্ধে একটি নিরাভরণ সলজ্জ ব্যক্তি-সৌরভ আন্তরিকতাপূর্ণ ভাষায় মন্ময় রূপ লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্র-যুগের অন্যান্য প্রবন্ধ সাহিত্যের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের 'কালিদাসও ভবভূতি',

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' (১৮৭৬), বীরেশ্বর পাঁড়ের 'ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত', রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর (১৮৬৭—১৯১৯) 'চরিত কথা', 'কর্ম্মকথা', 'জিজ্ঞাসা', জগদানন্দ রায়ের 'আলো', 'প্রকৃতি পরিচয়', জগদীশ বসুর 'অব্যক্ত', ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলা-তত্ত্ব' ও রস-প্রবন্ধ 'রসকরা', 'ব্যাকরণ বিভীষিকা' উল্লেখযোগ্য। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের প্রবন্ধ-সাহিত্যিকদের প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮—১৯৪৬) হাস্যরসাত্মক সূক্ষ্ম বুদ্ধিনিষ্ঠ প্রবন্ধাবলী, মোহিতলালের সমালোচনামূলক প্রবন্ধসমূহ ও রাজশেখর বসুর কয়েকটী প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১১

সমালোচনা

সাহিত্যের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিচারমূলক সম্যক আলোচনাকে সাধারণভাবে 'সমালোচনা' নামে অভিহিত করা হয়। সম্যক আলোচনা বলিতে সাহিত্যের ভাব, বস্তু, রীতি, অলঙ্কার ও স্রষ্টার বিশিষ্ট মানস-দৃষ্টি প্রভৃতির সামগ্রিক আলোচনাকেই বুঝায়। সাহিত্য-সমালোচনা এত বিভিন্ন পদ্ধতিতে অনুসৃত হয় এবং একই সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক সময় দুইজন মনীষীর এত মতানৈক্য দৃষ্ট হয় যে, উহার শিল্প-সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কোন মীমাংসায় উপনীত হওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। বীক্ষণাগারে (*Laboratoy*) দুই বিভিন্ন মনোবৃত্তি সম্পন্ন দুইজন বিজ্ঞানী কোন বৈজ্ঞানিক সত্য বিশ্লেষণ করিয়া একই সত্যে উপনীত হইতে পারেন। কিন্তু সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে তেমনটি সম্ভব নয়। এই জন্যই বলা হয়—'No two people have ever read the same novel or the same play'. সমালোচনার ক্ষেত্রে এই মতবিরোধের কারণ বোধ হয় এই যে, দুইজন লোক শিক্ষা, দীক্ষা ও জ্ঞানগরিমায় তুল্য হইলেও তাঁহাদের রুচির

সমালোচনা ও সমালোচক

পার্থক্য হওয়া অসম্ভব নয়। আর একটী কারণেও উক্ত মতদ্বৈধতা হওয়া অসম্ভব নয়। সমালোচকের সহৃদয়তা, কল্পনা-শক্তি, অন্তর্দ্দৃষ্টি ও উদারতা এই কয়েকটী গুণ থাকা বাঞ্ছনীয়। ইহাদের অভাবে অনেক পুঁথিগত সমালোচক সাহিত্যের মূল্য নিরূপণ করিতে গিয়া শুধু ব্যক্তিগত মতামতকে সমালোচনার নামে চালাইতে চাহেন। এই ধরণের সমালোচনার কোন মূল্য না থাকিলেও, মোটের উপর, সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। সত্যকার সমালোচনা পথভ্রষ্ট সাহিত্যিককে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাকে দৃষ্টিদান করে, এবং সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি শাণিত ও অনুভূতি জাগ্রত করে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সহৃদয়তা, রসবোধ ও উদারতা সমালোচকের প্রধান গুণ। সহৃদয়তা ব্যতীত কোন কবি বা সাহিত্যিক জীবনের যেই রূপটী যেমন করিয়া দেখিয়াছেন, সেই রূপটী তেমন করিয়া দেখা সম্ভব হয় না; এবং উদারতা না থাকিলেও কোন সাহিত্যের মর্ম্মমূলে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা সহজসাধ্য হইতে পারে না। রসবোধ ব্যতীত সাহিত্যের সৌন্দর্য্য আস্বাদন সম্ভব নয়। এতদ্ব্যতীত, সমালোচককে শিক্ষিত, সংস্কৃতিমান ও সাহিত্যবোধ সম্পন্ন হইতে হইবে। এই সাহিত্যবোধ বা রসবোধ সাধারণতঃ শিক্ষার দ্বারা সঞ্চারিত হয় না, ইহা অনেকটা প্রাক্তন।

সাহিত্যে যেমন গ্রন্থকারের আত্ম-প্রকাশ, সমালোচনায়ও তেমন সমালোচকের আত্মমুক্তি। সমালোচক আত্মমুক্তির মধ্য দিয়া পাঠককে 'লেখকের মনের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন।' কিন্তু এই আত্মমুক্তি নিছক ব্যক্তিগত নয়; ব্যক্তিগত কাব্যানুভূতি যতক্ষণ পর্য্যন্ত সর্ব্বমানবের প্রত্যয়-আলোকে বিভাসিত নব-সৃষ্টিতে মূর্ত্ত না হইল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহা সত্যকার সমালোচনার পর্য্যায়ে উন্নীত হয় না।

সমালোচনা সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত যে সকল পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে আলোচনা করা হইল—

(১) আলঙ্কারিক পদ্ধতি (*Analytical Method*)—কাব্য-বিচারে যাহারা কাব্যের শব্দ ও অর্থালঙ্কারের আস্বাদন করেন, তাঁহারা এই পদ্ধতি

অনুসরণ করেন। ইঁহাদের মতে কাব্যের প্রয়োজনীয়তা শুধু অলঙ্কারের চারুতায়। 'কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ'।

এইরূপ বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, ইহা সাহিত্যকে সমগ্রতায় দেখে না; ইহা ভুলিয়া যায় যে, সাহিত্যের বিষয়-বস্তু যে বিশিষ্ট সালঙ্কার-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, উহার সর্ব্বাঙ্গীণতা অবিভাজ্য।

(২) ঐতিহাসিক পদ্ধতি (*Historical Method*)—যে-সমালোচনা যুগচিত্ত, পারিপার্শ্বিক ও গ্রন্থকারের ব্যক্তি-মানস কাব্যবিশেষে কতখানি মূর্ত্ত হইয়াছে, ইহার বিচার করে, তাহা ঐতিহাসিক পদ্ধতি শ্রেণীভুক্ত। যুগচিত্ত ও পারিপার্শ্বিক গ্রন্থকারের ব্যক্তি-মানসকে প্রভাবিত করিতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু শুধু এই বিচারেই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয় না। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক যুগচিত্ত ও পারিপার্শ্বিককে নিজের মনের জারক রসে রসায়িত করিয়া যে যুগ ও কালাতীত সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারেন, এই পদ্ধতি তাহা উপলব্ধি করে না। এতদ্ব্যতীত, এই পদ্ধতি অনেক সময় অতিরঞ্জনের দ্বারা কোন কোন কাব্যকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে বলিয়া ইহা নিরাপদ নয়। 'নূতন সাহিত্য সমালোচনায়' শ্রীবিনয় ঘোষ এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন।

(৩) সনাতনবিধি-সম্মত পদ্ধতি (*Classical Method*)—সাহিত্য-বিচারে উহার বহির্গত কতকগুলি সনাতন বা প্রাচীন নিয়মাবলীর সাহায্যে সমালোচনা এই পদ্ধতিমূলক। এই পদ্ধতি অতিশয় রক্ষণশীল মনোবৃত্তি-সম্পন্ন এবং ইহা ভুলিয়া যায় যে, সাহিত্য শুধু গ্রন্থকারের ব্যক্তি-অনুভূতি ও সৃষ্টি-কর্ম্ম-নিয়মাধীন, এবং উহার বহির্গত নিয়মে সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব নয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'মেঘদূত' সনাতন-বিধি-সম্মত সমালোচনা।

(৪) মনস্তত্ত্ব-মূলক পদ্ধতি (*Psycho-analytical Method*)—যে-সমালোচনা পদ্ধতি সাহিত্যবিচারে গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত জীবন বা তাঁহার নির্জ্জান মনের ছাপ সাহিত্যে কতখানি মূর্ত্ত হইয়াছে, ইহার বিচার করে, তাহা এই পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত। বলা বাহুল্য, এই সমালোচনা সাহিত্যের নয়, বরং

সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত জীবন বা চরিত্রের সমালোচনা মাত্র। ইংরেজী সাহিত্যে Herbert Read এই শ্রেণীর সমালোচক।

(৫) ব্যক্তিগত সমালোচনা (*Personal Criticism*)—যে-সমালোচনায় গ্রন্থবিশেষ সমালোচকের নিকট কেমন লাগিয়াছে, এই কথাটাই বড় হইয়া উঠে, তাহাকে ব্যক্তিগত সমালোচনা কহে। সাহিত্যবিচারে সমালোচকের ব্যক্তিগত ভাল-লাগা-না-লাগা কথাটী উপেক্ষনীয় নয় বটে, কিন্তু দেখিতে হইবে, সমালোচকের শিক্ষা, সংস্কৃতি, দৃষ্টি, উদারতা ও সাহিত্যবোধ উপযোগী কিনা। যোগ্যতমের ব্যক্তিগত সমালোচনায় যেখানে 'personal impression' সর্ব্বজনীন রূপ লাভ করিয়াছে, তাহা মোটেই উপেক্ষনীয় নয়। অধিকারহীন সমালোচকের সাহিত্যবিচার অনেক সময়ই স্পর্দ্ধিত আস্ফালনে পর্য্যবসিত হইতে পারে এবং ব্যক্তিগত সমালোচনা অধিকাংশ সময় অতিরঞ্জনের প্রশ্রয় দিয়া থাকে। দীনেশ সেনের এবং রবীন্দ্রনাথের কোন কোন সমালোচনা এই শেষোক্ত শ্রেণীর। বাংলায় পূর্ণচন্দ্র বসুর 'সাহিত্যে খুন' প্রবন্ধটী ব্যক্তিগত-সমালোচনা কতদূর পর্য্যন্ত অপাংক্তেয় হইতে পারে, তাহার নিদর্শন। সমালোচক সনাতনপন্থা অনুসরণে সেক্সপীয়রের মহত্ত্ব-বিচার করিতে বসিয়াছেন, কিন্তু তাহার অতিরিক্ত নীতিজ্ঞান ও অনুদারতা, মানব-চরিত্র ও নাট্যরস-জ্ঞানের অভাব তাঁহার দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার সমালোচনার একটু নমুনা দিতেছি—

> 'সেক্সপীয়রে প্রতিভার দোষ নহে, সেক্সপীয়রে রুচির দোষ—সে রুচি এরূপ হত্যা ব্যাপারে আনন্দ পাইত, সে রুচি একজন কৃষ্ণকায় মুরকে ঐরূপ নির্দ্দয় পামর রূপে চিত্রিত করিতে বড় আমোদ লাভ করিত।'

(৬) তত্ত্বসন্ধানী পদ্ধতি (*Philosophical Method*)—আলোচ্য সাহিত্য বা কাব্য কতখানি সমাজ-কল্যাণ সংসাধিত করে বা উহার মধ্যে কোন্ সত্য নিহিত আছে, অথবা উহার সৌন্দর্য্য বা রসতত্ত্বের স্বরূপই বা কিরূপ, সাহিত্য-বিচারে যাহারা ইহাদের আলোচনা করেন, তাহারা এই পদ্ধতি অনুসরণ করেন। 'মৃচ্ছকটিক' নাটক সমালোচনায় ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্র-সমালোচনায় অজিত চক্রবর্ত্তী এই শ্রেণীভুক্ত। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, 'সাহিত্য ও কাব্যের

লক্ষ্য সমাজহিত..এ মত সত্যিকারের কাব্যপরীক্ষার ফল নয়, তথ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে একটা মনগড়া তত্ত্ব' *। এতদ্ব্যতীত, জীবন-স্পর্শ বর্জ্জিত নিছক সৌন্দর্য্য বা রসতত্ত্বের আলোচনা নন্দন-তত্ত্বের আলোচনার বিষয় হইলেও সাহিত্যে উহার প্রয়োগ আনুষঙ্গিক মাত্র।

(৭) তুলনামূলক সমালোচনা (*Comperative Criticism*)—ম্যাথু আর্ণল্ড বলেন, সাহিত্য-বিচারে দুইটি বিভিন্ন লেখকের শব্দ-সম্পদ বা পংক্তির তুলনামূলক বিচারে উভয়ের কৃতিত্ব নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। তুলনীয় পংক্তি-নির্ব্বাচনে সমালোচকের রস-বিচক্ষণতাই তাঁহার একমাত্র সহায়—ঐ সকল পংক্তি বা শব্দ-সম্পদের নিকষ-পাষাণেই কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করা যায়। বলা বাহুল্য, আর্ণল্ড তুলনীয় পংক্তি-নির্ব্বাচনের কোন পথ-নির্দ্দেশ দেন নাই; দ্বিতীয়তঃ, কাব্যবিশেষের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুই একটি উৎকৃষ্ট পংক্তি উহার সর্ব্বাঙ্গীণ সৌন্দর্য্যের পরিমাপক হইতে পারেনা। তৃতীয়তঃ, দুইটি বিভিন্ন কাব্য-প্রকৃতি এক ধর্ম্ম, এক গোত্র, এক সুর, এক ভঙ্গি, একই দৃষ্টি-সম্পন্ন না হইলে উহাদের তুলনায় কাব্যের উৎকর্ষ-বিচার লাঞ্ছনায় পর্য্যবসিত হইতে পারে। তবে, সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনায় পরস্পরের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার অনেকখানি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

(৯) পরিসংখ্যান-পদ্ধতি (*Statistical Method*)—বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় শতকে যে নূতন ধরণের সমালোচনা কেহ কেহ প্রবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার প্রণালী অভিনব বটে। লেখকের ব্যক্তি-জীবন, পারিপার্শ্বিক, সমাজ-জীবন ও ব্যক্তি-প্রতিভার যে প্রকাশে সাহিত্য সৃষ্ট হয়, তাঁহারা উহার আলোচনা না করিয়া রেখাচিত্র (graph) এবং পরিসংখ্যান (statistics) এর সাহায্যে সমালোচনা করিতেন। এইজন্য তাঁহারা কোন লেখকের বিচিত্র শব্দ-সম্পদ ও ভাব-কল্পের (image) বিক্ষিপ্ত ব্যবহারের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিয়া উহার সাহায্যে কবি-মানসের উপর আলোকপাত করিতে চাহিতেন। এই জাতীয় সমালোচনায়

* শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত : কাব্য-জিজ্ঞাসা

Vernon Lee ও Caroline Spurgeon প্রসিদ্ধ। বাংলায় এখনো এইজাতীয় সমালোচনার আবির্ভাব হয় নাই।

(১) বস্তুনিষ্ঠ-পদ্ধতি (*Objective Method*)—যে পদ্ধতি সাহিত্যকে সাহিত্য হিসাবে, বিশিষ্ট এবং একক সৃষ্টি-কর্ম্ম হিসাবে বিচার করে, তাহাকে বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতি বলা যাইতে পারে। এই বিচারে বিশেষ কোন যুগ-চেতনা সাহিত্যে মূর্ত্ত হইয়াছে কিনা, ইহা মোটেই মুখ্য নয়, প্রাচীন বিধি-সম্মত বিচারেও ইহা সাহিত্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করে না ; ইহাতে গ্রন্থকারের ব্যক্তি-জীবন কতখানি সাহিত্যে প্রতিফলিত, এই কথাও মুখ্য নয়, অথবা সমালোচকের আত্মন্তরী মূল্য-নির্দ্দেশেরও এইখানে সুযোগ নাই। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য, কোন ব্যক্তি-বিশেষ জাতীয় জীবনের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহকরূপে জগৎ ও জীবনকে যেরূপে দেখিয়াছেন, তাহা তাঁহার দৃষ্টিতে কতখানি স্বাভাবিক ও সত্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই বিচার। এই সত্যদৃষ্টি সাহিত্যকে স্রষ্টার শিল্প-মানস, বিষয়, ভাব ও বাণীভঙ্গির একটি পূর্ণমণ্ডল স্বয়ম্বশ রূপ-সৃষ্টি হিসাবে দেখিতে চেষ্টা করে। এইভাবে দেখিলে সাহিত্যের যে বিচার হয়, উহা মূলতঃ সাহিত্যের ব্যাখ্যা (*Interpretative Criticism*)। রবীন্দ্রনাথও বলেন—

> সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়। এই ব্যাখ্যা মুখ্যত: সাহিত্যবিষয়ের ব্যক্তিকে নিয়ে, তার জাতিকুল নিয়ে নয়। অবশ্য সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিচার কিংবা তাত্ত্বিক বিচার হোতে পাবে। সে রকম বিচারে শাস্ত্রীয় প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু তার সাহিত্যিক প্রয়োজন নেই।

অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাখ্যার স্বরূপ সম্বন্ধে বলেন—

> পূজার আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার মতে প্রকৃত সমালোচনা—এই উপায়েই এক হৃদয়ের ভক্তি আর এক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়।....যথার্থ সমালোচনা পূজা—সমালোচক পূজারি পুরোহিত, তিনি নিজের অথবা সর্ব্বসাধারণের ভক্তিবিগলিত বিস্ময়কে ব্যক্ত করেন মাত্র।

বলা বাহুল্য, 'যথার্থ সমালোচনা' পূজা নয়, পূজাতে শ্রদ্ধা থাকিতে পারে, অন্ধ বিশ্বাসও থাকিতে পারে, কিন্তু পূজায় বিচারবোধ থাকেনা। যে সমালোচক 'পূজার আবেগ মিশ্রিত ব্যাখ্যাকেই' সমালোচনা মনে করেন, তাঁহার কাছে

সমালোচনা স্তুতি মাত্র—দোষগুণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ মূল্য পরিমাপ করা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়—তাহার সমালোচনা 'ব্যক্তিগত সমালোচনা'রই নামান্তর। এইখানে আরও মনে রাখিতে হইবে, 'পূজাও' যেমন সমালোচনা নয়, 'ঘৃণাও' তেমন সমালোচনা নয়। ইংরেজী সাহিত্যে Jeffreyর উক্তি *'This will never do'*—সমালোচনা নয়, উদ্ধত দম্ভোক্তি মাত্র।

বস্তু-নিষ্ঠ সমালোচনায় সমালোচকের যে ব্যক্তি-মানস-দৃষ্টি সাহিত্যে ও কাব্যে কবি-মানসের 'কায়া-কান্তি' প্রত্যক্ষ করে, উহাতে ব্যক্তি-নিষ্ঠতার স্পর্শ থাকা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কারণ, ব্যক্তি-হৃদয় ব্যতীত বস্তু-সৌন্দর্য্যের কোন 'আলোচনাই' সম্ভব নয়। বস্তু-জগৎ যেমন কবি বা সাহিত্যিকের মনের পরশে রঙীন হইয়া উঠে, সাহিত্যিকের রচনাও (যাহা সমালোচনের বস্তু-জগৎ) তেমন সমালোচকের মনের পরশে 'আরেকটু রঙিন' হইয়া উঠে। বঙ্কিমচন্দ্র গোবিন্দ লাল, ভ্রমর, কুন্দ প্রভৃতি চরিত্র-সৃষ্টি করিয়াছেন; শরৎচন্দ্র দেবদাস, মহিম, সুরেশ, রমা, অচলা. কিরণময়ী, কমল প্রভৃতি চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের সমালোচক আবার গ্রন্থকারের সৃষ্টির সাহায্যে স্বকীয় কবি-মানসের অভিনব রূপ-সৃষ্টি করেন। বস্তুতঃ, শ্রেষ্ঠ সমালোচক সর্ব্বমানবের প্রতিনিধিরূপে সাহিত্যিকের রূপ-সৃষ্টি ও সৌন্দর্য্য-কল্পনাকে পাঠকের সম্মুখে প্রতিভাত করেন—এবং সাহিত্যের এই পরিচয়-প্রদান নব-সৃষ্টির মতই হইয়া উঠে। সমালোচক একান্তভাবে ব্যক্তিনিষ্ঠ হইয়াও বহুর প্রতিনিধিত্ব করেন এবং সাহিত্যিক যেমন সাহিত্যের মধ্য দিয়া আত্ম-মুক্তির সন্ধান করেন, সমালোচকও তেমনিই অপরের সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাহার ধ্যানধারণাকে স্পষ্ট করিয়া তোলেন। কাব্য পাঠে পাঠক যে আনন্দ পাইয়াছে, সমালোচনা যদি সে আনন্দ দিতে পারে, তবেই উহা সার্থক সমালোচনা। এই প্রসঙ্গে Middleton Murry-র মত প্রণিধানযোগ্য—

'If it (criticism) gives this delight, criticism is creative, for it enables the reader to discover beauties and significances which he had not seen, or to see those which he had himself inglimpsed in a new and revealing light.'

অনেকে মনে করেন, সমালোচক স্রষ্টা নহেন—অন্ততঃ, মূল সাহিত্যিকের তুলনায় তাহার স্থান অনেক নিম্নে। লেখক জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে যাহা ভাবিয়াছেন, তাহাকেই তিনি তাহার কাব্যে রূপ দেন। স্থতরাং তিনি স্রষ্টা, এই বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু লেখক যেমন আপনার কল্পনায় জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে অনুভূত সত্য ও সৌন্দর্য্য স্থষ্টি করেন, সমালোচকও তেমন সাহিত্যিকের আন্তর সত্যটিকে নিজের মনের রসে রসায়িত করিয়া নূতন স্থষ্টি করেন। অবশ্য, এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, সাহিত্য-স্রষ্টার বিষয়বস্তু সীমাহীন, সমালোচকের বিষয়বস্তু সসীম। একজন নিজের ইচ্ছানুযায়ী গ্রহণ ও বর্জ্জনের দ্বারা জীবনের রূপদান করেন, আর একজন রূপস্থষ্টি উপলক্ষ্য করিয়া নূতন স্থষ্টি করেন। সমালোচকও ব্যক্তিগত ধ্যানধারণার সাহায্যে, লেখক যাহা লিখিয়াছেন, তাহা শুধু যাচাই-ই করেন না, তিনি যাহা লিখিতে পারেন নাই, বা যাহা তিনি বলিয়া উঠিতে পারেন নাই, তাহার সম্বন্ধেও ইঙ্গিত প্রদান করিয়া তাহার স্বকীয় অনুভূতি-সঞ্জাত জীবন-দর্শন গড়িয়া তোলেন। সাহিত্যিক জীবনের রূপ দান করেন, কিন্তু সমালোচক যেন সাহিত্যিকের হাতের কলমটি লইয়া বলেন, 'না, আপনি যেভাবে বিষয় বা চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন, উহাতে তাহার স্বাভাবিক পরিণতি এমন বা তেমন হইবে—আপনি যাহা বলিতে চাহেন, তাহা হইতে পারে না'। অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই, সমালোচক দেখাইয়া না দিলে কোন্ কাব্য বা কাব্যাংশ কতখানি শ্রেষ্ঠ, তাহা আমাদের কাছে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় না। সমালোচকই সাহিত্যের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যকে উদ্ধার করিয়া পাঠকের বিস্ময়-স্থষ্টি করেন ও আনন্দ বর্দ্ধন করেন। এইজন্য আমরা বলিতে পারি যে, সাহিত্য-স্রষ্টার ন্যায় সমালোচকও 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' নূতনতর স্থষ্টি (a creation within a creation) করেন। এই স্থষ্টি তাঁহার আত্মার প্রতিধ্বনির অনুরূপ—তাঁহার আত্ম-চরিতের অংশ বিশেষ। সমালোচক তাঁহার অগ্রজ সাহিতিক্যের স্থষ্টির উপর নির্ভর করেন সত্য, কিন্তু রূপায়ন-দক্ষতা যদি তাহার থাকে, তবে তাঁহাকে স্রষ্টার সম্মান দান করিতে কাহারও কুণ্ঠার কারণ

সমালোচক ও সাহিত্য-স্রষ্টা

নাই।* শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক যেমন জীবন ও জগতের সত্যকে রূপদান করেন, সমালোচকও তেমন বন্ধন-বিমুক্ত মনোবৃত্তি ও দৃষ্টি দ্বারা 'নিতুই নব' সত্য ও সৌন্দর্য্য পাঠকের গোচর করেন। কবির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে Wordsworth বলিয়াছিলেন :—

> Prophets of Nature, we to them will speak,
> A lasting inspiration, sanctified,
> By reason, blest by faith : what we have loved
> Others will love, and we will teach them how ;
> Instruct how the mind of man becomes,
> A thousand times more beautiful than the earth.

আমাদেব মনে হয়, শ্রেষ্ঠ সমালোচকের উদ্দেশ্যও ইহাই।

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য অত্যন্ত দরিদ্র, সন্দেহ নাই। এই সম্বন্ধে শশাঙ্ক মোহন সেন কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, 'তুলনা ব্যতীত প্রকৃত সমালোচনা নাই; বহুদর্শন ব্যতীত প্রকৃত তুলনা হইতে পারে না; আবার সহৃদয়তা ব্যতীত সমস্তই বিফল। বঙ্গীয় সমালোচনায় তিনেরই অভাব পরিদৃষ্ট হইবে'। বাংলায় সমালোচনা-সাহিত্য ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিতেছে, ইহাই আশার কথা। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে সমালোচনা-সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু উহা বড় কাঁচা, বড় অপক্ক; ইহাব মধ্যে রসবোধের পরিচয় থাকিলেও সত্যকারের সমালোচনা-সাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে ছিল না বলিলেই হয়। অবশ্য এই কথা স্বীকার্য্য যে, 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের প্রায় ২১ বৎসর পূর্ব্বে রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২১-০১) সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১) নামক মাসিক পত্রে সমালোচনার প্রথম সূত্রপাত হয়। এই কাগজে বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ, রঙ্গলাল, মধুসূদন, দীনবন্ধু প্রভৃতি বহু লেখকের গ্রন্থ সমালোচিত হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ ইহার অধিকাংই কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের লিখিত। সুতরাং তিনিই

* *Cf* : 1. 'Valuing is *creating*'—*Nietzsche*. 2. 'A good criticism is as much a work of art as a good poem'—*M. Murry*.

বাংলা সাহিত্যে আদি সমালোচক।* 'বিবিধার্থ সংগ্রহের' সমালোচনা-পদ্ধতি 'রহস্য সন্দর্ভ', 'সর্ব্বার্থ-সংগ্রহ' ও ঢাকার 'মিত্রপ্রকাশ' প্রভৃতি পত্রিকায় অনুসৃত হইয়াছিল। ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত তৎকালীন সমালোচকদের মধ্যে কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, (১৮৬৪-১৯১৭), চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু 'বঙ্কিমচন্দ্রই (১৮৩২-৯৪) বাংলায় সমালোচনা-সাহিত্যের অগ্রদূত। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সমালোচনাও সত্যকারের সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের স্তরে উন্নীত হইতে পারে। তুলনামূলক সহৃদয় সমালোচনা তিনিই প্রথম সৃষ্টি করিলেন। 'উত্তরচরিত', 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', 'শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেসদেমোনা', 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিত্ব', 'দীনবন্ধুর কবিত্ব' প্রভৃতি সমালোচনা নিবন্ধে যে অন্তর্দ্দৃষ্টি, বহুশ্রুতত্ব, বিচারবুদ্ধি ও রসগ্রাহিতার পরিচয় পাই, তাহা বাঙ্গালা সমালোচনা-সাহিত্যের দিগ্দর্শনী হইয়া রহিয়াছে'†। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সমসাময়িক কালে লিখিত বীরেশ্বর পাঁড়ের 'উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত (১৮৯৭), পূর্ণচন্দ্র বসুর 'সাহিত্যচিন্তা (১৮৯৬) ও গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর 'বঙ্কিমচন্দ্র' সমালোচনা-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা-সাহিত্যের বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করেন। তিনি একদিকে যেমন লেখকের মনটিকে পাঠকের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন, তেমন আবার সৃষ্টি-মূলক সমালোচনার ক্ষেত্রেও বিস্ময়কর শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। সমালোচনা-সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট কবি-মনের ও আত্মগত অনুভূতির পরিচয়টি সুস্পষ্ট। প্রাচীন সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, সাহিত্য ও সাহিত্যের পথে তাঁহার বিখ্যাত সমালোচনা-গ্রন্থ।

রবীন্দ্রযুগের অন্যান্য সমালোচকদের মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও অজিত চক্রবর্ত্তীর নাম স্মরণীয়। সাধারণতঃ একটু ভাবপ্রবণ হইলেও বাঙ্গালীর হৃদয়, বাঙ্গালীর দৃষ্টি ও বাঙ্গালীর মমতা দিয়া দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৭৩-১৯৩৯) বাংলা সাহিত্যকে দেখিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তীকালে পাশ্চাত্ত্য

---

* সমালোচনা-সংগ্রহ (*C. U.*) † মজুমদার ও দাশ : বঙ্কিম-স্মৃতি

সমালোচনা-দর্শন-প্রভাবিত শশাঙ্কমোহন সেনের (১৮৭৩-১৯৩৮) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'মধুসূদন' ও 'বঙ্গবাণী' তাঁহার দুইখানি উল্লেখযোগ্য সমালোচনা গ্রন্থ। কিন্তু 'বাণীমন্দির' গ্রন্থে তিনি সনাতন-পন্থী সমালোচক। আধুনিক কালে রসবাদ-সূত্রে যে কয়েকজন সমালোচক সমালোচনা-সাহিত্যের একটি প্রাচীন বিভাগ পরিপূর্ণ করিতেছেন, তন্মধ্যে অতুলচন্দ্র গুপ্ত (কাব্য-জিজ্ঞাসা), সুরেন্দ্র দাশগুপ্ত (কাব্যবিচার), সুধীর দাশগুপ্ত (কাব্যালোক), শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী (অলঙ্কার চন্দ্রিকা) নাম করা যাইতে পারে। বিশুদ্ধ ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে—সাহিত্যকে যাঁহারা সুবিখ্যাত সমালোচক Tain-এর অনুকরণে জাতি (*Race*), যুগ (*Age*) ও পরিবেশের (*Environment*) প্রকাশ রূপে দেখিয়াছেন, এবং সর্ব্বোপরি, সমালোচনার ক্ষেত্রে ইহাদের সহিত লেখকের ব্যক্তি-মানসের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তন্মধ্যে মোহিতলালের নাম স্মরণীয়। পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা-দর্শন প্রভাবিত অন্যান্য সমালোচকদের মধ্যে ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ডাঃ সুবোধ সেনগুপ্ত ও প্রমথনাথ বিশীর নাম করা যাইতে পারে।

১২

গদ্য-সাহিত্য (বিবিধ)

উপরে যে কয়েক প্রকার গদ্য-সাহিত্য আলোচিত হইয়াছে, উহা ব্যতীত জীবনচরিত, আত্মচরিত প্রভৃতি আরও কয়েকটি এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করিব।

জীবন-চরিত

জীবনী-সাহিত্য চিত্রকলার মতই বিশেষ শিল্প-সৃষ্টি। জীবন-চরিতের সাহায্যে আমরা মানুষের অন্তর পুরুষটীকে জানিতে পারি। চরিত-লেখকদিগের কতকগুলি ব্যাপার সম্বন্ধে অবহিত হইতে হয়। প্রথমতঃ, লেখকের পক্ষে অনেক সময়েই মৃত ব্যক্তির জীবনী সংক্রান্ত যথেষ্ট পরিমাণে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। এইজন্য স্বল্প বিষয়-বস্তুই তাঁহাকে অনেক সময় একমাত্র মূলধন বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, মৃত্যুর পর কোন ব্যক্তির জীবনের কতখানি প্রকাশ্য, কতখানি অপ্রকাশ্য, ইহাও বিবেচনার বিষয়। অবশ্য, ইহা প্রায় সর্ব্ববাদীসম্মত যে, মৃত্যুর পর কোন ব্যক্তির দোষগুলি গোপন করিয়া তাঁহার গুণেরই সমাদর করা বিধেয়। কিন্তু অস্বাভাবিক আত্মগোপনে আবার জীবনচরিতের অসম্পূর্ণতা বিধান করা হয়। আসল কথা এই, লেখক এমন ভাবে গ্রহণ ও বর্জ্জন করিবেন,* যাহাতে পরিপূর্ণ লোক-চরিত্রটী অঙ্কনে মোটেই অসুবিধা না হয়। এইজন্য লেখকের মানব-চরিত্র সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকা বাঞ্ছনীয়। যাহার জীবনচরিত লিখিতে হইবে, তাহার সম্বন্ধে, শ্রদ্ধান্বিত হওয়া লেখকের একান্ত কর্ত্তব্য ; নতুবা তিনি সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিটীর

---

*Cf. (a) A mass of notes and documents is no more a biography than a mountain of eggs an omelette—*L. Strachey*

(b) A good biography is like a marriage : it requires a sympathetic union of writer and topic, and biography by attack is as certain to fail as marriage by bickering—*Allan Naris*

চিত্ত-কথা সর্বজনবেদ্য করিয়া তাঁহারই আদর্শকে মূর্ত্ত করিতে পারেন না। তৃতীয়তঃ জীবনী লেখককে বিষয়বস্তু সম্পর্কে একদিকে যেমন কেন্দ্রগত চরিত্র সম্পর্কিত সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইবে, তেমনই তাঁহার কালেই তাহারই পারিপার্শ্বিক ও যুগচিত্ত সম্পর্কে অবহিত হইতে হইবে। বীরপূজার মোহে আচ্ছন্ন হইয়া যুগের বা তৎকালীন নরনারীকে অবজ্ঞা করিলে চলিবেনা—ইহাতে ইতিহাসের ও সত্যের অপলাপ করা হইবে। গ্রন্থকার যাহার জীবনী লিখিতেছেন, তাহাকে শ্রদ্ধা করিবেন, এবং না করিতে পারিলেই অন্যায় হইবে। কিন্তু যুগের অপর মনীষীদের ছোট করিয়া তুলিলে বিবুধজন এবং কাল তাহাকে ক্ষমা করিবে না। এইজন্য Andre Maurois বলেন—'Secondary character must be delineated with the same care and love as the central figure. *No man or woman was ever left to fight alone in the battle of life.*' সেইজন্য জীবনীলেখককে মনে রাখিতে হইবে যে, ব্যক্তি-বিশেষকে কেন্দ্র করিয়া তাহাকে 'perfect pattern of well-told life' রচনা করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, আধুনিক কালে প্রকাশিত বিপুলকায় রবীন্দ্র-জীবনী পড়িলে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথই যেন সেইযুগে একক পুরুষ, অপর সকলেই ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র মানবক মাত্র। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার অন্যান্য মনীষীদের প্রতি জীবনীকার সুবিচার করিতে পারেন নাই; ফলে অসম্ভব স্ফীত-কলেবর জীবনীটি 'perfect pattern of well-told life' হইতে পারে নাই।

চতুর্থতঃ, জীবনচরিতে কালক্রম অনুসরণ করা বিধেয়। প্রথম হইতেই, 'এই মহামানব পল্লী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন'—এইরূপ সূচনা শোভন নয়, কারণ কোন শিশুই মহামানব নয়। পঞ্চমতঃ, জীবনীর মাধ্যমে গ্রন্থকার যদি বিশেষ কোন তত্ত্বকথা বা নীতিকথা প্রচার করিতে চাহেন, তাহা হইলে গ্রন্থের শিল্প-সৌন্দর্য্য ব্যাহত হইবে। ইহারও কারণ Andre Maurois-র ভাষায় বলা যাইতে পারে—

A Beethoven symphony is highly moral . so is a great biography, not because the author lays down moral principles but because a great life is a thing of beauty.

সর্ব্বোপরি, জীবনীকারকে সর্ব্বত্রই মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি নিজে স্রষ্টা হইলেও তাহার সৃষ্টির মধ্যে ব্যক্তিগত ভাব-ভাবনার স্থান নাই। তিনি যাহা দেখিতেছেন, প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তাহা শুধু চিত্রকরের ন্যায় তিনি অঙ্কন করিবেন। জীবনচরিতটী কত গভীর করিয়া, কত অন্তহীন কালের জন্য মানব-সমাজকে অনুপ্রাণিত করে এবং উহা লোকটীকে কতখানি জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারিয়াছে, ইহার উপর জীবনচরিতের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে। ইহাতে অঙ্কিত মানবাত্মার জয়যাত্রার কাহিনী আমাদিগকে যদি আশায়, ভরসায় ও সহানুভূতিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া দিতে পারে এবং আমাদের মধ্যে তদনুরূপ ভাব-কল্পনার অনুপ্রেরণা সঞ্চার করিতে পারে, তবেই উহার সার্থকতা। বলা বাহুল্য, এই জাতীয় জীবন-চরিত খুব অধিক সংখ্যক নাই।

প্রাচীন বৌদ্ধ যুগে রচিত, অধুনা অনূদিত, অশ্বঘোষের 'বুদ্ধ-চরিত' বিখ্যাত জীবনী। বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের চরিত-শাখায় অসংখ্য জীবনীর উল্লেখ আছে। কিন্তু ইহারা শিল্প-সঙ্গত জীবনী হইয়া উঠে নাই। পরবর্ত্তী কালের Lewes-এর *Life of Goethe*, Boswell-এর *Life of Dr. Johnson*, ভগিনী নিবেদিতার *The Master as I saw Him*, Romain Rolland-এর *Ramkrishna*, *Vivekananda*, এবং বাংলা সাহিত্যে রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত', অজিত চক্রবর্ত্তীর 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর', নগেন সোমের 'মধু-স্মৃতি', যোগীন বসুর 'মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত', শিশির ঘোষের 'অমিয় নিমাই চরিত', মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ভূদেব-চরিত', ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রামমোহন রায়', চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর চরিত', সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'বিবেকানন্দ চরিত', ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা' কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জীবন-চরিত।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংরেজী জীবন-চরিত সাহিত্যে—Lytton Strachey যুগান্তর আনয়ন করেন। যাহা অত্যাবশ্যক তাহাকে গ্রহণ এবং যাহা অপ্রয়োজনীয় তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে বর্জ্জন করিয়া—নিরাসক্ত মোহমুক্ত পক্ষপাত-বিহীন দৃষ্টিতে তিনি জীবনী রচনার সূচনা করেন। তিনি মনে করেন যে,

জীবনী লেখককে সশ্রদ্ধ হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। তবে তিনি নিজে যেমন করিয়া কোন ব্যক্তি-পুরুষকে বুঝিয়াছেন—*as I understand them*—তেমন করিয়া চরিত রচনা করিয়াছেন। তাহার *Eminent Victorians* এই বিশিষ্ট দৃষ্টির আলোকে রচিত। *Queen Victoria*র জীবনীতে যদিও তাহার শ্যেন-দৃষ্টির সহিত ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির মিলন হইয়াছে, তথাপি এইখানে তাহার পূর্ব্ব-অনুসৃত নীতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ভিক্টোরিয়াকে ছোট করিতে গিয়া তিনি শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন এবং যুগচিত্রটি আরও কয়েকটি পুরুষের চরিত্রাঙ্কন সাহায্যে এমন অনবদ্য হইয়াছে যে, গ্রন্থখানা যেন উপন্যাসের গতি ও মর্ম্মর-মহিমা লাভ করিয়াছে। Strachey-প্রভাবিত দুই একখানা বাংলা জীবনী লেখা হইয়াছে--উহাতে অশ্রদ্ধার সহিত দাম্ভিকতার মিশ্রণে লেখকের অপটুতাই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যে Andre Mauroisএর *Ariel*-এর মত অপরূপ সুন্দর, উপন্যাসের অপেক্ষা মধুর, নাটকের অপেক্ষা নাটকীয় জীবনী লেখা হয় নাই। অচিন্ত্য সেনের 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে রচিত বলিয়া বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে।

আত্ম-চরিত

জীবন-চরিত ব্যতীত 'আত্ম-চরিত' নামক আব এক শ্রেণীর সাহিত্যের কথা না বলিলে এই অধ্যায়টি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ডাঃ জন্‌সন্ বলেন যে, প্রত্যেকের জীবন-চরিত আত্মকৃত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এক হিসাবে কথাটি সত্য। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, আত্মচরিত লেখকগণ আত্মচরিতকে এমন দাম্ভিকতা ও অসামান্য লজ্জাহীন বর্ণনায় ক্লান্ত ও মিথ্যার প্রশ্রয়ে ভারাক্রান্ত করেন যে, ঐসব দেখিয়া আমরা লেখকের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রাখিতে পারি না। বিশেষতঃ, লেখক নিজের কথা বলিতে গিয়া যখন ভবিষ্যৎ কালের পাঠকের কথা স্মরণ করেন, তখন লজ্জা ও বিচারবুদ্ধি আসিয়া পড়ায় তাঁহার জীবনের অনেক গভীর কথাই তিনি পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিতে পারেন না। ফলে, তিনি অকপটে আত্ম-চরিত রচনা

করিতে পারেন না। এইজন্য আত্ম-চরিত অনেক সময়ই ব্যক্তি-জীবনের সঠিক বৃত্তান্ত নয়। কিন্তু যিনি জীবনের কথা, অভিজ্ঞতার কথা অকপটে বিবৃত করিতে পারেন, তাঁহার গ্রন্থে সত্য যেরূপ সুন্দর ও অভাবনীয় প্রাণরসে পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, তাহা চিরদিনের সাহিত্য হিসাবে অনবদ্য। আত্ম-চরিত লেখকের পক্ষে অতি মাত্রায় নম্রতা বা অতিমাত্রায় আত্ম-সচেতনতা, উভয়ই ক্ষতিকর। ইংরেজী সাহিত্যে *St. Augustine*-এর *Confessions*, Rousseau-র *Confessions*, *Gibbon*-এর *Autobiography*, *Davies*-এর *Autobiography of a Super-Tramp*, Gandhi-র *My Experiments With Truth*, এবং বাংলার নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত', তারাশঙ্করের 'আমার সাহিত্য-জীবন', সজনী দাসের 'আত্মচরিত' এই শ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

লেখক কখনো কখনো সুসংবদ্ধ আত্ম-চরিত না লিখিয়া জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা-পরিক্রমা—*Diary* বা দিন-পঞ্জী, এবং *Memoir* বা স্মৃতি-কথা রচনা করেন। আত্মচরিত বা আত্ম-পঞ্জি উভয় প্রকার সাহিত্যেই গ্রন্থকার অতীতকে বর্তমানের আলোকে অঙ্কিত করেন। ইহাতে কাহিনীর নিজস্ব কোন শিল্প-গত পরিণাম-সঙ্কেত নাই। আত্মচরিতে লেখকের ব্যক্তি-চরিত্র ও আত্মজিজ্ঞাসাই প্রধান, স্মৃতিকথায় তাঁহার ব্যক্তি-চরিত্র অপেক্ষা বহির্গত ঘটনা-প্রবাহ প্রধান। *Samuel Pepy*-র *Diary* ও *Ariel's Journal*-এর মত বই বাংলায় বেশী নাই। এই প্রসঙ্গে চারুচন্দ্র দত্তের 'পুরাণো কথা', কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের 'পুরাতন প্রসঙ্গ' ও চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গদাধর শর্ম্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা'র নাম করা যাইতে পারে।

স্মৃতি-কথা জাতীয় বইয়ের মধ্যে ইংরেজীতে নেপোলিয়ন-এর 'স্মৃতি-কথা' এবং বাংলায় বিদ্যাসাগরের 'আত্ম-চরিত', রবীন্দ্রনাথের 'আত্ম-পরিচয়', 'জীবন-স্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা', প্রমথ চৌধুরীর 'আত্ম-চরিক', অবনী ঠাকুরের 'জোড়াসাঁকোর ধারে', 'ঘরোয়া'; ভূপেন গাঙ্গুলীর 'স্মৃতিকথা'র নাম করা যায়।

লিপি-সাহিত্য বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহাও আবার দুইভাগে বিভক্ত, যথা—পত্রিকা (*Epistle*) ও লিপি (*Letter*)। প্রথমোক্ত রচনা কোন শ্রোতৃবর্গকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত এবং উহাতে সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য ও সৌষম্য বিদ্যমান। ইহা যেন সর্ব্বসমক্ষে বক্তৃতা প্রদানের মত। কিন্তু চিঠির মূল্য বক্তৃতায় নয়, আড়ম্বর-পূর্ণ ও আভরণমণ্ডিত সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে নয়—দুইটি মানবাত্মার পরস্পরের হৃদয়ের সংযোগ সাধনে। প্রথমোক্ত চিঠিতে লেখকের অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের কথা পাই, তাঁহার সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব প্রত্যক্ষ করি—কান পাতিয়া তাহার মনের কথা শুনিতে পাই না। এই জাতীয় চিঠি-সাহিত্যে ডাঃ জন্‌সন্ ও ষ্টিভেন্‌সনের চিঠি, এবং বাংলায় নবীনচন্দ্রের 'প্রবাসের পত্র', ডি. এল. রায়ের 'বিলাতের পত্র', রবীন্দ্র নাথের 'ছিন্নপত্র', চিঠিপত্র' ও শরৎচন্দ্রের বা মধুসূদনের কতকগুলি চিঠি এবং স্বামী বিবেকানন্দের 'পত্রাবলীর' নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথম শ্রেণীতে লেখক কবি বা সাহিত্যিক, দ্বিতীয় শ্রেণীতে লেখক দোষে-গুণে মানুষ। ইংরেজীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর চিঠি-সাহিত্যে কুপার, ল্যাম্ব, কীটস্ প্রভৃতির চিঠি উল্লেখযোগ্য এই জাতীয় চিঠি-সাহিত্য বাংলায় বিরল।

লিপি-সাহিত্য

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত-সংক্রান্ত সাহিত্যও গদ্য-সাহিত্যের একটি বিশেষ দিকের পুষ্টিসাধন করিয়াছে। মানুষ যে কেবল নিজেকেই জানিতে চায় তাহাই নয়, বাহিরের জগতের আহ্বান প্রতিনিয়তই তাহাকে টানিতেছে। এই আহ্বানে প্রলুব্ধ হইয়া অনেক লোক দেশভ্রমণে বহির্গত হয়। নানাদেশ, নানাজাতি, তাহাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিভিন্ন জনের নিকট বিভিন্ন রূপে ধরা দেয়। বাহিরের এই বস্তু-সত্তাকে লেখক মানস-রসে প্রত্যক্ষ করিয়া তথ্য-সম্বলিত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই জাতীয় গ্রন্থে বস্তু-সত্তার প্রাধান্য থাকিলেও উহার মধ্যে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি থাকিতে পারে। ইংরেজী সাহিত্যে হক্সিলির *Jesting Pilate* পাঠ করিলে দেখা যায় যে, যে-তাজমহল বিশ্বের অসংখ্য নরনারীকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাহা লেখকের নিকট শুধু ঐশ্বর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। সুতরাং লেখকের ব্যক্তিগত চিত্তও এইখানে ধরা পড়িয়াছে।

যিনি ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিতে চাহেন, তাহার দৃষ্টি অপক্ষপাত, মন সংস্কৃতিবান ও যে কোন জিনিষকে সহৃদয়তা দ্বারা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। বাংলায় যে কয়েকটি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আছে, তন্মধ্যে দুর্গাচরণ রায়ের 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' নামক বইখানা গল্প-মাধুর্য্যে, হাস্যরসে ও তথ্য-পরিবেশনে অপূর্ব্ব। এতদ্ব্যতীত, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ', রবীন্দ্রনাথের 'জাপান পারস্যে', 'যাত্রী', 'রাশিয়ার চিঠি'; জলধর সেনের 'হিমালয়'; প্রবোধকুমার সান্ন্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে', 'দেবতাত্মা হিমালয়', অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে প্রবাসে', বিভূতি মুখোপাধ্যাযের 'দুয়ার হতে অদূরে', 'কুশী প্রাঙ্গনের চিঠি', বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যাযের 'তৃণাঙ্কুর', ইন্দু মল্লিকের 'চীন ভ্রমণ', সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাপান' উল্লেখযোগ্য।

১৩

রোমাণ্টিসিজম্ ও ক্ল্যাসিসিজম্

সমালোচনা-শাস্ত্রে রোমাণ্টিসিজম্ ও ক্ল্যাসিসিজম্ এই দুইটি শব্দ প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এইজন্যই ইহাদের মূল কথাটি সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই যুগের যুগন্ধর কবিগণ ফরাসী ও ল্যাটিন কবিদের অনুপ্রেরণায় ব্যঙ্গ-কবিতাকেই শ্রেষ্ঠ কবিতা বলিয়া মনে করিতেন। কবিতার তাঁহারা কোন ঐশী প্রেরণা বা দিব্যানুভূতিকে স্বীকার করিতেন না; বরং মস্তিষ্ক-প্রসূত বুদ্ধিনিষ্ঠ কল্পনাকেই তাঁহারা যথাসর্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কবিতায় ভাবানুভূতির আন্তরিকতা মোটেই ছিল না; তাঁহারা প্রাণ দিয়া অনুভব করেন নাই—মস্তিষ্ক দিয়া, বিচার দিয়া, বুদ্ধি দিয়া উপলব্ধি করিতেন। এইজন্য তাঁহাদের কবিতা নিরস শব্দাড়ম্বরে পর্য্যবসিত হইল। এই জাতীয় কবিতার তথাকথিত সংযমের বিরুদ্ধে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে গ্রে, কলিন্স, ব্লেক্, বার্নস্ প্রভৃতি ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট বিদ্রোহের সূচনা করেন। ইঁহাদের পরে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও কোল্‌রিজ ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে *Lyrical Ballads* নামক কাব্য প্রকাশ করিয়া সাহিত্যে যে যুগান্তর আনয়ন করেন, তাহাকেই ইংরেজী সাহিত্যে *Romantic Movement*এর সূত্রপাত বলা হয়। ইঁহারা ঘোষণা করিলেন যে, সত্যকার কবি-কল্পনা মস্তিষ্ক-প্রসূত নহে, হৃদয়-প্রসূত। হৃদয়-প্রসূত এই কল্পনার সাহায্যে তাঁহাদের কাব্যে যথাক্রমে দীনতম বস্তু কল্পনা-কান্ত রূপ পরিগ্রহ করিল এবং অতিলৌকিক বিষয়বস্তুও একান্ত স্বাভাবিক রূপে প্রমূর্ত্ত হইল।

ইংরেজী সাহিত্য *Romanticism*

অষ্টাদশ শতাব্দীর বুদ্ধিনিষ্ঠ কবিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া যে যুগ অবতীর্ণ হইল, ইংরাজী সাহিত্যে তাহাকে রোমাণ্টিক যুগের পুনরুজ্জীবন বলা হয়। পূর্ব্বযুগের কবিতা বিচার ও বুদ্ধিপ্রধান, এই যুগের কবিতা কল্পনা-প্রধান। তাই এই যুগের কবিগণ দেখিলেন, আকাশের তারায় ও স্তব্ধ নীলিমায় কোন ভাষাহারা সঙ্গীত; শিশু-প্রকৃতিতে কী অপূর্ব্ব বিস্ময়; অতিলৌকিক জগতের অবাস্তবতা কতখানি স্বাভাবিক ও সত্য; অতীতের অন্ধকারম্লান সৌন্দর্য্যে কী সীমাহীন কান্তি; পতিত ও ব্যথিতজনের হৃদয়-কন্দরে কী স্বর্গীয় মাধুর্য্য; প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ শব্দে কী অপূর্ব্ব আমন্ত্রণ।

এখন কথা হইল, কি করিয়া এই জিনিষটি সম্ভব হইল? এই নূতন ভাব-দৃষ্টির নবজন্মের পশ্চাতে লক্ষ্য করিবার বিষয় তিনটি। ইহার এক দিকে রুশোর বিদ্রোহ-মূলক জীবন-দর্শন, অপর দিকে জার্ম্মাণীর ক্যাণ্ট-হেগেল প্রবর্ত্তিত তুরীয়বাদ (*Transcendentalism*)। রুশো *Emile, The Social Contract, New Heloise* প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া মানুষ হিসাবে মানুষের জীবনের মর্য্যাদাবোধ, প্রকৃতির সহিত মানবমনের নিগূঢ় সম্বন্ধ ও প্রেমের অভাবনীয় শক্তি সম্বন্ধে তৎকালীন জনমনকে সচেতন করিয়া দিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, জার্ম্মান-দর্শন মানুষের ভাবজগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। ক্যাণ্টই প্রথম বস্তু জগৎকে কবির আত্ম-রসে রসায়িত অখণ্ড সৌন্দর্য্য-রূপে উপলব্ধি করিলেন, এবং রুশো অপেক্ষা উগ্রতর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ক্যাণ্টএর পর জার্ম্মান-দর্শনের আর একটি তত্ত্ব—চিৎ (*Mind*) ও জড়ের (*Matter*) অদ্বৈতবাদ এই রোমাণ্টিক ভাব-কল্পনাকে পল্লবিত করিয়াছিল। তৃতীয়তঃ, ফরাসী-বিপ্লবের অনুপ্রেরণা। ফরাসী-বিপ্লব এক হিসাবে ব্যর্থ হইলেও বিপ্লববাদীদের সেই 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার' উদাত্ত বাণী মানুষের ভাবজগতকে নবজন্ম দান করিয়া গিয়াছে। এই তিনটি কারণেই রোমাণ্টিক যুগ সম্ভবপর হইয়াছে—মানুষের চক্ষে বিশ্ব অভিনব রূপে দেখা দিয়াছে।

Romantic যুগ প্রবর্ত্তনের কারণ নির্দ্দেশ

সমালোচকগণ এক এক ভাবে এই মানস-দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আমরা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মত আলোচনা করিব। Watts-Dunton বলেন, রোমান্টিক ভাব-কল্পনার বিশেষত্ব, বিস্ময়-রসের পুনর্জীবন (*Renascence of wonder*); Pater ইহাকে সুন্দরের সহিত অদ্ভুতের পরিণয় (*Addition of strangeness to beauty*), Victor Hugo ইহাকে সাহিত্যে উদার-প্রাণতা, Brunetiere ইহাকে সাহিত্যে আত্ম-মুক্তি, আবার কেহ বা ইহাকে প্রকৃতির রূপ-মাধুর্য্য আস্বাদন (*Return to Nature*) বা অতীতের প্রতি শ্রদ্ধারূপে আখ্যাত করিয়াছেন। ইঁহাদের কোন সংজ্ঞাই সর্ব্বদেশদর্শী নয়। এইজন্য জনৈক সমালোচক বলেন—

Romanticism অর্থ কি ?

"One poet is romantic because he falls in love; another romantic because he sees a ghost; another romantic because he hears a cuckoo; another romantic because he is reconciled to the church."

এমতাবস্থায় আমরা Herford-এর "*An extraordinary development of imaginative sensibility*"-কেই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী সংজ্ঞা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। তিনি বলেন যে, কল্পনা-প্রবণতার অসাধারণ বিকাশই রোমান্টিক কবিতার লক্ষণ। সত্য কথা বলিতে কি, কল্পনা-প্রবণতাই উনবিংশ শতাব্দীর কবিতাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর সংযত-কল্পনার যুগ হইতে বিভিন্ন করিয়াছে। যাঁহার কল্পনা নাই, তিনি কখনো বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে সাধারণ জিনিষের মহিমার দিকটি উপলব্ধি করিতে পারেন না; কল্পনা না থাকিলে কখনো সুন্দর ও অদ্ভুতের মিলনটি কাহারও দৃষ্টি-সম্মুখে প্রত্যক্ষ হয় না। স্বল্প-সন্তুষ্ট, কল্পনা-বিহীন মানুষ কখনো আত্ম-মুক্তির প্রয়োজন অনুভব করে না বা বিশ্বের যাবতীয় বস্তু-সত্তাকে উদার অনুভূতির দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে না। আবার, এই কল্পনা-বলেই কবি বর্ত্তমানের বন্ধন-বিমুক্ত হইয়া, কখনো অতীতের স্মৃতি-গুঞ্জরণে, কখনো বা অনাগতের মোহে মুগ্ধ হইতে পারেন অথবা প্রকৃতির রূপ-রস আস্বাদন করিতে পারেন। সুতরাং দেখা যায় যে, এই একটিমাত্র কথাই *Romanticism*-এর অন্তর্নিহিত সত্যকে সমগ্রভাবে প্রকাশ করে। ইংরেজী সাহিত্যেও দেখিতে পাই যে, এই কল্পনা বলেই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সাধারণ বস্তুকে অসাধারণ গৌরব দান করিয়া প্রকৃতি-পূজায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিয়াছেন; কোল্‌রিজ অতি-প্রাকৃত

পরিবেশকে স্বাভাবিকত্ব দান করিয়াছেন; শেলী অনাগত জগতের কল্পনায় বিমুগ্ধ; কীটস্ ও স্কট্ অতীত ও মধ্যযুগের মধু আহরণ করিতেছেন; এবং বায়রণ আত্মমুক্তির আকাঙ্ক্ষায় অধীর হইয়া উঠিতেছেন। কবির আত্ম-মুক্তি কখনো বা দুর্নিবার কামনায়, অশান্ত আর্ত্তনাদে, কখনো বা বেদনাবিধুর নৈরাশ্যের সুরে বা সর্ব্বজয়ী হৃদয়াবেগ প্রতিষ্ঠা-কল্পনায় রোমাণ্টিক-সাহিত্যে রূপ লাভ করে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ইঁহাদের প্রত্যেকের কল্পনাই একান্তভাবে আত্ম-পরায়ণ ও আত্মভাব বিশ্লেষণ-মূলক।

অনেকে মনে করেন, *Romantic* ও *Classical*- এই দুইটি মানস-দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্ম্মী। কিন্তু ইহা ভ্রান্ত ধারণা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দুইটি মানস-দৃষ্টি একই কবির কবিতায় বর্ত্তমান থাকিতে পারে। কবি যখন জগত ও জীবনের ভাবচিন্তাকে নিয়মের মধ্যে, সংযমের মধ্যে, ধীর স্থির ভাবে প্রত্যক্ষ করেন, তখন তাঁহার দৃষ্টি ক্ল্যাসিক্যাল্; কিন্তু তিনি যখন স্বকীয় ব্যক্তি-কল্পনার আলোকে উহাকে বিশোধিত করিয়া গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার দৃষ্টি রোমাণ্টিক। কাব্যে বিভিন্ন ভাব-কল্পনা যখন একটি বিশেষ কল্পনা-প্রবণতায় আত্মপ্রকাশ করে, তখনই উহা রোমাণ্টিক; এই বিভিন্নতাকে যখন সঙ্গতি দান করা হয়, তখনই উহাতে ক্ল্যাসিসিজমের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এইজন্যই Abercrombie বলেন, 'There are elements which can join together in a concord of equilibrium ; and such concord, such a health, is Classicism', রোমাণ্টিক কল্পনা মানবচিত্তকে আন্দোলিত, উদ্বেলিত ও সচল করে; ক্লাসিক কল্পনা সংযত ও সংহত করে। রোমাণ্টিক দৃষ্টি অঘটনঘটনপটীয়সী, অশান্ত, বিদ্রোহী; ক্ল্যাসিক্যাল্ দৃষ্টি শান্ত সমাহিত-সাধনার পক্ষপাতী। রোমাণ্টিক দৃষ্টি ভাবাবেগ মুগ্ধ, রং-বিহ্বল, ক্ল্যাসিক কল্পনা স্বচ্ছ, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। রোমাণ্টিক কবি তাহার কাব্য-প্রেরণার অধীন, ক্ল্যাসিক কবি উহার প্রভু। প্রথমটির কথা বলিতেই আমরা উত্তেজনা, উন্মাদনা, প্রাণ-প্রাচুর্য্য প্রভৃতি সম্বন্ধে সচেতন হই; দ্বিতীয়টির কথা বলিলে আমরা প্রশান্তি, যথাযোগ্যতা, সংযম, আত্মস্থতা প্রভৃতি সম্বন্ধে সজাগ

Romantic ও Classical দৃষ্টিভঙ্গি

হই। বলা বাহুল্য, কোন কাব্যে এই দুই লক্ষণই বিদ্যমান থাকিতে পারে। যেখানে বা যে-সাহিত্যে শুধু একরূপ ভাবধারা প্রবল, সে-সাহিত্য রোমাণ্টিক হইলে, অতিরিক্ত ভাবাতিরেকের স্তরে উত্তীর্ণ হয়; এবং ক্ল্যাসিক্যাল হইলে রসহীন, প্রাণহীন পদার্থে পরিণত হয়। কোন্ সাহিত্য রোমাণ্টিক, কোন্ সাহিত্য ক্ল্যাসিক্যাল, ইহা বিচার করিতে কবির মানস-দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। যে-কাব্যে কবি-মানসের কল্পনায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিকাশ হইয়াছে, উহাকে আমরা রোমাণ্টিক বলিব; আবার, এই কল্পনা যেইখানে বিশেষ একটি সীমায়িত রূপ-বন্ধের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, উহার উদ্বেলতা যেইখানে শান্ত-সংযত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, সেই কাব্য ক্ল্যাসিক্যাল। কারণ কল্পনার দ্বিবিধ প্রকাশের যেইটি প্রধান, তাহার অনুসারেই সাধারণতঃ কাব্যের ধর্ম্ম নির্দ্দেশিত হয়। Shelleyর *Ode to the West Wind* রোমাণ্টিক কল্পনার চরম দৃষ্টান্ত, Wordsworthএর *Laodamia* কবিতায় উদ্বেলতা অপেক্ষা গভীরতা বেশি, উহা ক্ল্যাসিক্যাল। মিল্টনের বা মধুসূদনেব মহাকাব্য রূপ-বন্ধের দিক দিয়া ক্ল্যাসিক্যাল, কিন্তু ভাবাবেগের দিক দিয়া রোমাণ্টিক। আমাদের মনে হয়, সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে যেমন কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তির সমন্বয় হইয়া থাকে, তাদৃশ কাব্যেও তেমন এই দ্বিবিধ মানস-ভঙ্গিরই সমন্বয় সাধন হইয়া থাকে। এইজন্যই এই দুইটিকে মানব-হৃদয়-যন্ত্রের উত্থান ও পতনের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। হৃদ্‌যন্ত্রের উত্থান পতনকে সাহায্য করে এবং পতনের পর উত্থানেরও জৈবিক প্রযোজন আছে। সাহিত্যেও তেমন, কল্পনা-প্রবণতা ও সংযম—এই দুইটিই প্রয়োজনীয়। ইহা হইতে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, ***Romanticism*** ও ***Classicism***-এর মধ্যে সত্যকার কোন বিরোধ নাই, বরং একটি অপরটির পরিপূরক এবং সত্যকারেব বিরোধ Romanticism ও Realismএর মধ্যে।

ভারতচন্দ্র-প্রমুখ কবিদের যুগে যুক্তি-প্রধান, বস্তুনিষ্ঠ ও বিদ্রূপাত্মক রচনারই প্রাধান্য ছিল। বিশেষতঃ, ছন্দের দিক দিয়াও এই যুগে পয়ার ছন্দই কায়েমী হইয়া উঠিয়াছিল। পরবর্ত্তী কবিদের কালে ইহার বিরুদ্ধে ভাববাদ, ব্যক্তি-নিষ্ঠা ও কল্পনা-প্রবণতার যে নবযুগ

বাংলা সাহিত্যে **Romanticism**

প্রবর্ত্তিত হইল, তাহাই বাংলা সাহিত্যেও রোমাণ্টিক যুগ বলিয়া অভিহিত। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য ইংরেজী তথা ইয়োরোপীয় সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত, এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষার ফলে ও বিশেষ করিয়া ইংরেজী সাহিত্য পঠন-পাঠনের ফলে বাংলার জাতি, ধর্ম্ম ও সাহিত্য-জীবনে যে নবযুগের আবির্ভাব হইল, তাহাই বাঙ্গালীর চিন্তাধারাকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দিকে, স্বাধীনতার দিকে ও আত্ম-আবিষ্কারের দিকে পরিচালিত করিল। নবজাগরণ যেন বাঙ্গালীর কল্পনায় আগুন ধরাইয়া দিল—বাঙ্গালী যে-সাহিত্য সৃষ্টি করিল, তাহা মূলতঃ রোমাণ্টিক পথেই অগ্রসর হইল। মধুসূদন দত্তের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যময় বিদ্রোহী ভাব-কল্পনায়, ও ছন্দ-সৃষ্টিতে, বঙ্কিম চন্দ্রের উপন্যাসে সমাজ ও নিয়তি-লাঞ্ছিত মানব-জীবনের ব্যর্থতার মহিমময়তায়, রমেশচন্দ্রের অতীত-বিহারী উপন্যাস-সৃষ্টিতে, নবীন চন্দ্রের অতীত-উদ্ধারে, হেমচন্দ্রের আত্ম-বিলাপে, বিহারীলালের আত্ম-বিভোরতায়, রবীন্দ্রনাথের অত্যুচ্চ ভাববাদে এবং শরৎচন্দ্রের পতিত ও নির্য্যাতিত মানবতার প্রতি শ্রদ্ধায়—সেই একই রোমাণ্টিক সুর।

১৪

সাহিত্যে বস্তুতন্ত্র ও ভাবতন্ত্র

(*Realism and Idealism*)

যুগে যুগে সাহিত্যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যিক যখন জগৎ জীবন ও প্রকৃতিকে যথাযথ রূপে রূপ দিতে চেষ্টা করেন, তখনই উহা বস্তুতান্ত্রিক (*Realistic*) হইয়া উঠে। বাস্তবনিষ্ঠতা ভাবতন্ত্র এবং কল্পনা-প্রবণতার বিপরীত। বাস্তবপন্থী সাহিত্যিক অধিকাংশ সময়—স্থানীয় পটভূমি বা যুগমানসের নিখুঁত চিত্রাঙ্কনের সাহায্যে, সমসাময়িক ঘটনা বা কাহিনীর অবতারণায়, অতি সাধারণ নরনারীর পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপায়নে, বৈজ্ঞানিক ও বাণিজ্যিক সভ্যতায় পরিপুষ্ট শব্দ-সম্ভার গ্রহণে ও সাধারণ, এমন কি প্রাকৃত-জনসুলভ ভাষা অনুকরণে তাঁহাব সাহিত্য-কর্ম্মের বিচিত্র রূপসৃষ্টি করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সাহিত্যে এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গির যে কয়েকটি কারণ আছে, তন্মধ্যে দার্শনিকপ্রবর কোঁৎ (Comte)-প্রবর্ত্তিত প্রত্যক্ষবাদই (*Positivism*) প্রধান। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারও এই যুগের সাহিত্যিকের দৃষ্টিকে প্রভাবিত করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তৃতীয়তঃ, জার্ম্মান দার্শনিক Feuerbach বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির আলোকে মানুষের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেন এবং এই নশ্বর প্রত্যক্ষ জীবনই চরম সত্য বলিয়া প্রচার করেন। তাঁহার এই জীবন-দর্শনও সাহিত্যিক বস্তুতন্ত্র আমদানী করিতে সাহায্য করিয়াছে। ফরাসী সাহিত্যে Champfleury, Balzac, Flaubert, রুশীয় সাহিত্যে Turgenév, Tolstoy, ইংরেজীতে Thackeray, Dickens, George Eliot, A. Bennett প্রভৃতি বাস্তব-নিষ্ঠ সাহিত্যিক। রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' -বাংলা সাহিত্যে বস্তু-তান্ত্রিকতা সূচনা করিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন।

পরবর্ত্তীকালে নরেশ সেনগুপ্ত, অচিন্ত্য সেন, বুদ্ধদেব বসু, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধারাকে পরিপুষ্ট করেন। আধুনিক কালের 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' গ্রন্থে সুস্থ বস্তুতান্ত্রিকতা কবি-দৃষ্টিতে বিধৌত হইয়া উঠিয়াছে।

বস্তু ও ভাবের পরম সমন্বিত রস-সৃষ্টিই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড। তথ্যগত সত্য নহে, ভাবগত সত্যই যেমন বিষয়-বস্তুর উৎকর্ষের পরিমাপক, রূপ-সংহতি (*Symmetry*) তেমন উহার পরিবেশন-শিল্পের (*Manner*) পরিমাপক এবং সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি আদর্শবাদের দ্যোতক। যে-সাহিত্যে ইহাদের অভাব ঘটিয়াছে, উহা উৎকৃষ্ট সাহিত্য পদবাচ্য হয় নাই বুঝিতে হইবে। ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে বহুশ্রুতত্ব, রসবোধ ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সহিত পরিচয় বাঞ্ছনীয়। যে-শ্রেণীর সাহিত্যে লেখক জীবনের তথ্য-ঘটিত যথাযথ বর্ণনা দ্বারা একরূপ জড়বাদের পূজা না করিয়া বরং জগৎ ও জীবনের তথ্য-সত্যকে উচ্চতর কল্পনার আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া দেখেন এবং উহার অপার রহস্যের চিন্ময় মূর্ত্তি পাঠকের গোচর করেন, তাহাকে ভাবতান্ত্রিক সাহিত্য (***Idealistic Literature***) বলে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফরাসী সাহিত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কয়েকজন ইংরেজ সাহিত্যিক তাহাদের সাহিত্যে জীবনের কুশ্রী ও গোপন দিকটির যথাযথ অভিব্যক্তি দান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে সাহিত্যে শুধু আলোকচিত্র-সুলভ বাস্তবতারই আমদানী হইল না, পরন্তু, সাহিত্য কবি-মানস-দীপ্তি ও অনুভূতি-বর্জ্জিত হইয়া নির্লজ্জ ও অশোভন, এমন কি কুৎসিত রূপে আত্মপ্রকাশ করিল।

জীবনের কুশ্রী বা গোপনীয় দিকটি সাহিত্যে স্থান লাভ করিতে পারে না, এমন কথা আমরা বলি না। কিন্তু সাহিত্যিক যদি জীবনের পঙ্ক হইতে পঙ্কজের সৃষ্টি করিতে না পারেন, তবে তাঁহার সৃষ্টির কোন সার্থকতা নাই। কারণ, তথাকথিত বস্তুতান্ত্রিক যে সত্য-কল্পনা-প্রয়াসী, তাহা সাহিত্যের সীমানার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। এই ধরণের কল্পনা মূলতঃ তথ্যাশ্রয়ী। অর্থনীতি ও রাজনীতি শাস্ত্রে, সরকারী বিবরণীতে স্কুল-কলেজে ছাত্রদের নামডাকের বহিতে বা বাজার-

হিসাবে তথ্য-ঘটিত সত্যের অভাব নাই। কিন্তু, এমন বোধ হয় কেহ নাই, যিনি উহাদিগকে সাহিত্যিক মর্য্যাদা দান করিতে চাহেন।

দৃষ্টান্ত স্থলে আরও বলা যায়, মানুষের সম্বন্ধে সত্য-সন্ধানী হইয়া যিনি শারীর-বিদ্যার সাহায্যে কোন সত্য আবিষ্কার করেন, তাহা সাহিত্যের সীমানার বহির্ভূত; কিন্তু মানুষকে যেখানে 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলিয়া আহ্বান করা হইয়াছে, সেখানে উহা সাহিত্য। কারণ, রক্ত মাংসের মানুষ সেখানে মানুষের দুর্ব্বলতাকে স্বীকার করিয়াও, তাহাকে মাটির পৃথিবীতে রাখিয়াও, অমৃতের স্পর্শে গরীয়ান করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং বলিতে হয় যে, নিছক বাস্তবতা সাহিত্যের উপজীব্য হইতে পারে না এবং নিছক বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য বিশুদ্ধ সাহিত্য-রূপ-কল্পনার বিরোধী। সাহিত্যে যাহাকে আমরা বাস্তব বলি, তাহা নিছক জড়-বাস্তব নয়, চিন্ময় বাস্তব। কারণ সাহিত্য—তথা ললিতকলা, বাস্তবকে রূপান্তরিত করিয়া, নবজন্ম পরিগ্রহ করাইয়া সুন্দর রস-মূর্ত্তিতে প্রকাশ করে। আসল কথা এই যে, বাস্তবতা ভাববাদের (*Idealism*) স্পর্শে কাব্যগত সত্যে উন্নীত হইয়াও ভাবাতিরেকের সীমা লঙ্ঘন করিবে না, এবং ভাববাদও লেখকের আত্ম-পরায়ণ উৎকেন্দ্রিকতা-মুক্ত হইয়া পাঠককে কাব্য সত্যে মুগ্ধ করিবে। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে যে-প্রকার বাস্তবতাই দৃষ্ট হয়, উহাকে আমরা ভাবাবাদের বাস্তবতা (*Realism of Idealism*) বলিতে পারি। এইজন্যই ষ্টিভেনসন্ বলেন—

'And the *true realism* were that of the poets, to climb up after him like a squirrel, and catch some glimpse of heaven for which he lives. And the true realism, always and everywhere, is that of the poets : to find out where joy resides, and give it a voice far beyond singing.'

সাহিত্যে বস্তুতন্ত্র ও ভাবতন্ত্র সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র গুপ্ত বলেন, 'কোন্ কবি কোন্ কলা-কৌশল অবলম্বন করবেন, তা নির্ভর করে তাঁর প্রতিভার বিশেষত্বের উপর। এই দুই কৌশলের সৃষ্ট রসের মধ্যে আস্বাদের প্রভেদ আছে, কিন্তু রসত্বের প্রভেদ নাই। সুতরাং কেউ কাউকে কাব্যের জগৎ থেকে

নির্ব্বাসন দেবার অধিকারী নয়'।* এইস্থলে আমাদেরও বক্তব্য এই যে, 'প্রতিভার বিশেষত্ব' থাকিলে কোন কবি বা সাহিত্যিককে 'নির্ব্বাসন দেবার' কথা অবশ্য আসে না। কিন্তু নিছক বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের অন্য কোন প্রয়োজন থাকিলেও উহা সাহিত্য নামক রূপ-কর্ম্ম পদবাচ্য কিনা সন্দেহ। জনৈক বিখ্যাত সমালোচকের ভাষায় বলা যাইতে পারে—

'The weakness of realistic art is that it does not create beauty, power, significance or meaning greater than the representation of medeocrity and triviality'.

—এবং ইহার ফলে নিছক বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য অনেক সময়ই সার্থক রূপ সৃষ্টির (*work of art*) পর্য্যায়ে উন্নীত হয় না।

১৫

সাহিত্যে রস-সর্ব্বস্বতা নীতি

(*Art for Art's sake*)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সাহিত্য ও যাবতীয় ললিতকলার জগতে ইংলণ্ডে এক আন্দোলন উপস্থিত হয়। ইহার পূর্ব্বে সাহিত্যে এই আন্দোলনের উদ্যোক্তাগণের মধ্যে ফরাসী দেশের Zola, Baudelaire প্রমুখ লেখকগণ বিশেষ বিখ্যাত। য়ুরোপীয় সাহিত্যে Aristotle, Plato, Lessing, Cousin, Ruskin, Matthew Arnold প্রভৃতি যে-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার মূলমন্ত্র এই যে, সাহিত্যের উদ্দেশ্য, জীবনে সত্য, সুন্দর ও শিবের প্রতিষ্ঠা। সাহিত্যিক মানবজীবনের কাহিনী হইতে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়া তাহাকে কল্পনার আলোকে অভিনব রূপে প্রকাশ করিবেন।

---

* কাব্য-জিজ্ঞাসা।

এই মতবাদের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে Whistler, Swinburne, Oscar Wilde প্রমুখ কয়েকজন সাহিত্যিক বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ফলে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে যে-সাহিত্য সৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যে নীতিহীন উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোত চলিতে থাকে। এই নূতন-পন্থীগণ বলিতে চাহেন যে, সাহিত্যে ও শিল্পে জীবন-ঘটিত কোন আদর্শ বা নীতির শাসন না থাকিলেও চলিতে পারে, কারণ নিছক রস-সৃষ্টি (*Art for Art's sake*) ব্যতীত সাহিত্যের আর কোন উদ্দেশ্য নাই। এইজন্যই ইহাদের সৃষ্টিতে *'Sense of fact'* বা 'বাস্তবতা-বোধ'-এর প্রাধান্যই বেশী পরিলক্ষিত হয়। মানব-জীবনের নগ্নতা, মানুষের দীনতা, হীনতা, স্বার্থপরতা, বুভুক্ষা, কামনা, আসঙ্গ-লিপ্সা প্রভৃতি সকলকেই যথাযথরূপে মূর্ত্ত করিবার অধিকার সাহিত্যিকের আছে, ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। তাই তাঁহারা সাহিত্যে নূতনতর বস্তুতন্ত্রের আমদানী করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের উৎকেন্দ্রিক সৃষ্টি তাঁহাদিগকে কোথায় লইয়া যাইতেছিল, তাহা একবারও তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন নাই। বাংলা দেশেও বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে কতিপয় সাহিত্য-বিলাসী এই সৃষ্টি-মোহে অধীর হইয়া যে-সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছিলেন, তাহা এই দেশেও 'কামায়ন সাহিত্য' আখ্যা লাভ করিয়াছিল।

এখন কথা এই যে, *Art for Art's sake* বা সাহিত্যে রসসর্ব্বতার নীতি চলিতে পারে কিনা। সকলেই স্বীকার করেন যে, *Art* বা রূপ-কর্ম্ম মানুষেরই অন্তরের প্রেরণার সৃষ্টি। বাস্তব জীবনে যাহা পাওয়া যায় না, সাহিত্যে ও শিল্পে মানুষের সেই স্বপ্ন-কামনাই জীবনের পরিপূরক রূপে ফুটিয়া উঠে। মানুষ পূর্ণভাবে বাঁচিতে চায়, জীবনকে সুন্দর করিয়া পাইতে চায়; এইজন্যই তাহার শিল্পানুরাগ ও সাহিত্য-সৃষ্টি। সুতরাং সাহিত্যকে জীবনের আদর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে উহার মূলচ্ছেদ করা হয়। অবশ্য, মূলচ্ছেদ হইলে শিল্প-তরু বাঁচিতে পারে কিনা, ইহা স্বল্প-বুদ্ধিরও বুঝিতে বাকি থাকে না।

অর্থনীতি শাস্ত্রে কথা আছে, টাকার নিজের কোন মূল্য নাই, বিনিময়-সামর্থ্যই উহার মূল্য নিয়ামক। *Art*-এর মূল্যও তেমন ইহার স্বপ্রতিষ্ঠায় নহে, জীবনের সহিত ইহার নিগূঢ় সম্পর্ক রক্ষায়। কারণ, আর্ট জীবনের কাহিনী দ্বারাই

সঞ্জীবিত ও পরিপুষ্ট। ইহাতে শুধু স্রষ্টার আত্মভাবস্পর্দ্ধী ব্যক্তি-কামনার প্রকাশ পাইলে চলিবে না। তৃতীয়তঃ, জীবন সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য, এই দিক হইতে চিন্তা করিলেও সাহিত্য নীতিহীন হইতে পারে না। অবশ্য, উহা নীতি-শাস্ত্রের নীতি হইবার অপেক্ষা রাখে না, কারণ, জীবনের গভীরতর নীতি, সৃষ্টির গূঢ় রহস্য-নীতি উহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবেই। ইহাও যদি না থাকে, তবে সাহিত্যের —যাহা কোন বৃন্ত-বিধৃত জীবনের রূপময়-প্রকাশ, রূপের রূপত্বই থাকে না; ফলে, সাহিত্যও হইয়া উঠিতে পারে না।

চতুর্থতঃ, এই বাস্তব-পন্থীদের অনেকে বলেন যে, যেহেতু আর্ট জীবনের অনুগামী, সুতরাং জীবনের সকল 'বিশৃঙ্খলা, আকস্মিকতা ও অর্থহীন বস্তু-স্তূপকে' ইহার স্বীকার করিতেই হইবে, কোন সীমা-নির্দ্দেশ ইহার পক্ষে সঙ্গত হইবে না। ইহাতেই এই নূতন পন্থীদের সাহিত্যে একজাতীয় অকুণ্ঠ লজ্জাহীন বাস্তবতার উদ্ভব হয়।

এইস্থলে বক্তব্য এই যে, জীবনের যাবতীয় জিনিস বা ঘটনাকে সাহিত্যিক কোনদিনই গ্রহণ করেন না। জীবনের যে-কথা সুবিহিত সু-সমঞ্জস সৌন্দর্য্য-দীপ্তিতে ভাস্বর হইতে পারে, তাহাই সাহিত্যের উপজীব্য। সাহিত্য যাবতীয় বিষয়-বস্তুকে সর্ব্বব্যাপী উদার মনোভাবের দ্বারা গ্রহণ করিবে, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত কথা। ইহার বিষয়বস্তু বারাঙ্গনাব দেহ-বিপণিই হউক, পতিতার কামগন্ধী আত্ম-চরিতই হউক বা যৌনতত্ত্বই হউক, তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু সাহিত্যিক নিজের কল্পনার সাহায্যে তাঁহার বিষয়বস্তুকে পরিবর্ত্তিত করিয়া জীবন ও জগত-রহস্যের মণ্ডলায়িত সৌন্দর্য্য-সুষমা সৃষ্টি করিবেন। ব্রাউনিং তাঁহার সুর-শিল্পী *Abt Vogler* সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকল শিল্পীরই সাধনার বস্তু—

"Out of three sounds he framel not a fourth sound, but a star."

আমাদের শরৎচন্দ্রও বলেন—

"Art for Art's sake কথাটা যদি সত্য হয়, তা হ'লে কিছুতেই তা immoral এবং অকল্যাণকব হতে পারে না এবং অকল্যাণকর এবং immoral হ'লে Art for

Art's sake কথাটাও কিছুতেই নয়, শত সহস্র লোক তুমুল শব্দ করে বললেও সত্য নয়। মানব জাতির মধ্যে যে বড়প্রাণ আছে সে একে কোনমতেই গ্রহণ করে না।"§

এই সম্বন্ধে *G. K. Chesterton*-এর মত নির্ভীক কথা এই যুগে আর কেহ বলিয়াছেন কিনা জানিনা—

'There must always be a moral soil for any great aesthetic growth. The principle of *Art for Art's sake* is a very good principle if it means that there is vital distinction between the earth and the tree that has its roots in the earth, but it is a very bad principle if it means that the tree could grow just as well with its roots in air'.

সুতরাং দেখা যায়, আর্টে কোন ক্রমেই রসসর্ব্বস্বতা-নীতিকে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ডি. এইচ্. লরেন্স যখন বলিয়াছিলেন যে, Art for *my* sake-ই একমাত্র নীতি, তখন তিনি নিজের অজানিতেও অনেকখানি সত্য বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। সাহিত্যিক নিজের জন্য, আত্ম-মুক্তির জন্য সাহিত্য-সৃষ্টি করেন বটে, কিন্তু তাঁহার এই 'আমি' একান্ত ভাবে আত্ম-পূজা-নহে। স্ব এবং বিশ্ব বা পাঠকজন, এই দুইয়ের সহযোগে সাহিত্যিকের ব্যক্তি-সত্তা গঠিত হয়। কাজেই, আর্টে রস-সর্ব্বস্বতা-নীতির পরিবর্ত্তে, সর্ব্বজনীন জীবন-রস-সৃষ্টিকেই প্রাধান্য দেওয়া আমরা শ্রেয়ঃ মনে করি। ইহাই সাহিত্যের স্ব-ধর্ম্ম।

---

§ শরৎচন্দ্র : স্বদেশ ও সাহিত্য

১৬

বাণীভঙ্গি

বিশ্বের এক একটী লোক এক একটী বিভিন্ন সৃষ্টি। জাতি হিসাবে সকল মানুষই এক হইলেও ব্যক্তি হিসাবে প্রত্যেকের কোন না কোন বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্য গুণেই একজন অপর আর একজন হইতে বিভিন্ন। সুতরাং দেখা যায়, ব্যক্তি-বিশেষ যেখানে সকলের সঙ্গে এক, সেখানে সে ব্যক্তিত্বহীন; সেখানে সে সকলের অপেক্ষা অন্যতর, সেখানেই তাহার স্বকীয়তা। ব্যবহারিক জীবনের এই একান্ত স্বকীয়তা যেমন ব্যক্তি-পরিচায়ক, সাহিত্য-জগতেও তেমনই লেখকের বিশিষ্ট রচনা-ভঙ্গী তাঁহার মানস-ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। অর্থাৎ দুইটী জগতেই মানুষের একটী বিশেষ ষ্টাইল্ আছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, যিনি শুধু অন্যের গ্রামোফোন্, তাঁহার কোন ষ্টাইল্ নাই—তিনি নকল।

সূচনা

সাহিত্য-জগতে রচনার এই বিশিষ্টতাকে আমরা ষ্টাইল্* বা বাণীভঙ্গি বলি। যাহার ষ্টাইল্ নাই, তিনি শুদ্ধ লিখিতে পারেন, সহজ লিখিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্ব দ্বারা আমাদিগকে অভিভূত করিতে পারেন না। একান্ত সংস্কৃত-বহুল রচনার মধ্যে যখন দেখি, লেখকের ভাষায় অতি সুগভীর একটি স্নিগ্ধ সকরুণ প্রসাদগুণ, তখনই মনে হয়, ইহা নিশ্চয়ই বিদ্যাসাগরের লেখা; যখন দেখি, কঠোরতার সহিত কোমলতার সম্মিলনে বুদ্ধি ও অনুভূতি এক হইয়া গিয়াছে, তখন মনে হয়, ইনি বঙ্কিমচন্দ্র; যখন দেখি, ভাষা আবেগ-কম্পনে মৃদুতাসম্পন্ন, তখনই মনে করি ইনি শরৎচন্দ্র;

সাহিত্যে ষ্টাইল

* *Cf*: Style is an emanation, an impalpable quality which issues forth from a work of art and constitutes its claim to uniqueness.
—*T.. G.. Williams.*

আবার যখন দেখি, বুদ্ধির অপূর্ব্ব সূক্ষ্মতা যেন চৈতন্যের তুরীয় জগতে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তখনই মনে হয়, ইনি রবীন্দ্রনাথ।

সাহিত্যের ষ্টাইল্ বলিতে আমরা উহার বিষয়-বস্তু, লেখকের ব্যক্তিত্ব, ও প্রকাশ-ভঙ্গি—এই তিনটির কথা ভাবি। বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া কবি-কল্পনা বিস্তার লাভ করিতে থাকে; কবি তাহাকে সুবিহিত চিন্তার দ্বারা যথা-প্রয়োজনীয় রূপে নমনীয় ও কমনীয় করিয়া তোলেন। কবি-কল্পনা কোন বিশেষ কেন্দ্রে লগ্ন থাকিয়াই মূল বিষয়ের অনুসঙ্গী নানা ভাব-কল্পনার সংযোজনায় একটি অখণ্ড সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে। এইজন্য আমরা বিষয়বস্তুকে ষ্টাইলের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতে পারি। Pater বলেন :—

"The chief stimulus of good style is to possess a full rich complex matter to deal with'.

এই প্রসঙ্গে আমরা বলিতে পারি যে, বিষযবস্তু বা ভাব-কল্পনা (*Thought*) ষ্টাইলের প্রকৃতি নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ করিলেও ইহাকে ষ্টাইল্ বলা যাইতে পারেনা। অনেকে আবার বিষয়বস্তুর প্রকাশ-ভঙ্গিকে ষ্টাইলের সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করেন। সংস্কৃত আলঙ্কারিক বামন বলেন, 'বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ' অর্থাৎ কাব্যের বিশিষ্ট অবয়ব-সংস্থানই ষ্টাইল্। কিন্তু বিশিষ্ট পদরচনা, যাহা বাক্যরচনার একটা বহির্ভূত ভঙ্গি—সেই রীতি ও আমরা যাহাকে ষ্টাইল্ বলিয়াছি, তাহা এক বস্তু নয়। 'রীতি' কারিগরী বিদ্যার চরমোৎকর্ষ, ষ্টাইল্ লেখকের ব্যক্তি-চরিত্রের মৌলিক ভাব-প্রেরণার স্বকীয় প্রকাশ। পাঠকের মনে বিষয়ানুরূপ ভাবসঞ্চারই প্রকাশ-ভঙ্গির প্রধান উদ্দেশ্য। প্রকাশ-ভঙ্গির সহিত আবার প্রকাশক বা লেখকের ব্যক্তিত্ব অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিজড়িত। লেখকের মন বিষয়-বস্তুকে আত্ম-গোচর করিয়া তাহাকে অর্থ-সমন্বিত শব্দরূপ দান করে। সুতরাং লেখকের যথানুরূপ বিষয়-বিন্যাস, শব্দ-চয়ন-শিল্পে ও চিত্র-নিপুণতায় অবহিত হইতে হইবে। ভাষার মিতাক্ষর-গাঢ়তা বা পরিমিতি রক্ষা করিবার জন্য সুলেখক উপযুক্ত শব্দকেই গ্রহণ ও বর্জ্জনের সাহায্যে শব্দের ভিড় হইতে নির্ব্বাচন করেন। তিনি

† *Cf: 'Style is a form of words'—A. Bennett.*

নিজেও জানেন না, কোন শব্দটি তাঁহার বক্তব্যের বাহনরূপে সার্থক হইবে। কিন্তু সহসা তাঁহার নিজের অজানিতে যথা-প্রয়োজনীয় শব্দটি তাঁহার লেখনী-মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়; তিনি যেন সহসা নিজের প্রজ্ঞা বলে সেই শব্দটিকে আবিষ্কার করেন। এই শব্দ-চয়ন সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—

'কতকগুলো শব্দ প্রয়োগের দ্বারা যিনি বাগাড়ম্বর করিতে পারেন, তাহাকে শব্দ-চতুর বলি না, অথবা যিনি শ্রুতি-মধুর শব্দ-প্রয়োগে দক্ষ, তাঁহাকেও বলি না। কাব্যোপযোগী শব্দের মাহাত্ম্য এই যে, একটি বিশেষ শব্দ প্রয়োগ করিলে তদভিপ্রেত পদার্থ ভিন্ন অন্যান্য আনন্দদায়ক পদার্থ স্মরণ পথে আইসে।'

এই 'বিশেষ শব্দটির' মধ্যে একদিকে যেমন ভাব-কল্পনার প্রকাশোপযোগী সংক্ষিপ্ততা বা রসঘনতা আছে, তেমনি আবার লেখকের আন্তরিকতার সৌরভ-স্পর্শ (perfume) আছে। এইজন্যই বাণীভঙ্গি লেখকের মননশীলতা ও আন্তরিকতা—উভয় রসেই রসায়িত হইয়া আত্ম-প্রকাশ করে। লেখকের বাণীভঙ্গির অন্তরালে তখন তাঁহার ব্যক্তি-সত্তা স্পন্দিত হয় বলিয়াই আমরা বলিয়া থাকি, *Style is the man.* (*Le Style c'est l'homme*)

Lucas বলেন—

Style is a means by which a human being gains contact with others; it is personality clothed in words, character embodied in speech.

অর্থাৎসেই ষ্টাইল্ লেখকের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, 'নিছক ব্যক্তি-দৃষ্টি-ভঙ্গিই' শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির অনুকূল নহে। কারণ, ব্যক্তি-চিন্তা বা ব্যক্তি-কল্পনা. অধিকাংশ সময়ই আত্ম-তৃপ্তির ভাবাতিরেকে অভিভূত হইয়া একান্তভাবে আত্ম-বিলাসী হইতে পারে এবং তাহা হইলে লেখক অপরের হৃদয়ে ভাব-সঞ্চার করিতে পারেন না। সুতরাং লেখকের ব্যক্তিগত দৃষ্টি-ভঙ্গি মাত্র বিশিষ্ট বাণীভঙ্গি না-ও হইতে পারে। সত্যকার বাণীভঙ্গিতে একান্ত ব্যক্তি-কথা একান্ত ভাবেই নৈর্ব্যক্তিক হইয়া উঠে। এইজন্যই ষ্টাইলের পরিপূর্ণ প্রকাশে বিষয়বস্তু, লেখকের ব্যক্তিত্ব ও কলাকুশলতা—ইহাদের ত্রিবেণী-সঙ্গম ঘটে। বিষয়বস্তু ভাব-কল্পনাকে রূপ দেয়, ব্যক্তিত্ব লেখকের মানস-সত্তাকে

প্রকাশিত করে এবং কলাকুশলতা ভাব-কল্পনাকে বাচ্যাতীতরূপে সমর্পণ করে। লক্ষ্য করিবার এই যে, এই তিনটির মধ্যে প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য 'প্রকাশ'। বিষয়বস্তু যেমন স্বপ্রকাশ হয়, লেখক তেমনই তাঁহার ব্যক্তি-চিত্তকে প্রকাশিত করেন এবং সৃষ্টির সমগ্র রূপকান্তি ও কলাকুশলতায় মূর্ত্ত হইয়া উঠে। বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গত বৃক্ষ যেমন পরিবেশে পুষ্প-সুষমায় বিকশিত হইয়া সুরভি বিস্তার করে, তেমনই লেখকও তাহার বাণীভঙ্গি দ্বারা ভাব-কল্পনার বীজকে তনু-শ্রী দান করিয়া একদিকে যেমন উহাকে ব্যক্তিগত ভাব-কল্পনার বাহন রূপে উপস্থাপিত করেন, তেমনই আবার উহার মধ্যে নির্ব্বিশেষ ভাব-ব্যঞ্জনার ইঙ্গিত প্রদান করেন। এইজন্যই প্রকাশ-ভঙ্গিই ষ্টাইলের আদি ও শেষ কথা বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে—

'The idea of style is essentially and immutably *manner*, the whole manner, in which ideas are conceived and brought into the world as written words—manner of *thinking*, manner of *feeling* and manner of *expression*.'—(*Lionel B. Burrows.*)

সাধারণভাবে বাণীভঙ্গির যত প্রকার প্রকাশ হইতে পারে সেইদিক হইতে নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি রূপ উল্লেখযোগ্য—

(১) সংস্কৃতানুগ—

আর্য্য! এই সেই জনস্থান-মধ্যবর্ত্তী-প্রস্রবণগিরি; এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত-সঞ্চরমান-জলধর-পটলসংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকাপ্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমনীয়; পাদদেশে প্রসন্ন-সলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।—(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)

(২) প্রাঞ্জল—

যাহাকে ভালবাস, তাহাকে নয়নের আড় করিওনা। যদি প্রেমবন্ধন দৃঢ় রাখিবে, তবে সূতা ছোট করিও। বাঞ্ছিতকে চোখে চোখে রাখিও, অদর্শনে কত বিষময় ফল ফলে।—(বঙ্কিমচন্দ্র)

(৩) চলিত ভাষা—

(ক) আমরা সেদিন ক্লাবে তাস-খেলায় এতই মত্ত হয়ে গিয়েছিলুম যে, রাত্তির যে কত হ'য়েছে, সে দিকে আমাদের কারও খেয়াল ছিল না। হঠাৎ ঘড়িতে দশটা বাজল শুনে আমরা চম্‌কে উঠলুম। এরকম গলাভাঙ্গা ঘড়ি কলিকাতা সহরে আর দ্বিতীয় নেই।—(প্রমথ চৌধুরী)

(খ) বাঙালী আমরা—শুকুতুনি, ছেঁচকি, পুঁইশাকের চচ্চরি, পিঠে-পুলি, গুড়ের পায়েস কোনদিনই ছাড়তে রাজি নই। কিন্তু তা ব'লে ন্যাশন্যালিষ্ট-সোশ্যালিষ্ট-কমিউনিষ্ট হওয়াকে বাঙ্‌লামি, আর্য্যামি, প্রাচ্যামি বা ভারতাত্মার জয়-জয়কার বলা চলবে না। পিঁড়িতে ব'সে কমিউনিষ্টরা তালের বোড়ি আর বেলের মোরব্বা খায়—টোপর মাথায় দিয়ে বিয়েও করে। তা ব'লে তাদের কমিউনিষ্ট বক্তৃতাগুলো স্বদেশী চিজ নয়।—(অধ্যাপক বিনয় সরকার)

(৪) আবেগাত্মক—

(ক) আমাদের বাঙালীর মধ্য হইতেই তো চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন। তিনি তো বিঘা-কাঠার মধ্যে বাস করিতেন না, তিনি তো সমস্ত মানবকে আপনার করিয়াছিলেন। তিনি বিস্তৃত মানবপ্রেমে বঙ্গভূমিকে জ্যোতির্ম্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখন তো বাংলা পৃথিবীর এক প্রান্তভাগে ছিল, তখন তো সাম্য ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি কথাগুলোর সৃষ্টি হয় নাই, তখন এমন কথা কী করিয়া বাহির হইল—

মার খেয়েছি না হয় আরও খাব,
তাই বলে কি প্রেম দিব না? আয়!

এ কথা ব্যাপ্ত হইল কী করিয়া। সকলের মুখ দিয়া বাহির হইল কী করিয়া? আপন-আপন বাঁশবাগানের পার্শ্বস্থ ভদ্রাসনবাটির মনসা-সিজের বেড়া ডিঙাইয়া পৃথিবীর মাঝখানে আসিতে কে আহ্বান করিল, এবং সে আহ্বানে সকলে সাড়া দিল কী করিয়া। একদিন তো বাংলা দেশে ইহাও সম্ভব হইয়াছিল।—(রবীন্দ্রনাথ)

(খ) মানুষের এই কিশোর বয়সটার মত এমন মহাবিস্ময়কর বস্তু বোধ

করি সংসারে আর নাই।···তাই বোধ করি, শ্রীবৃন্দাবনের সেই দুটি কিশোর-কিশোরীর কৈশোর-লীলা চিরদিনই এমন রহস্যে আবৃত হইয়া রহিল। বুদ্ধি দিয়া তাহাকে ধরিতে না পারিয়া তাহাকে কেহ কহিল ভালো, কেহ কহিল মন্দ —কেহ নীতির, কেহ বা রুচির দোহাই পাড়িল, আবার কেহ বা কোন কথাই শুনিলনা—তর্কাতর্কির সমস্ত গণ্ডী মাড়াইয়া ডিঙাইয়া বাহির হইয়া গেল। যাহারা গেল, তাহারা মজিল, পাগল হইল, নাচিয়া কাঁদিয়া গান গাহিয়া, সব একাকার করিয়া দিয়া, সংসারটাকে যেন একটা পাগলা গারদ বানাইয়া ছাড়িল। তখন যাহারা মন্দ বলিয়া গালি পাড়িল, তাহারাও কহিল, এমন রসের উৎস কিন্তু আর কোথাও নাই।—(শরৎচন্দ্র)

(৫) কৌতুকরসাত্মক—

(ক) উকীল। তোমার নিবাস কোথা?

কমলাকান্ত। আমার নিবাস নাই।

উকীল। বলি, বাড়ী কোথা?

কমলাকান্ত। বাড়ী দূরে থাক, আমার একটা কুঠরিও নাই।

উকীল। তোমার পেশা কি?

কমলাকান্ত। আমার আবার পেশা কি? আমি কি উকীল না বেশ্যা যে, আমার পেশা আছে?

উকীল। বলি, খাও কি করিয়া?

কমলাকান্ত। ভাতের সঙ্গে ডাল মাখিয়া, দক্ষিণ হস্তে গ্রাস তুলিয়া, মুখে পুরিয়া গলাধঃকরণ করি।

উকীল। কিছু উপার্জ্জন কর?

কমলাকান্ত। এক পয়সাও না।

উকীল। তবে কি চুরি কর?

কমলাকান্ত। তাহা হইলে ইতিপূর্ব্বেই আপনার শরণাগত হইতে হইত। আপনি কিছু ভাগও পাইতেন।—(বঙ্কিমচন্দ্র)

(খ) দুইটি ঈশ্বর স্তব রচনা করিয়াছিলাম। শ্রীকান্তবাবু মনে করিলেন,

এমন সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ পারমার্থিক কবিতা আমার পিতাকে শুনাইলে নিশ্চয় তিনি ভারিখুশি হইবেন ; মহা উৎসাহে কবিতা শুনাইতে লইয়া গেলেন। ভাগ্যক্রমে আমি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলাম না—কিন্তু খবর পাইলাম যে, সংসারের দুঃসহ দাবদাহ এত সকাল-সকালই যে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে পীড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে, পয়ারচ্ছন্দে তাহার পরিচয় পাইয়া তিনি খুব হাসিয়াছিলেন। —(রবীন্দ্রনাথ)

(৬) চিত্রাত্মক—

সেই গম্ভীর-নাদি-বারিধি তীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয় অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি। কেশভার—অবেণীসংবদ্ধ সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্‌ফ কেশভার, তদগ্রে দেহরত্ন ; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকা-বলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না—তথাপি মেঘবিচ্ছেদ নিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল।—(বঙ্কিমচন্দ্র)

(৭) কাব্যধর্ম্মী—

বিশ্বব্যাপী প্রসববেদনার আঘাতে মেঘ ছিঁড়িয়া পড়িতেছে, সমুদ্র আলোড়িত হইতেছে, বাতাস মুহুর্মুহু শিহরিতেছে। একাকী এই জন্মরহস্যের অভিমুখে চাহিয়া দেখিতেছি। একটি মাত্র রক্ত বিন্দু! পূর্ব্বসন্ধ্যার অরুণিমার উপরে বিশ্বজগতের পূর্ব্বরাগের একটি মাত্র বুদ্‌বুদ্—অখণ্ড, অম্লান! অনন্তের পাত্রে টল্‌টল্ করিতেছে।—(অবনীন্দ্রনাথ)

(৮) বক্তৃতাত্মক—

উঠ, উঠ, মহাতরঙ্গ আসছে, এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। মেয়েমদ্দ আচণ্ডাল, সব পবিত্র তাঁর কাছে। নামের সময় নাই, যশের সময় নাই, মুক্তির সময় নাই, ভক্তির সময় নাই. দেখা যাবে পরে।—(স্বামী বিবেকানন্দ)

(৯) সালঙ্কৃত—

এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে—প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলো কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়াছে। হিমালয়ের

মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কতশত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানব-হৃদয়ের বন্যাকে কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।—(রবীন্দ্রনাথ)

(১০) বিরোধাত্মক—

ঊষা বালিকা। ঊষাকে দেখিলে মনে হয়, যেন আলুথালু চুলে সে লাফালাফি করিয়া বেড়াইতেছে। সন্ধ্যার যেন কিছু গভীর হাসি। ঊষা ছোট মেয়ে। ফুল তুলিয়া লাফালাফি করিয়া বেড়াইতে সে পটু। তাহার যেন ঐ কাজ। সন্ধ্যা যুবতী..সে সংসারের কাজ কর্ম্ম সারিয়া দু'দণ্ড ছাতে আসিয়া বসে—(বলেন্দ্রনাথ)

(১১) জ্ঞানঘন—

যে আমি লীলাপর ক্রীড়াপর, যে বিশ্বজগৎ নির্ম্মাণ করিয়া খেলা করে, সে সোপাধিক, সে জ্ঞেয়। যে বসিয়া বসিয়া সেই লীলারচনা ও সেই ক্রীড়া কল্পনা দেখে, সে জ্ঞাতা। অথচ এই দুই আমিই এক, দুই আমি অভিন্ন। বেদান্তের ভাষায় একের নাম জীব, অপরের নাম ব্রহ্ম। জ্ঞেয় আমি জীবাত্মা, জ্ঞাতা আমি পরমাত্মা। ব্যবহারে দুই, কিন্তু বস্তুতঃ এক। ব্রহ্মই জীব—জীবই ব্রহ্ম—কেননা আমিই আমাকে দেখি। আমিই সেই—সোঽহম্।—(রামেন্দ্রসুন্দর)

(১২) প্রত্যয়-দৃপ্ত—

মনেকর, কোনও বড় কর্ম্মী—বা জ্ঞানবীরের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত। মৃত্যুর আক্রমণে দেহ বিবশ, মুহুর্মুহু আক্ষেপ হইতেছে - মুখ বিবর্ণ ও বিকৃত, চেতনা আচ্ছন্ন, চক্ষু-তারকা দৃষ্টিহীন।..সকল মিথ্যা অভিমান, মনোগত সংস্কার ত্যাগ করিয়া মুমূর্ষুর পানে চাহিয়া দেখ—তাহার মরজীবনের চরম লাঞ্ছনা, তাহার ক্ষণ-অস্তিত্বের চির-অবসান, নিয়তির নির্ম্মম অট্টহাস চাক্ষুষ করিতে পারিবে। চাহিয়া দেখ—মহামনীষী, মহাপুরুষ বা মহাবীরের মৃত্যুও মৃত্যু; তাঁহার সেই মৃত্যুকালীন মুখচ্ছবি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবে, মৃত্যুই চরম অভিশাপ, কোনও কীর্ত্তি কোনও গৌরব সে ক্ষতিপূরণ করিতে পারেনা—যাইবার সময় তাহাকেও ভিখারীর মত যাইতে হইবে!—(মোহিতলাল)

(১৩) বৈজ্ঞানিক—

সূর্য্য অস্তগমনের সময় ও উদয়ের সময় দিগ্বলয় অরুণ রাগে রঞ্জিত হয়। সূর্য্যের আলো গভীর বায়ুস্তর ভেদ করিয়া আসে। ধূলিকণায় ঠেকিয়া নীল আলোর ভাগ প্রতিহত হয় ও সূর্য্যের অভিমুখেই ফিরিয়া যায়। রক্তের ভাগ ও অরুণের ভাগ বায়ু ভেদ করিয়া চলিয়া আসে। সেই অরুণরাগ-রঞ্জিত আলো আবার মেঘের গায়ে পড়িয়া প্রতিফলিত হইয়া বিচিত্র অরুণ বর্ণের বিকাশ করে—(রামেন্দ্রসুন্দর)

(১৪) বর্ণনাত্মক

(ক) সাধু ভাষা—বর্ষাকাল। রাত্রি জ্যোৎস্না। জ্যোস্না এখন বড় উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর, একটু অন্ধকার মাখা—পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মত। ত্রিস্রোতা নদী বর্ষাকালের জল-প্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণে সেই তীব্রগতি নদীজলের স্রোতের উপর—স্রোতে, আবর্ত্তে, কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে জ্বলিতেছে। কোথাও জল একটু ফুটিয়া উঠিতেছে—সেখানে একটু চিকিমিকি; কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ হইতেছে, সেখানে একটু ঝিকিমিকি।—(বঙ্কিমচন্দ্র)

(খ) কথ্যভাষা: নদীর যে রোখ! যেন লেজ-দোলানো কেশর-ফোলানো তাজা বুনো ঘোড়ার মতো। গতিগর্ব্বে ঢেউ তুলে দুলেদুলে চলেছে। ছল্‌ছল্ খল্‌খল্ করে কিছুতেই যেন আর ক্ষান্ত হতে পারছেনা, ভারি একটা যৌবনের মত্ততার ভাব। এ তবু গড়ুই নদী, এখান থেকে আবার পদ্মায় গিয়ে পড়তে হবে, তার বোধ হয় আর কূল কিনারা দেখবার জো নাই। সে মেয়ে বোধ হয় একেবারে উন্মাদ হয়ে ক্ষেপে নেচে বেরিয়ে চলেছে, সে আর কিছুর মধ্যেই থাকতে চায় না। তাকে মনে করলে আমার কালীর মূর্ত্তি মনে হয়—নৃত্য করছে, ভাঙছে এবং চুল এলিয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে। (রবীন্দ্রনাথ)

(১৫) যুক্তি-সিদ্ধ—

(ক) তুমি যুবা, মহারাজ তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ও ধন-সম্পত্তির

অধিকারী করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। সুতরাং যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব, তিনেরই অধিকারী হইলে। কিন্তু যৌবন অতি বিষম কাল। যৌবন রূপ বনে প্রবেশিলে বন্য জন্তুর ন্যায় ব্যবহার হয়।—(তারাশঙ্কর)

(খ) যে বাটীতে রোগীর সেবা ভাল না হয়, সে বাটী ভাল নয়। সে বাটীতে স্নেহমমতা কম, স্বার্থপরতা বেশী, আত্মত্যাগশক্তি ন্যূন, বিলাসিতা অধিক। সে বাটীর স্ত্রীপুরুষেরা সহজেই ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, কখন কোন উন্নত জীবনের অধিকারী হইতে পারে না। —(ভূদেব)

১৭

হাস্যরস (*Humour*)

'হাস্যরস' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক। আজ পর্য্যন্ত ইহার বিচিত্র রূপের প্রতিশব্দ বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত হয় নাই। আমরা ইংরেজী সাহিত্য অনুকরণে উহার রূপ-বৈচিত্র্য নিম্নে আলোচনা করিব।

হাস্য-রস এক প্রকার ভাব-দৃষ্টি। ইহার সাহায্যে লেখক মানব-জীবনের অসঙ্গতি ও বৈষম্যকে এক সর্ব্বগ্রাহী উদার অনুভূতি দ্বারা গ্রহণ করিয়া আপাত-বৈষম্যময় মানব-জীবনকেও ক্ষমা-সুন্দর হাস্যোজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করেন। জগৎ ও জীবনের প্রতি একটা নির্লিপ্ত অথচ অভিযোগ বা উচ্ছ্বাসহীন প্রসন্ন ও সহৃদয় মনোভাবই উৎকৃষ্ট হাস্যরসের লক্ষণ। জনৈক সমালোচক বলেন—Humour is sensitiveness to the true proportion of things. আবার কেহ কেহ বলেন, Humour is the kindly treatment of the ludicrous। সাহিত্যিকগণ *wit*, *satire*, ***irony***, *fun*, *humour*, *sarcasm* প্রভৃতির সাহায্যে হাস্য-রস সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করেন।

হাস্যরস

মনে রাখিতে হইবে যে, সহানুভূতি ব্যতীত সত্যকার হাস্যরস-সৃষ্টি সম্ভবপর হয় না। শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক জীবনকে দূর হইতে দ্রষ্টার মত প্রত্যক্ষ করেন। 'উৎকৃষ্ট হাস্যরসের মূলে একটা অতি উচ্চ রস-কল্পনা আছে। এইরূপ রস-কল্পনায় মানুষের প্রতি বা সৃষ্টির প্রতি নির্ম্মম ব্যঙ্গের ভাব নাই, কারণ, অতি ব্যাপক সহানুভূতি এই হাস্য-রসের নিদান। এই ভাব-দৃষ্টির দ্বারা মানুষকে দেখিতে পারিলে তাহার সর্ব্ব অভিমান নিরর্থক বলিয়াই যেমন হাস্যকর হইয়া ওঠে, তেমন সেই হাসির অন্তরালে একটি সুগভীর সহানুভূতি প্রচ্ছন্ন থাকে—ঐ সহানুভূতি আছে বলিয়াই পরিহাসও 'রস' হইয়া উঠে, হাস্য-রস কবি-কল্পনায় অভিষিক্ত হয়।'

আমরা যখন হাস্য-রস সৃষ্টি করি, তখন ইচ্ছা করিয়াই অন্যকে পীড়ন করিতে চাই। এই পীড়নেচ্ছার মধ্যে স্বকীয় শ্রেষ্ঠত্ব-বোধের আত্মপ্রসাদ আছে। যে রাখাল বালক 'বাঘ আসিয়াছে', 'বাঘ আসিয়াছে' বলিয়া চীৎকার করিয়া হাস্য-রস সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিল, তাহার মধ্যেও পর-পীড়নেচ্ছা আছে। অনেক সময় আমরা অপরের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া তাহার খরচায় হাস্য-রস উপভোগ করি। কোন রবীন্দ্র-সাহিত্যাভিমানীর (যিনি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নিজেকে যথেষ্ট ওয়াকিফহাল বলিয়া মনে করেন) কাছে যখন কোন অজ্ঞাত কবির নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি দুইটি আবৃত্তি করিয়া বলি, রবীন্দ্রনাথ সত্যই কী চমৎকার লিখেন

> ভগবান বসি' হাসে যেন শুধু বিরাট বিফল হাসি,
> রোমক-নগর পুড়িছে যখন, নীরো যে বাজায় বাঁশি।

—তখন যদি রবীন্দ্র-ভক্ত নিজের অজ্ঞতাকে গোপন করিয়া বলেন, 'তা না হ'লে কি আর রবীন্দ্রনাথ কবিগুরু?'—তখন আমরা শুধু স্মিত হাস্য করিয়া তাহার অজ্ঞতা উপভোগ করি? ইহা হইতে বুঝা যায় যে, হাস্য-রসের একদিকে যেমন পরপীড়নেচ্ছা, অপরদিকে তেমন স্মিত-হাস্যের আত্ম-প্রসাদ। এইজন্যই কমেডির নায়ককে একদিকে যেমন আমরা ভালবাসি, তেমনি আবার তাহাকে কিয়ৎ পরিমাণে আহত ও লাঞ্ছিত দেখিতেও ইচ্ছা করি।

ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসঙ্গতি, উদ্দেশ্যের সহিত উপায়ের অসঙ্গতি, কথার সহিত কার্য্যের অসঙ্গতি—প্রভৃতিই হাস্য-রসের উপজীব্য। এই অসঙ্গতি-বোধ অধিকাংশ স্থলে কোন না কোন ঘটনা বা চরিত্র-ঘটিতও হইতে পারে। কোন অভাবিত বা বিস্ময়কর ঘটনা (যেমন আম পাড়িবার জন্য কোন বৃদ্ধের গাছে ওঠা), কোন দৈহিক বিকৃতি, কাহারও কোন বস্তু সম্বন্ধে ভ্রান্তি (যেমন, দীনবন্ধুর 'জামাই বারিকে' পদ্মলোচনের দুই স্ত্রী কর্তৃক চোরকে স্বামীভ্রমে লাঞ্ছনা করা), প্রভৃতি হইতে হাস্য-রস সৃষ্টি হইতে পারে।

হাস্যরসের উপজীব্য

Wit, Humour ও Fun, Irony

Wit বা বাক্-বৈদগ্ধ্য বলিতে আমরা মার্জ্জিত বুদ্ধির বাক্-চাতুর্য্যকে বুঝি। লেখক যখন দুইটি নিঃসম্পর্কিত বস্তুর মধ্যে সহসা কোন সাদৃশ্য আবিষ্কার করিয়া শব্দের সাহায্যে তাহা প্রকাশ করেন, তখন তাহাকে *Wit* (দীপ্ত-হাস্য) বলি। যথা—

> অনুস্বর ধনুঃশর নহে মহারাজ
> কেবল টঙ্কার মাত্র। —(রবীন্দ্রনাথ)

অথবা হেঁয়ালী-সাহিত্যে-

> যুধিষ্ঠিরস্য যা কন্যা নকুলেন বিবাহিতা
> পুজিতা সহদেবেন সা কন্যা বরদা ভব।

অথবা দ্বিজেন্দ্রলালের—

> স্ত্রীর চেয়ে কুমীর ভাল বলেন সর্ব্বশাস্ত্রী
> ধরলে কুমীর ছাড়ে বরং, ধরলে ছাড়েনা স্ত্রী।

Wit বা বাক্-বৈদগ্ধ্যের উদাহরণ রূপে গৃহীত হইতে পারে।§ *Wit* সৃষ্টি করিতে লেখকের তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ও শব্দ-নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয়। ইহাতে যে আনন্দ বা বিস্ময়-সঞ্চার করা হয়, তাহাতে সামান্য মাত্র পীড়ন থাকে। হেঁয়ালী প্রভৃতিতে

§ *Cf.:* A person always seeks the ingenious and the remote when he wants to be witty—*V. K. Menon : A Theory of Laughter.*

Wit প্রচুর সৃষ্টি হয়। *Wit* শব্দ বা অর্থ-ব্যঞ্জনায় হাস্য-রস উদ্রেক করে, *Humour* (মুক্ত-হাস্য) সমস্ত অনুভূতিকে আন্দোলিত করিয়া সহানুভূতিশীল হৃদয়ে আবেদন জানায়। *Wit* বুদ্ধিমত্তা ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক, *Humour* যাহা অদ্ভুত, তাহাকে সস্নেহভাবে গ্রহণ করে। *Humour*-এ আঘাত বা আক্রোশ নাই, প্রসন্ন আনন্দ-বোধ বা বেদনা-বিধৌত নির্লিপ্ত হাসির ব্যঞ্জনা আছে। এই *Humour* আবার করুণ রসাশ্রিত হইলে সর্ব্বাপেক্ষা সুগভীর ও উচ্চ স্তরে উন্নীত হয়। প্রতিকারহীন দৈন্য-দুর্দ্দশার মধ্যেও লেখক যখন ব্যক্তিগত জীবনের গভীর বেদনাকে জীবনের প্রতি কোন অভিযোগ বা আক্ষেপহীনভাব দৃষ্টির সাহায্যে পাঠকের মনে রস-সঞ্চার করে, তখন এই শ্রেণীর হাস্য-রস সৃষ্টি হয়। লেখকের হাস্যোচ্ছল লঘুতায় তখন বেদনার সকরুণ দীপ্তি রামধনু-সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে—তাই তাঁহার হাসির পশ্চাতে অশ্রুবিন্দু ঝলমল করিয়া উঠে। Lamb-এর প্রবন্ধে, দীনবন্ধু মিত্রের হেমচাঁদ চরিত্রে ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে' এই শ্রেণীর হাস্য-রসের নিদর্শন পাওয়া যায়।

লেখক যখন আত্ম-বিস্মৃত হইয়া ক্ষণতরে তাঁহার পারিপার্শ্বিককে তাঁহারই আনন্দের উপকরণ বা উপজীব্য রূপে গ্রহণ করেন, তখন তিনি *Fun* বা কৌতুক (লঘু-হাস্য) সৃষ্টি করিতে পারেন। প্রাচীন গানের—

পাকা চুলে বকুল ফুলে মালা পরেছো,
বলি আবার কি পুরানো পীরিত ঝালিয়ে তুলেছো ?

—*Fun* বা কৌতুক। বলা বাহুল্য, কৌতুক অধিকাংশ স্থলে গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট হইতে পারে। *Irony*-তে লেখক পরোক্ষ অর্থটি মাত্র ইঙ্গিত করেন। শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' নামক উপন্যাসে 'রাস-বিহারীর' চরিত্র Irony-র ('বক্র-হাস্য') উৎকৃষ্ট উদাহরণ। 'রাসবিহারী'র অত্যুগ্র ভগবৎ-প্রীতির অন্তরালে হীন স্বার্থ-বোধকে ইঙ্গিত করাই এই স্থলে লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য। ইংরেজী সাহিত্যে Irony-সৃষ্টিতে Dean Swift অপ্রতিদ্বন্দ্বী। রবীন্দ্রনাথের—

তুমি মহারাজ, সাধু হোলে আজ, আমি আজ চোর বটে,

মধুসূদনের—

কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ।

অথবা যতীন্দ্রনাথ সেনের—

অস্য অর্থটি
যাহার পাঁঠা সে যে দিকে কাটুক তা'তে অপরের কি ?

Irony-র উদাহরণ। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, *Satire* ব্যঙ্গ-হাস্য, স্পষ্ট বিদ্রূপ, *Irony* চাপা বিদ্রূপ, এবং *Sarcasm* (টিট্‌কারী বা তীক্ষ্ণ-হাস্য) ঈষৎ বক্রভঙ্গিযুক্ত বিদ্রূপ।

বাংলা সাহিত্যে হাস্য-রসের একান্ত অভাব। যাহা কিছু আছে, তাহাও অধিকাংশ স্থলে জৈব-ব্যাপার ও যৌন-ব্যাপারকে ইঙ্গিত করিযাই প্রকাশিত হয়।

বাংলা সাহিত্যে হাস্য-রস

খাদ্যদ্রব্য ও পেটুক-প্রবৃত্তি লইয়া অশেষ হাস্যরস-মধুর সাহিত্য বাংলায় আছে। 'বাসর-ঘরে কর্ণমর্দ্দন' ও অন্যান্য পীড়ন-নৈপুণ্যকে বঙ্গসীমন্তিনীগণ একশ্রেণীর হাস্যরস বলিয়া স্থির করিয়াছেন।' সত্যকার যে শুভ্র নির্ম্মল সংযত হাস্যরস, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অন্যত্র দুর্লভ।

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'গজপতি বিদ্যাদিগগজ', তারকনাথের 'গদাধর' ও 'নীলকমল' এবং দীনবন্ধুর 'নিমচাঁদ' অপূর্ব্ব হাস্য-রসাত্মক সৃষ্টি। এতদ্ব্যতীত, চন্দ্রনাথ বসুর 'পশুপতি সংবাদ', ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কল্পতরু', ও 'ক্ষুদিরাম', ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ফোক্‌লা দিগম্বর', রসরাজ অমৃতলাল বসুর প্রহসনগুলি, রবীন্দ্রনাথের 'হাস্যকৌতুক', 'ব্যঙ্গ-কৌতুক', দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গান', ও প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের কতকগুলি (যথা, ভুলশিক্ষার বিপদ, কাশিবাসিনী) গল্প রস-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য। আধুনিক কালের হাস্যরস-স্রষ্টাদের মধ্যে বীরবল, পরশুরাম, কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথ বিশী প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। বীরবলের সূক্ষ্ম বাক্-বৈদগ্ধ্য ও প্যারাডক্স্-বিলাস, অত্যন্ত বুদ্ধি-প্রধান; উহা কুত্রাপি অনুভূতিরসে স্নিগ্ধ উচ্চস্তরের হাস্যরস হইয়া

উঠে নাই। পরশুরাম-এ বাক-বৈদগ্ধ্য ও কৌতুকের বিস্ময়কর প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়। প্রমথ বিশীর বাক-বৈদগ্ধ্য ও রসিকতাবোধও আধুনিক কালে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়।*

১৮

সাহিত্যে সাব্লিমিটি

Sublimity-র প্রতিশব্দ রূপে আমরা 'সমুন্নতি' বা 'মহিমময়তা' ব্যবহার করিলেও উহা দ্বারা যেন শব্দটির পরিপূর্ণ অর্থ ব্যঞ্জিত হয় না। তাই ইংরেজী শব্দটিকেই আমরা বাংলায় গ্রহণ করিলাম।

সাব্লিমিটি সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত অনেকেই এত বিভিন্ন কথা বলিয়াছেন যে, ইহার সম্বন্ধে ধারণা করা সুসাধ্য নহে। এই সম্বন্ধে বিচিত্র মতামতের একমাত্র কারণ এই যে, অনেকেই সুন্দর ও সাবলাইমের বিভেদ সম্বন্ধে নিশ্চিত নহেন। বিষয় অবতারণা-প্রসঙ্গে কেবল এইটুকু বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, সুন্দর ও সাবলাইমের পার্থক্য শুধু মাত্রাগতই নহে, শ্রেণীগতও। সৌন্দর্য্য যখন আমাদিগকে যুগপৎ ভীম ও কান্ত

সুন্দর ও মহিমময়

* Fowler-রচিত তালিকাটি অত্যন্ত মূল্যবান বলিয়া উদ্ধৃত হইল—

	Motive	Province	Means	Audience
Humour	Discovery	Human Nature	Observation	The Sympathetic
Wit	Throwing Light	Words & Ideas	Surprise	The intelligent
Satire	Amendment	Morals & Manners	Accentuation	The self-satisfied
Irony	Exclusiveness	Statement of facts	Mystification	An inner circle
Sarcasm	Inflicting Pain	Faults & foibles	Inversion	Victim & bystander

এমন এক রসাবেশে অভিভূত করিয়া 'লোকোত্তর চমৎকারের' সাক্ষাৎ করাইয়া দেয়, তখন সেই বিশিষ্ট সৌন্দর্য্যকে আমরা সাব্‌লাইম বলি। সৌন্দর্য্য আমাদিগকে শান্ত, মুগ্ধ ও স্তব্ধীভূত করে, সাবলাইম আমাদের চিত্তবৃত্তির মধ্যে সহসা বিপ্লব ঘটাইয়া আমাদিগকে ঊর্দ্ধাভিমুখে উন্নীত করে।

সাবলিমিটি বলিতে বস্তুগত রূপ-বৈভব এবং বস্তুর বর্ণনা-ভঙ্গী—দুইটিকেই বুঝা যাইতে পারে। কোন বস্তুর বস্তুগত বিরাটত্বের পরিমিতি-মহিমাকে ক্যাণ্ট '*Mathematical sublime*' (আকারগত) এবং উহা বিশালতার ব্যঞ্জনায় দর্শকের যে চিত্ত-বিস্ফার সৃষ্টি করে, তাহাকে '*Dynamic sublime*' (গুণগত) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুগত (Objective) ও আত্মগত (Subjective) সাবলিমিটির পার্থক্য স্বীকার করিয়াও ক্যাণ্ট মূলতঃ আত্মগত বা কবির মনোগত সাবলিমিটির উপরই বেশী জোর দিয়াছেন। তিনি বলেন -

True sublimity must be sought *only in the mind of the Judging Subject,* and not in the Object of nature.

বস্তুগত সাবলিমিটি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যাহা নিরপেক্ষভাবে বৃহৎ অথবা যাহার তুলনায় অন্য সকলই ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র, তাহাই সাবলাইম। অধ্যাপক Bradley-র মতে, সীমাহীন মহত্ত্ব ও বৃহতের ভাবসঞ্চারই সাবলাইমের লক্ষণ। তিনি বলেন যে, কোন সাবলাইম জিনিস প্রত্যক্ষ করিলে আমাদের মনে প্রথমতঃ এক অদ্ভুত রকমের বেদনা বা ব্যর্থতাবোধ জন্মে এবং নিজের ক্ষুদ্রতা সম্বন্ধে আমাদের প্রতীতি হয়। কিন্তু ক্ষণপরেই ক্ষুদ্র হইয়াও বৃহতের সংক্রামণে আমরা বৃহৎ হইয়া উঠি এবং উহার সহিত একাত্মতা অনুভব করি। বলা বাহুল্য মাত্র যে, অধ্যাপক Bradley এইখানে বস্তুগত সাবলিমিটিও স্বীকার করিয়াছেন।

অভাবনীয় পরাজয়ের মধ্যে বিষাদাত্মক নাটকের নায়কের আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার যে মৃত্যুঞ্জয়ী সাধনা, মৃত্যুর মুখোমুখি হইয়াও তাহার নচিকেতা-সুলভ যে অমৃতাকাঙ্ক্ষা, তাহাকেই Hegel সাবলাইম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পরাজয়ের মধ্যে মহত্ত্বের জন্য মানবাত্মার যে ক্রন্দন, তাহাই মহিমময়। কিন্তু পরাজয়ের তীরে বসিয়া নিঃসহায় মানবাত্মার ক্রন্দন যতই মর্ম্মস্পর্শী হউক না কেন, তাহার

মধ্যে সাবলিমিটি থাকে না। স্বর্গচ্যুত শয়তান যখন '*To be weak is miserable*'—এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভগবানের বিরুদ্ধে পর্য্যন্ত শত্রুতা করিবার জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প, তখন সে পরাজয়ের মধ্যেও মহান। বার্ক* বলেন যে, সাবলিমিটিতে বেদনা ও ভয় থাকিবেই। আমরাও বিশ্বাস করি যে, কোন কোন ক্ষেত্রে ভীতিও বেদনা-মিশ্রিত আনন্দ দান করে সত্য, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই দুইটি না-ও থাকিতে পারে। নক্ষত্র-খচিত বিরাট আকাশে ভয় বা বেদনার এতটুকু আভাস নাই, অথবা মানবোচিত যে সকল গুণ আমরা শ্রদ্ধা করি, তাহাদের বিরাটত্বে আমরা যখন অভিভূত হই, তখন তাহাদের মধ্যেও কোন বেদনা বা ভয়ের কারণ থাকে না। আবার, অসুস্থ লোকের উপর অস্ত্রোপচারে ভয় থাকিলেও সাবলিমিটি নাই; সর্প দংশনে ভয় বা বিপদ আছে সত্য, কিন্তু এই ব্যাপারকে কেহই সাবলাইম বলিতে স্বীকৃত হইবেন না। আর একটি কথা এই যে, কোন বস্তু ভীতিপ্রদ হইলেই উহা সাবলাইম হয় না। দর্শক উহা হইতে নিজেকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিরাপদ মনে না করেন, ততক্ষণ ভীতিকে আস্বাদ্যমান, রূপে তিনি গ্রহণ করিতে পারেন না। এইজন্যই যিনি প্রাকৃতিক উৎপাত ভয় করেন, তাঁহার নিকট ঝড় ভয়ানক; যিনি ইহাকে ভালবাসেন এবং প্রকৃতিরই শক্তিমত্তার অপূর্ব্ব বিকাশরূপে প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহার নিকট উহা সাবলাইম। সুতরাং ভয় বা বেদনা যতক্ষণ পর্য্যন্ত দূর-সংস্থিত বা আপন্মুক্ত হইয়া কান্তরূপ পরিগ্রহ না করে, ততক্ষণ উহারা সাবলাইম-এর স্তরে পৌঁছিতে পারে না।

অজিত চক্রবর্ত্তী বলেন, 'সৌন্দর্য্যই অসীমের দিক দিয়া মহান'†। এই উক্তির মধ্যেও সৌন্দর্য্য ও সাবলিমিটি—এই দুইয়ের পার্থক্য-জ্ঞান সম্বন্ধে সন্দেহ রহিয়াছে। যাহা আমাদিগকে অসীমের মধ্যে আনয়ন করে, তাহা যদি আমাদিগকে কান্ত, স্নিগ্ধ ও মধুর রসে আপ্লুত করে, তবে উহা সাবলাইম নয়। যে-অসীমতার মধ্যে একরূপ শক্তিশালী ভাব-বিপর্য্যয় সৃষ্টির ক্ষমতা নাই, তাহা

---

* Terror is in all cases, whatsoever, either more openly or latently the ruling principle of the sublime—*Burke*.

† বাতায়ন

সুন্দর হইলেও সাবলাইম নয়। ক্যাণ্ট সত্যই বলেন যে, সীমাহীনের ইঙ্গিতের মধ্যেও '*thought of the totality*' বা পূর্ণাবয়ব কল্পনা থাকিতে হইবে। শুধু অসীম বলিলে ভাব-কল্পনার সীমাহীন বিস্তার বুঝায়, কিন্তু কোন বস্তুর পূর্ণ রূপ-মণ্ডলকে বুঝায় না।

ইতিপূর্ব্বে আমরা বিশিষ্ট মনীষীদের মতামত আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, সাব লিমিটির প্রধান লক্ষণ, বৃহতের পরিব্যঞ্জনা। অনেকে আবার আযতনের বিশালত্বের উপরে বিশেষ ঝোঁক দেন। কিন্তু প্রকাণ্ড সমতলভূমি কখনো তেমন বৃহতের আভাস জাগায় না। বরং উন্নত পর্ব্বতভূমি ও সুগভীর পর্ব্বত-গহ্বরে বৃহতের আভাস অনেক বেশী। সমতলভূমির মধ্যে যে সামঞ্জস্যবোধ এবং ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য আছে, তাহা তাহাকে সুন্দর করে, মহিমময় করে না। নক্ষত্র-খচিত সীমাহীন নীল আকাশ যে বৃহতের ভাব জাগায়, তাহার কারণ উহার উচ্চতা ও ব্যাপ্তি। সুতরাং দৈর্ঘ্য অপেক্ষা উচ্চতা ও ভেদ অধিকতর বৃহত্ত্ব-ব্যঞ্জক। সুদূরবিসর্পী রকি পর্ব্বত অপেক্ষা দেবতাত্মা হিমালয়ের সু-উন্নত দুর্ভেদ্য ধ্যান-মহিমা অধিকতর মহত্ত্বব্যঞ্জক। সমুদ্রের মধ্যে যে সাব লিমিটি আছে, তাহার মূলে উহার অমিত-বিস্তার, গতিশক্তি ও তরঙ্গ-ভঙ্গের উদ্দামতা। এইজন্যই মনে হয়, চিল্কার শান্ত-সলিলে সৌন্দর্য্যের নিগুতি-স্পর্শ থাকিতে পারে, কিন্তু বঙ্গোপসাগরের ভৈরব গর্জ্জনে ও সীমাহীন ব্যাপ্তিতে বৃহতেরই ব্যঞ্জনা। গঙ্গা সুন্দর, পদ্মা সাব্‌লাইম্; শোভাযাত্রার অশ্ব সুন্দর, রণ-সজ্জার অশ্ব সাব্‌লাইম্। সুতরাং আসল কথা হইল, আকারের বিশালতা অপেক্ষা বস্তু-নিহিত শক্তিমত্তার যে অতিলৌকিক প্রবলতাকে *Lessing* 'transcending the human' বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন, তাহাই সাব্‌লিমিটি-ব্যঞ্জক।

মানুষের কোন কোন গুণ যখন আমাদের মধ্যে অলৌকিক চমৎকার সৃষ্টি করে, তখন তাহাকে আমরা সাবলাইম বলি। সাধারণ লোকের দুঃখ, প্রেম, ত্যাগ, বীরত্ব ও বীর্য্য আমাদিগকে তেমন ভাবে অভিভূত করে না। কিন্তু যখন দেখি, সেই দুঃখ, প্রেম, ত্যাগ, বীরত্ব ও বীর্য্যের মধ্যেও এক বিরাট শক্তির

স্ফুরণ হইতেছে, তখন উহাকে আমরা সাবলাইম না বলিয়া পারি না। এইজন্যই ভবভূতির সীতা সম্বন্ধীয় প্রণয়োক্তিতে, কুমারসম্ভবে মদন-ভস্ম বর্ণনায়, দান্তের Beatrice-কল্পনায়, ব্রাউনিংয়ের *Saul* কবিতায় হৃত-চৈতন্য ভীষণ-দর্শন Saul-এর শব্দ-চিত্রে ও মহামানব যীশুখ্রীষ্টের পুণ্য-আবির্ভাব-কল্পনায়, 'প্রাপ্তিকে' মৃত্যু-অনুভূতি বর্ণনায় এবং শেলীর প্রমীথিউসের আহত-আক্ষেপে আমরা সাবলাইম্ ভাব-কল্পনাকে অস্বীকার করিতে পারি না।

এখন আমরা সাবলিমিটির প্রকাশ-ভঙ্গি সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা বলিব। প্রকাশভঙ্গি বিষয়বস্তুর উপরে নির্ভর করে, ইহা সর্ব্বজন-স্বীকৃত। সাবলাইম রচনার বিষয়বস্তু দীনহীন বা তুচ্ছ কোন পদার্থ হইতে পারে না। ইহার বিষয়বস্তু মহত্ত্ব-ব্যঞ্জক অর্থাৎ যাহাতে কোন মহান ভাবকল্পনার উদ্রেক করিতে পারে, তেমন কোন প্রবল শক্তি-সঞ্চারী বস্তু হইবে। বিষয়ের মর্য্যাদানুরূপ যথাপ্রয়োজনীয় উপমা, অলঙ্কার, শব্দ-চয়ন, চিত্রাত্মক কল্পনা, ছন্দ-কুশলতা ও ভাষা-বিন্যাস এমনভাবে রূপায়িত হওয়া চাই যে, বর্ণনাটির মধ্যে যেন লেখকের বিরাট উপলব্ধির প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। লেখক অসংলগ্ন এবং অযত্ন-গ্রথিত শব্দ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকিবেন, এবং এমন কোন শব্দ ব্যবহার করিবেন না, যাহাতে তাঁহার সৃষ্টি-কর্ম্ম অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। তিনি নিজে বিষয়-বস্তু গৌরবে কতখানি অভিভূত হইয়াছেন, উহার উপর তাঁহার সাবলাইম-রস-পরিবেশন ক্ষমতা নির্ভর করে। লেখক যদি সত্য করিয়া কোন মহানতার সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন, তবে অলীক অলঙ্কার-বাহুল্য বা শব্দ-সম্ভারের উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হয় না। তাঁহার ভাষা সহজ স্বচ্ছতা ও পরিমিতি-বোধ রক্ষা করিয়াই এক পূর্ণ-মণ্ডল ভাবৈশ্বর্য্য সৃষ্টি করে। এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিচিত্র স্বাধীনতা ও নমনীয়তাই সাবলাইম ভাব-প্রকাশের পক্ষে অতিকতর উপযোগী।

মিল্টনের *Satan*-এর নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা সাবলাইম্ ভঙ্গির উৎকৃষ্ট নিদর্শন—

He above the rest,
In shape and gesture proudly eminent,
Stood like a Tower : his form had not yet lost
All her original brightness, nor appear'd
Less than archangel ruined ; and the excess
Of glory obscur'd : As when the sun, new risen,
Looks through the horizontal misty air,
Shorn of his beams : or, from behind the moon,
In dim eclipse, disastrous twilight sheds
On half the nations, and with fear of change
Perplexes monarchs. Darken'd so, yet shone
Above them all the Archangel—

উদ্ধৃত কবিতাংশে বিষয়-বস্তু প্রকৃতই মহৎ—প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী দানবশক্তি অবদমিত হইয়াও উন্নতশির, এবং ঘোর বিপন্ন অবস্থায়ও আত্মপ্রতিষ্ঠ। এই অনমনীয় শক্তির অভাবনীয় পরিবর্তন রাহু-কবলিত সূর্য্যরশ্মির সহিত তুলনা করিয়া যুগপৎ অন্ধকার ও ভীতির সঞ্চার করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, কবি সহজ স্বাভাবিক অথচ ওজস্বী ছন্দে বিষয়বস্তুটিকে বর্ণনা করিয়াছেন। 'মেঘনাদবধ কাব্য'ও ঠিক এমনি এক বিপুল শক্তিশালী রাজার চিত্র দেখিতে পাই। অদৃষ্ট যাহার প্রতি বিরূপ, নিজের রাজ্য ধন, সহায়, সম্পদ যাহার চক্ষুর সম্মুখে ধ্বংস হইতে চলিয়াছে, সেই সর্ব্বহারা রাবণের মুখে মধুসূদন যে ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাও তেমনই মহিময়—

"এ কাল সমরে
আর পাঠাইব কারে ? কে আর রাখিবে,
রাক্ষস কুলের মান ? যাইব আপনি।
সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ !
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি !
অরাবণ অরাম বা হবে ভব আজি !"

---

* 'Sublimity is the echo of a great soul'—*Lessing*.

রবীন্দ্রনাথের মহারূপ-বিগ্রহ প্রকৃতই সাবলাইম্—

হে নূতন, এসো তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি
পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে
ব্যাপ্ত করি, লুপ্ত করি, স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে
ঘনঘোরে স্তূপে।

*   *   *   *

রথচক্র ঘর্ঘরিয়া এসেছ বিজয়ী রাজসম
গর্ব্বিত নির্ভয়,
বজ্রমন্দ্রে কী ঘোষিলে বুঝিলাম, নাহি বুঝিলাম
জয় তব জয়।

আবার, চিরচঞ্চলা বারবনিতা-শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিতে যে-ক্লিওপেট্রা কুণ্ঠাবোধ করে নাই, প্রেমের দুর্জ্জয় আহ্বানে মরণ-মহোৎসবে মৃত্যু-রমণ-পিপাসা-কাতর তাহারই মুখ হইতে যখন শুনি—

Give me my robe, put on my crown ; I have
Immortal longings in me........
Methinks I hear
Antony call ; I see him rouse himself
To praise my noble act : I hear him mock
The luck of Caesar, which the gods give men
To excuse their after-wrath : husband, I come
I am fire and air ; my other elements
I give to baser life——

তখন মনে হয়, সেক্সপীয়রের কল্পনায় ভারতীয় সাংখ্য-দর্শনের চিরন্তন 'প্রকৃতি'-রহস্য মানবীরূপে ধরা দিয়াও, শুধু সুন্দর নয়, মহিমময় হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের—

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর—

সুন্দর, কান্ত, অনির্ব্বচনীয়। কিন্তু জন-নিধন-প্রবৃত্ত শ্রীকৃষ্ণের রূপ-বর্ণনা—

অনাদিমধ্যান্তম্-অনন্তবীর্য্য
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশ বক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদম্ অন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥ (গীতা, ১১।১৯।২০)

অথবা, উপনিষদোক্ত আত্মার বর্ণনা—

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাহস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্। (কঠোপনিষদ, ১।২।২০)

সাবলাইম হইতেও সাবলাইম।

১৭

সাহিত্যে মিষ্টিসিজম্ (*Mysticism*)

(সাহিত্যে মানুষের জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে ধ্যানধারণা রূপ-পরিগ্রহ করিয়া কায়াকান্তিময় হইয়া উঠে, ইহা স্বতঃসিদ্ধরূপে পরিগণিত। সাহিত্যিক জীবন ও জগতের রূপ-সৌষম্য দান করিতে সাধারণতঃ বুদ্ধি বা অনুভূতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, তিনি ইন্দ্রিয় বা মনের সাহায্যে সত্যের গুহাহিত মর্ম্মটি উদ্‌ঘাটন করিয়া উঠিতে পারেন না—বার বার করিয়া তাঁহার 'কাঙাল নয়ন' সত্য-দীপ্তির নিকট হইতে ফিরিয়া আসে—তাঁহার পঞ্চেন্দ্রিয় তাঁহাকে ব্যর্থতায় বিমূঢ় করিয়া দেয়, এবং তাঁহার মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কল্পনা সেই তুরীয় মার্গে উপনীত হইতে পারে না। অথচ, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যে সত্য-শিহরণ তিনি উপলব্ধি করেন, তাহার সত্যতা-বিচার জ্ঞানে নয়, বুদ্ধিতে নয়, মেধায় নয়, প্রজ্ঞায় নয়, বোধিতে (*Intuition*)।)

(মিষ্টিক সীমার মধ্য হইতে সীমাহীন অপরূপের স্বাদ গ্রহণ করিয়া অনুভব করেন—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি'
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

এবং তিনি উপলব্ধি করেন—

সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি'।)

(মিষ্টিকের ভাষা জ্ঞানীর বা ভাবুকের ভাষা নয়, ইঁহার ভাষাকে আমরা 'সন্ধ্যা ভাষা' বা 'আলো-আঁধারি ভাষা' নামে আখ্যাত করিতে পারি। কবি বিশেষ রূপ-বন্ধ (*image*), উপমা (*Simile* বা *Metaphor*) ও প্রতীকের (*Symbol*) সাহায্যে অবাঙমনসগোচর সেই সত্তাকে গোধূলি-আলো-পরিম্লান রহস্যাচ্ছন্ন ভাষায় আমাদের নিকট উপস্থাপিত করেন। সত্যকে, সমুচ্চকে মানুষ যে ধরিতে চায়, পাইতে চায় এবং উহার সহিত অভিন্নতা সৃষ্টি করিয়া একাত্ম হইতে চায়, ইহা মনের নয়, বুদ্ধির সংযোগে নয়—বোধি-দৃষ্টির ফলেই সম্ভব হইতে পারে। এই দৃষ্টি-সম্ভূত অনুভূতি এক প্রকার প্রাতিভ জ্ঞান—কাল ও ব্যাপ্তির অতীত এক প্রকার দিব্যানুভূতি—

বিচিত্র এ মত্তদশা,
ভাবভরে যোগে বসা,
হৃদয়ে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জ্বলে।

এই দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন কবি তর্ক করেন না, যাচাই করেন না, পরীক্ষা করেন না, বরং সত্যকে অপরোক্ষ করেন বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিশ্বাস করেন, গ্রহণ করেন।

বিচারের দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা পরমপুরুষ ও কবির মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হয়; এইজন্যই বিচারের অতীত বোধি-দৃষ্টির সাহায্যে কবি নিজেকে পরম সত্তার সহিত একীভূত করিয়া অনুভব করেন। মিষ্টিক কবি বিশ্ব-জগৎ ও আত্ম-জগতের

মধ্যে কোন দ্বন্দ্বকেই স্বীকার করেন না ; বিশ্ব ও আত্ম-জগৎ যেন একটি সুষম, সঙ্গতিপূর্ণ, পরম সমন্বিত অখণ্ড সত্যরূপে তাঁহার কাছে প্রতিভাত। ভগবান তাঁহার কাছে কোন পৃথক বস্তু-সত্তা নয় ; ভগবৎ অনুভূতিও যেন তাঁহার ব্যক্তি-জীবনের অভিজ্ঞতা-প্রসূত আত্মদর্শন মাত্র। কবি যখন এইরূপ একটি অখণ্ড চিন্ময়-লোকে উপনীত হন, তখন তিনি ভোক্তা নহেন, রূপ-পূজারী নহেন, দ্রষ্টাও নহেন—ভাবলোকে উত্তীর্ণ এক বিদেহী বিশ্ব-চৈতন্য। কাজেই ব্যক্তি ও বস্তুর বিভিন্নতা তখন তাঁহার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই সমাধি-অবস্থাতে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ যেমন *'central peace at the heart of things'* অনুভব করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথও তেমন বিশ্বের চির-চলিষ্ণুতার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—

স্থির আছে শুধু একটি বিন্দু,
ঘূর্ণীর মাঝখানে।

কোন কাব্যে উপমা প্রভৃতি ব্যবহৃত হইলেই উহা মিষ্টিক গুণ সম্পন্ন হয় না। কিন্তু কবি যখন জগৎ ও জীবন রহস্যের অদৃষ্ট-পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সম্মুখে বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া নির্ব্বাক হইয়া পড়েন, তখন তাঁহার প্রাণের ভাষা যেন সহজেই প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করে—টেনিসনের মত সহজ সরল স্বচ্ছ চিন্তা-প্রধান কবিও 'সূর্য্যাস্ত ও সন্ধ্যাতারা'র সাহায্যে কী এক অপরিচিত বা অর্দ্ধ-পরিচিত রহস্য-বিস্ময়কে যেন ইঙ্গিত করেন। 'খেয়া' কাব্যের নামটিই যেমন রবীন্দ্রকাব্যে তট-পরিবর্ত্তনের 'প্রতীক' রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, শেলীর জীবনালেখ্যও তেমন বিচিত্র-সুন্দর গুম্বজরূপে প্রতীকিত হইয়াছে—

Life, like a dome of many-coloured glass
Stains the white radiance of eternity.

'প্রতীক' এইভাবে আমাদের কাছে (১) কাব্যের বিষয়-বস্তু ব্যাখ্যা করে, (২) কবির অনুভূত সত্যকে প্রত্যয়-সত্যতা দান করে, (৩) বাস্তব-জীবনের কঠিনতা হইতে কবির মুক্তি-পিপাসা ইঙ্গিত করে, (৪) কবির অত্যন্ত ব্যক্তিগত

(esoteric) অভিজ্ঞতার বাণীকে কাব্য-শ্রী দান করে, (৫) এবং কাব্য-দেহের প্রসাধন-রচনায় সহায়তা করে।*

রোমাণ্টিক বা কল্পনা-বিলাসী কবি যাহাকে বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে সমুজ্জ্বল করিয়া দেখেন, মিষ্টিক তাহাকে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে সমাহিত সান্ধ্য-সৌন্দর্যে অনুভব করেন। এই অনুভূতির মধ্যে আত্মবোধের পীড়ন নাই, আত্মাহুতির 'অকূল শান্তি ও বিপুল বিরতি' আছে। সুতরাং, যে-অখণ্ড দৃষ্টির সাহায্যে কবি ভগবৎ সত্তা, তথা বিশ্ব-সৃষ্টির পরম সত্যকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সহিত একাগ্রতার পরম আনন্দ লাভ করিতে পারেন, সাহিত্যে সেই বোধি-দৃষ্টি-সাধনাকে আমরা মিষ্টিসিজম্ নামে অভিহিত করিতে পারি। বলা বাহুল্য, ইহা কোন মতবাদ নয়, সত্যানুভূতির দৃষ্টি-প্রদীপ মাত্র।

বোধি-দৃষ্টি-বশতঃই দেহতত্ত্ববিদ ভক্ত বাউল-কবি গাহিয়াছেন—

দেল দরিয়া খবর করহে মন।
তোর কোথা বৃন্দাবন, কোথা নিধুবন, কোথায় রে তোর গুরুর আসন।
যদি পদ্মা পারি দিবি, তবে ঢাকা দেখতে পাবি,
মুখসুধাবাদ করবে অন্বেষণ।
আছে কলিতে কলিকাতা, তিন শহরে আটা,
সাঁতার দে যায় রসিক যে জন।*

---

*সাহিত্যে প্রতীকের ব্যবহার সুপ্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। বাইবেলের গল্পগুলিতে, মেটারলিঙ্কের নাটকে এবং আধুনিককালে ঠাকুর রামকৃষ্ণের উপদেশাবলীতে ইহাদের প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে। ইংরেজী সাহিত্যে *Anglo-Saxon* যুগের *The Phoenix*, মধ্যযুগের *Pearl, Piers Plowman*, চসারের *Romaunt of the Rose, Parliament of Fowls*, সপ্তদশ শতাব্দীতে Drydenএর *Absalom and Achitophel*-এ, এবং পরবর্ত্তীকালে *Gulliver's Travels, The Coming and Passing of Arthur, Crossing the Bar* প্রভৃতিতে ইহার ব্যবহার সুস্পষ্ট। বাংলা সাহিত্যেও, উনবিংশ শতাব্দীর বহু পূর্ব্বে বাউল সঙ্গীতে (যথা, খাঁচার ভিতর অচিন্ পাখী কমনে আসে যায়, ধরতে পারলে মনোবেড়ী দিতেম উহার পায়) এবং দেহতত্ত্বমূলক সঙ্গীতে (যথা, কলের গাড়ী চলছে কি বাহার, কলের গাড়ী=মানবদেহ), রামপ্রসাদের গানে (যথা, মা আমায় ঘুরাবি কত···), এবং হেমচন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা', দ্বিজেন ঠাকুরের 'স্বপ্ন-প্রয়াণ', রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর, রাজা, রক্তকরবী প্রভৃতি নাটকে ইহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

* অক্ষয়কুমার দত্ত : ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়।

এবং এই দৃষ্টিবলেই Blake পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করেন—

If they (angels) see any weeping
That should have been sleeping,
They pour sleep on their head,
And sit down by their bed.

যে প্রেম-দৃষ্ট বলে 'গৃহিনী, ভগিনী ও দেবীরূপে' ইংরেজ কবি তাঁহার প্রেমিকার পূজা করিতে পারেন, তাহা অপেক্ষা উচ্চতর দিব্যদৃষ্টি বলে বৈষ্ণব-কবি চণ্ডীদাস তাঁহার প্রেমিকা-বন্দনায় গাহিতে পারেন -

তুমি রজকিনী আমার রমণী
তুমি হও মাতৃপিতৃ
ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারি ভজন
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী।

বিহারীলালের প্রেমারতি আরও সুগভীর ধ্যানদৃষ্টি-সম্ভূত -

কে তুমি জননী পিতা,
নন্দিনী, রমণী, মিতা,
প্রেম-ভক্তি-স্নেহ-রস-উদার-উচ্ছ্বাস
কে তুমি মা জলস্থল,
মহান অনিলানল,
নক্ষত্র-খচিত নীল অনন্ত আকাশ ?
কে তুমি ? কে তুমি এই বিরাট বিকাশ ?

ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতি-পূজায় তপোমগ্ন দৃষ্টিবলে বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে এক অখণ্ড হৃদয়-নন্দিনীকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন -

And I have *felt*
A presence......... ....
A motion and a spirit, that impels
All thinking things, all objects of all thought,
And rolls through all things.

প্রকৃতি-বন্দনায় রবীন্দ্রনাথ মিষ্টিক দৃষ্টি বলেই প্রকৃতির মধ্যে সুন্দরের আবাহন করিতেছেন—

> হের গগনের নীল শতদলখানি
> মেলিল নীরব বাণী।
> অরুণ-পক্ষ প্রসারি সকৌতুকে
> সোনার-ভ্রমর আসিল তাহার বুকে
> কোথা হ'তে নাহি জানি।

যে-দৃষ্টিতে বৈষ্ণবকবি সমস্ত বিশ্বকে এক রাধা-ধাতুতে গঠিত দেখিয়াছেন, তাহার অনুরূপ দৃষ্টি-আলোকেই শেলী বিশ্ব-সৃষ্টিকে এক অখণ্ড সৌন্দর্য্য-ধাতুরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—

> And my spirit.................
> Interpenetrated lie
> By the glory of the sky ;
> Be it love, light, harmony,
> Odour, or the soul of all
> Which from Heaven like dew doth fall,
> Or the mind which feeds this verse
> Peopling the lone universe.

রবীন্দ্রনাথও সমন্বয়ী-দৃষ্টির আলোকে সৌন্দর্য্য-পূজা সমাপন করিয়াছেন—

> জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
> তুমি বিচিত্ররূপিনী।
> অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
> তুমি অন্তর-ব্যাপিনী।
> একটি স্বপ্ন-মুগ্ধ সজল নয়নে,
> একটি পদ্ম হৃদয়-বৃন্ত-শয়নে,
> একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত-গগনে,
> চারিদিকে চির-যামিনী।

ইংরেজী সাহিত্যে Walter De La Mare পরিপূর্ণ মিষ্টিক দৃষ্টি সম্পন্ন নহেন। তিনি *The Listeners* কবিতায় যে অলৌকিক সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন, উহা যেন নেহাৎ খেয়ালী-কল্পনা-প্রসূত মাত্র। বরং Yeats-এর কবিতায় মিষ্টিক

দৃষ্টি আরও গভীর তাহার। *The Land of the Heart's Desire* এবং *The Shadowy Waters*-ই তাহার প্রমাণ। *A. E.* যেন স্তিমিত গোধূলি-সৌন্দর্য্যে জীবনকে দেখিতে চাহেন—ফলে, তিনি বিশ্ব-রহস্যকে, পরমপিতা পরমেশ্বরের অস্তিত্বকে, এক অনির্ব্বচনীয় জ্যোতির্ম্ময় সঙ্গতির মধ্যে অনুভব করেন—

> When thc breath of twilight blows to flame the misty skies,
> All its vaporus sapphire, violent glow and silver gleam
> With their magic flood me through the gateway of the eyes ,
> I am one with the twilight's dream.
>
> —*The Unknown God.*

ইতিপূর্ব্বে আমরা ভক্তি, প্রেম, প্রকৃতি, সুন্দর-পূজা প্রভৃতি বিষয়ক কাব্যে বিভিন্ন কবির মিষ্টিক দৃষ্টি-ভঙ্গির উল্লেখ করিয়াছি। এই স্থলে একটি প্রশ্নের আলোচনা প্রয়োজনীয়। অনেকে মনে করেন যে, ধর্ম্ম বা ভগবান সম্বন্ধীয় সাহিত্য ব্যতীত অন্যত্র মিষ্টিসিজম্ দৃষ্ট হয় না। (অবশ্য, মধ্যযুগের ভারতীয় মিষ্টিক-সাধনা ও পারস্যের আবু সাঈদ, হাল্লাজ, হাফিজ, জালালুদ্দীন, রুমী প্রভৃতি সুফী-মতাবলম্বীদের সাধনায় ধর্ম্মের সংযোগ আছে)। কিন্তু এই ধারণা আংশিকভাবে সত্য। কারণ, ভগবান সম্বন্ধে কতকগুলি সুস্পষ্ট স্থূল ধারণা প্রায় প্রত্যেকেরই আছে। ভগবানের জন্য মানুষের সহজ বা সুলভ উচ্ছ্বাসময় আকুতির মধ্যে মিষ্টিক-দৃষ্টি নাই—'রূপসাগরে ডুব দিয়ে' অরূপ-রতন-সন্ধানী দৃষ্টি বরং অনেকটা মিষ্টিক-দৃষ্টি সম্ভূত।

অনেকে মনে করেন যে, যাহা দুর্ব্বোধ্য কিংবা সহজবোধ্য নয়, অথবা যাহা দার্শনিক তত্ত্বঘটিত, তাহাই মিষ্টিক-দৃষ্টি প্রসূত। ইহাও সর্ব্বাংশে সত্য নয়। কারণ, দর্শনের উদ্দেশ্যও সত্য আবিষ্কার—দার্শনিক সত্যকে কোন রহস্যাচ্ছন্ন 'আলো-আঁধারি-অন্তরাল'-নিহিত রূপে গ্রহণ করেন না। যাহা অসম্ভব, অভাবনীয় বা অতি-প্রাকৃত বলিয়া আপাততঃ মনে হয়, তাহাকেও তিনি কোন নিয়মাধীন করিয়া ব্যাখ্যা করিতে না পারিলে তাহার সত্য-সন্ধানের উদ্দেশ্যকে তিনি ব্যর্থ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু মিষ্টিক বিশ্ব-চেতনা ও অহং-চেতনা এক পরম শক্তি-বিধৃত রূপে প্রত্যক্ষ করেন—জ্ঞানের দ্বারা নয়, বোধি দ্বারা।

(সর্ব্বশেষে আমরা বলিতে পারি যে, বোধি দৃষ্টির ফলেই সমুচ্চ অনন্ত সত্তার সহিত সান্ত মানবসত্তার বিভেদ তিরোহিত হয়। শ্রেয়ঃ ও প্রেয়কে, পরমকে জানিতে হইলে জ্ঞানের দ্বারা সম্ভবপর নয়, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিজ্ঞানের দম্ভ এইখানে পরাজিত, কারণ বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা ও কৌতূহলের সৃষ্টি করিয়া অশেষ প্রকার সংশয়াচ্ছন্ন মতবাদের সৃষ্টি করিতে পারে। *Agnosticism* বা অজ্ঞেয়তা-বাদই বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার চরম মীমাংসা। পরমকে জানা ও পরম হওয়া বলিতে যাহা বুঝায় অর্থাৎ, জানা (*Knowing*) যখন হওয়ার (*Becoming*) সহিত অভিন্ন ও অচ্ছেদ্য হইয়া উঠে, সেই ধ্যানদৃষ্টি-সম্ভূত চরমাবস্থার কথা বিজ্ঞান ভাবিতে পারে না। যোগী যাহা ধ্যানে ও কবি যাহা নেশায় পাইয়া থাকেন, সেই অহং-বিলুপ্ত তন্ময়াবস্থা মিষ্টিকের ব্যক্তিগত অনুভূতি। শ্রুতি যাহাকে পরাবিদ্যা বলেন, ইহাও বোধ হয় তাহাই।

২০

বাংলা কবিতার ছন্দ

ছন্দ কথাটির অর্থ অনেক রকম হইতে পারে। সাধারণভাবে বলা যায়, ছন্দ অর্থ সৌষম্য। মুখের ছাঁদ বলিতে মুখের সৌষম্য, কবিতার ছন্দ বলিতে ধ্বনি-বিন্যাসের সৌষম্য এবং বিশ্বের ছন্দ বলিতে জগৎ-ব্যাপারেব সৌষম্য. এইরূপ অর্থ করা যায়।

ভাষার ক্ষেত্রে গদ্যের ছন্দ বা পদ্যের ছন্দ বুঝাইতেও সেই একই কথা। পদ্যের ন্যায় গদ্যেরও ছন্দ আছে। সেই ছন্দের পরিমাপ লেখকের ধ্বনি-রসবোধের উপর নির্ভর করে। গদ্যের ছন্দের কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নাই। কিন্তু শব্দগত ও অর্থগত প্রস্বর সহযোগে বাক্য উচ্চারণকালে আপনা হইতেই বাক্য মধ্যে কতকগুলি খণ্ড নির্মিত হয়। আমাদের উচ্চারণের সুবিধার জন্য শ্বাস গ্রহণের ফলেই এইরূপ কতকগুলি ধ্বনিভাগ রচিত হয়। এই ধ্বনিভাগগুলির সাম্য রক্ষা করিবার প্রয়াসেই গদ্যস্পন্দের উৎপত্তি।

পদ্যের ক্ষেত্রে এই অন্তর্লীন ছন্দধ্বনি একটি বিশেষ রূপে ফুটিয়া উঠে। গদ্যে যে ছন্দ থাকে, দেহে লাবণ্যের মত অন্তর্লগ্ন, পদ্যে সেই ছন্দই শব্দের ও ধ্বনির নিয়মিত বিন্যাসে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। গদ্যে যেমন ধ্বনি-পরিক্রমার কোনো বাঁধা চাল নাই, পদ্যে সেইরূপ নয়। এখানে কবিচিত্তের জাগ্রত ভাবধারাকে আশ্রয় করিয়াই ধ্বনি নির্দিষ্ট আকারে ফুটিয়া উঠে। এই আকারকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে, ইহার ধ্বনিপ্রবাহ যতির (*Pause*) দ্বারা সমান সমান সমান অংশে বিভক্ত। সম্যক পর্য্যালোচনার দ্বারা ধ্বনিবিভাগকে সংখ্যা গণনার নিয়মবদ্ধ প্রণালীতেও লইয়া আসা সহজ হইয়াছে। সার্থক কবিগণ অবশ্যই সংখ্যা গণনার নির্দ্দেশটীকে সচেতন ভাবে অনুসরণ করিয়া কবিতা রচনা করেন না: ধ্বনি-বিভাগের সমান অংশগুলি আপনা হইতেই কবিদের কানে ধরা দেয়। কাব্য-

পংক্তিতে কোনো ধ্বনি কম বা বেশি হইলে কানের সতর্কতায় তাহা স্বাভাবিক-ভাবেই কবির অস্বাচ্ছন্দ্যের উদ্রেক করে। সেখানে তাঁহাদের অক্ষর গুণিবার প্রয়োজনটাই মুখ্য নয়। রস যখন সুন্দর ধ্বনিবিন্যাসের কৌশলে কানে এবং প্রাণে রূপময় হইয়া উঠে, তখননই যথার্থ কাব্য সৃষ্টি হয়।

রসসৃষ্টির পক্ষে ছন্দের উপযোগিতা কতটা? সাদা কথায়, নির্ব্বিকারভাবে বলিলে যাহা বিন্দুমাত্র রেখাপাত করিতে পারে না, ছন্দের মাধুর্য্যে ভরিয়া দিলে তাহাই অনির্ব্বচনীয় হইয়া উঠে। শ্রেষ্ঠ কবিশিল্পীর অভিমত এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য: মানুষের সত্তার মধ্যে এই অনুভূতিলোকই সেই রহস্যলোক যেখানে বাহিরের রূপজগতের সমস্ত বেগ অন্তরে আবেগ হয়ে উঠছে, এবং সেই অন্তরের আবেগ আবার বাহিরের রূপ গ্রহণ করবার জন্য উৎসুক হচ্ছে। এই জন্যে বাক্য যখন আমাদের অনুভূলোকের বাহনের কাজে ভর্ত্তি হয়, তখন তার গতি না হোলে চলে না। সে তার অর্থের দ্বারা বাহিরের ঘটনাকে ব্যক্ত করে, গতির দ্বারা অন্তরের গতিকে প্রকাশ করে। আমরা ভাষায় বলে থাকি, কথাকে ছন্দে বাঁধা। কিন্তু এ কেবল বাইরে বাঁধন, অন্তরে মুক্তি কথাকে তার জড়ধর্ম্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ। সেতারের তার বাঁধা থাকে বটে, কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ হচ্চে সেই তারবাঁধা সেতার, ইহার অন্তরের সুরকে সে ছাড়া দিতে থাকে।*

বাংলা ভাষা-প্রকৃতির ফলেই বাংলা কবিতায় ছন্দের প্রয়োজন। আমাদের ভাষায় ইংরেজীর ন্যায় প্রখর প্রস্বর (*Stress*) নাই কিংবা সংস্কৃতের ন্যায় হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ দ্বারা ভাষাকে গম্ভীর করিবারও উপায় নাই। বাঙালীর ভাষায় উচ্ছ্বাসের প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। উচ্ছ্বাসের অসংযত ধাবমানতাকে ছন্দের সংযমে বাঁধিতে পারিলে ইহার ব্যঞ্জনাশক্তি বৃদ্ধিই পায়। বাংলা ভাষার প্রকৃতিতে কঠোর পৌরুষ নাই—ইহার কল্লোলধ্বনি সমুদ্রের নয়, তটিনীর। ছন্দধ্বনিকে আয়ত্ত করিয়া রস যতটা গাঢ় হইয়া উঠিতে পারে, নিশ্ছন্দ কবিতাতে ততটা নয়। যে ধরণের কাব্যরস বাঙালী বাংলা ভাষায় সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা

* রবীন্দ্রনাথ: ছন্দ।

বাঙালীর মানস-প্রকৃতিরই অনুকূল। যে এই রসকে প্রকাশ করিয়াছে সে ছন্দ যে একান্তই বাংলা কবিতারই ছন্দ, অন্য ভাষার পক্ষে তাহা প্রয়োগ করা একেবারেই অসম্ভব, এ কথাও বুঝিয়া দেখা দরকার।

বাংলার এই নিজস্ব ভাষাপ্রকৃতি হইতে তিন প্রকার ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে। বাংলা ভাষায় সাধু ও কথাভেদে দুই প্রকার রচনাপদ্ধতি প্রচলিত আছে। বাংলা ভাষার নিজস্ব উচ্চারণপ্রণালী এই স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করিয়া ছন্দ তিনটি আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছে।

তখন গম্ভীর মন্দ্রে সন্ধ্যারতি বাজে—

এই পংক্তির ধ্বনি বিশ্লেষণ করিলে আমরা দুই প্রকার ধ্বনি পাই। একটি যুগ্মধ্বনি বা যুক্তাক্ষর—হসন্ত ধ্বনির সহিত স্বরাশ্রিত ব্যঞ্জনের মিশ্রণের ফলে যাহার উৎপত্তি, যথা—গম্ এবং ভীর্, অন্যটি শুধু স্বরাশ্রিত ব্যঞ্জন—হসন্ত নাই, যথা—বা, জে। এইরূপে—

ত | খন্ গম্ | ভীর্ | মন্+দ্রে সন্+ধ্যা | র | তি বা+জে

এই কবিতার পংক্তিতে বারোটি ধ্বনি, দল অথবা সিলেবল আছে। সিলেবলের (*Syllable*) বাংলা প্রতিশব্দ অক্ষর বলিয়াই চলিয়াছে। কিন্তু অক্ষর বলিলে লিখিত হরফ বা বর্ণের সহিত অর্থবিভ্রাট হইবার সম্ভাবনা আছে এবং তাহার ফলে বহুবিধ অনাবশ্যক জটিলতার সৃষ্টি হয় বলিয়া কেহ কেহ সিলেবলের প্রতিশব্দরূপে দল কথাটি ব্যবহার করিবার পক্ষপাতী। ছন্দ পরিভাষায় এই শব্দটি সম্পূর্ণ নবাগত নয়, কবি সত্যেন্দ্রনাথ বহুকাল পূর্ব্বে সিলেবলের প্রতিশব্দরূপে "শব্দ-পাপড়ী" কথাটি ব্যবহার করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। হসন্ত ধ্বনির দ্বারা (অর্থাৎ 'গম্' বা 'ভীর্') যে দল মিলিত হয়, তাহাকে বলে রুদ্ধদল (*Closed Syllable*) এবং স্বরান্ত ধ্বনিকে বলা হয় মুক্তদল (*Open Syllable*)।

উচ্চাঙ্গ কাব্যপংক্তির ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য অংশের নাম দল। দলের বিন্যাস-কৌশল হইতে কবিতায় ছন্দের সুস্পষ্ট আবির্ভাব ঘটে। "যাহাকে কবিতায়

ছন্দের বাণীরূপ বলা যায়, তাহার মূলে আছে ভাষায় নির্মিত নানা ছাঁচের *rhythmic pattern*-এর একটি নির্দিষ্ট মাপের স্পন্দিত বা তরঙ্গিত বাক্যধ্বনি ; সেই মাপযুক্ত বাক্যধ্বনি নিয়মিতভাবে পুনরাবর্তিত হইতে থাকিলে ছন্দোবদ্ধ বাক্যের সৃষ্টি হয়। পদ ও পর্বের ভাগ, যতি বা ছন্দোভাগ এই সকলের দ্বারাই সেই *rhythmic pattern* রচিত হইয়া থাকে এবং তাহাতেই কানে কবিতার সেই বিশেষ রূপটি ধরা দেয়।"* কবি মোহিতলাল পংক্তির এই নির্দিষ্ট মাপকে ছন্দ পরিভাষায় বলেন, মাত্রা (মীয়তে ইতি মাত্রা)। মাপ বস্তুভেদে বিভিন্ন হইতে পারে। মাত্রা বা *Unit of Measure* একটা সব ছন্দেই থাকিবে, কিন্তু তাই বলিয়া ছন্দোরীতি নির্বিশেষে মাত্রা যে একই হইবে, তাহা নয়। এই মাপ বা মাত্রা নির্ণয় হইবে কি দিয়া? ধ্বনির উচ্চারণকাল দিয়াই এই মাত্রা স্থির করা যায়। একটি হ্রস্বস্বরের উচ্চারণ কালের নাম কলা (*Mora*)। শ্রুতিতে যে ধ্বনিপ্রবাহ ছন্দের আভাস জাগাইয়া দেয়, কলাই তাহার পরিমাণ স্থির করে।

এই কলামাত্রার লীলাক্ষেত্র বাংলা সাধুভাষায়। বাংলা সাধুভাষার দীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনার এই কলামাত্রিক বৈশিষ্ট্যটি স্পষ্ট হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথ যাহাকে পয়ারজাতীয় ছন্দ বলিয়াছেন, সাধুভাষায় সেই ছন্দে শব্দ-মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনি এবং শব্দপ্রান্তবর্তী যুগ্মধ্বনির ওজন সমান নয়। শব্দের মধ্যে যুগ্মধ্বনি বা রুদ্ধদলকে যদি এককলা মূল্য দেওয়া যায়, শব্দান্তিক রুদ্ধদলকে তাহা হইলে দুই কলা মূল্য দিতে হয়। যেমন উপরে উদ্ধৃত পংক্তিতে :

১ + ২   ১ + ২   ১ + ১   ১ + ১ + ১ + ১   ১ + ১
ত + খন্   গম + ভীর্ মন্ + দ্রে   সন্ + ধ্যা + র + তি   বা + জে

—শব্দমধ্যবর্তী 'গম'-দলটিকে এক কলা মূল্য দেওয়া হইয়াছে কিন্তু শব্দান্তিক 'ভীর্'-দলটিকে দুই কলা মূল্য দিতে হইয়াছে। ইহার কারণ, সাধুভাষার পয়ার জাতীয় ছন্দে আমরা শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে <u>সংশ্লিষ্ট</u> উচ্চারণ করি এবং শব্দান্তিক যুগ্মধ্বনিকে আমরা <u>বিশ্লিষ্ট</u> উচ্চারণ করি। ছন্দের রাজ্যে ধ্বনির শাসন

* শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এইজন্য ইহাকে বলিযাছেন 'তানপ্রধান ছন্দ' (বাং ছন্দের মূলসূত্র (৪র্থ সং) পৃঃ ৯৭ দ্রষ্টব্য)।

আমাদিগকে মানিতেই হইবে। ধ্বনির আচরণ অনুসরণ করিলে শাসনটি এইরূপ : শব্দের আদি বা মধ্যবর্ত্তী রুদ্ধদল এককলা হইলেও শব্দান্তিক রুদ্ধদল দুই কলাই হইবে। মুক্তদল সর্ব্বদা এক কলা।

কলা-গণনার এই বৈচিত্র্যহেতু এই ছন্দের নাম জটিল কলামাত্রিক ছন্দ। সাধারণভবে এই ছন্দ অক্ষরবৃত্ত বা অক্ষরমাত্রিক, বা বর্ণমাত্রিক নামেও পরিচিত। এই ছন্দের বিশ্লেষণ পদ্ধতি যাহা নির্দ্দেশ করা হইল, এই ছন্দকে চিনিবার তাহা ছাড়াও কতকগুলি লক্ষণ আছে। এই ছন্দের বেগ অতিশয় মন্থর, জলের স্রোতের মত সুরের স্রোতে ইহা ভাসিয়া চলে। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে ব্যবহৃত পয়ার ছন্দে এই তান বা সুরের প্রাধান্য এই ছন্দকে গানের মত প্রবাহিত করিয়া তুলিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের 'এ কথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর সাজাহান' অথবা 'নহ মাতা নহ কন্যা', অথবা 'ম্লান হয়ে এল কণ্ঠে মন্দার মালিকা' প্রভৃতি কাব্যপংক্তিতে গতিবেগের মন্থর মসৃণতা এই কবিতাগুলিকে প্রৌঢ় গাম্ভীর্য্য দান করিয়াছে। এই স্বচ্ছন্দ প্রস্বরহীন ছেদহীন গতিবেগ এই ছন্দকে অতিশয় সুস্পষ্ট করিয়া তুলিলেও এই ছন্দের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ ইহার পদভাগ—

১। কাশীরাম দাস কহে। শুনে পুন্যবান ॥
২। যে জন দিবসে। মনের হরষে। জালায় মোমের বাতি ॥
৩। সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি। ঝিলমের স্রোতখানি। বাঁকা ॥

উচ্চারণের সুবিধার জন্য কতকগুলি বিশ্রামস্থান মানিয়া লইতে হয়—ইহাকে বলে যতি। পংক্তির এই যতি দ্বারা বিচ্ছিন্ন অংশকেই বলে পদ। প্রত্যেকটি পদই যে সমমাত্রিক হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। তবে আর কোন ভাগ থাকুক বা না থাকুক, এই পদভাগ থাকিবেই। এই পদভাগের দ্বারা ছন্দকে চিনিয়া লওয়া সহজ হয় বলিয়া মোহিতলাল এই ছন্দের নামকরণ করিয়াছেন 'পদভাগের ছন্দ'। এই পদভাগ রবীন্দ্রনাথের হাতে বিচিত্র আকারে দেখা দিয়াছে, কিন্তু সমগ্র মধ্যযুগের কাব্য-সাহিত্য যে ছন্দোরীতির উপর নির্ভর করিয়াছিল, সেই পয়ারে ইহার পদভাগ ছিল সুনির্দ্দিষ্ট—আট ও ছয়।

এইরূপ সমিল দুই পংক্তিতে একটি শ্লোক। আট ও ছয়ের ভাগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পয়ারকে বলা যায় দ্বিপদী।

জটিল কলামাত্রিক ছন্দে ধ্বনির এই স্থিতিস্থাপক গুণকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, 'শোষণ শক্তি'। এই শক্তির বশে এই ছন্দে জয়জয়ন্তীর উচ্চ-গম্ভীর ধ্বনি এবং পূরবী সাহানার মৃদু করুণ সুর—এই দুই স্বরগ্রামই একই বীণাতারে ঝঙ্কৃত হইয়াছে। মধুসূদনের **অমিত্রাক্ষর** এই সুর সাধনা করিয়া সিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের গাঁথুনি প্রাচীন সেই আট-ছয়েরই গাঁথুনি। কিন্তু পয়ারে কবির স্বাধীনতা খর্ব্ব ছিল। এক পংক্তিতেই বাক্য গঠন শেষ হওয়ায় কবির ভাবকে ওই চৌদ্দ-কলার মধ্যেই শেষ করিতে হইত। কিন্তু মুখে আমরা চৌদ্দটি ধ্বনি উচ্চারণ করিয়াই যে সর্ব্বদা বাক্য শেষ করি, তাহা নয়। মৌখিক গদ্য বাক্য কখনও দীর্ঘ চতুর্দ্দশাতিক্রান্ত, কখনও বা ক্ষুদ্রতর হয়; অর্থ ও ভাব বাক্যের অনেক স্থলেই এমন প্রস্বর প্রয়োগ করে, কিংবা যতি এমন বিরাম রচনা করে, যাহা চৌদ্দর তর্জ্জনী-ক্ষুব্ধ আট-ছয়ের শৃঙ্খলযুক্ত বাক্যে স্বাভাবিক হইয়া উঠে না। অথচ কবি জানিতেন, জটিল কলামাত্রিক ছন্দে যুগ্মধ্বনির ব্যবহার-যোগ্যতায় একদিকে যেমন উদাত্ত-গম্ভীর সুর ফুটিয়া উঠে, তেমনই আবার অযুগ্ম-ধ্বনির ব্যবহারে করুণ সুরও বাজিয়া উঠিতে পারে। একদিকে যেমন যুদ্ধ-বর্ণনা, আর একদিকে তেমন বন্দিনী সীতার ব্যথাতুর কণ্ঠস্বর—এই উভয়কেই অমিত্রাক্ষর ছন্দই বহন করিল—করুণ ও রুদ্রকে, পার্ব্বতী ও পরমেশ্বরকে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের মিলহীনতাই যেমন এই ছন্দের একমাত্র পরিচয় নয়, তেমনই ইহার চৌদ্দটি দল আছে, ইহাই তাহার সবখানি পরিচয় নয়। সাধারণ গদ্যবাক্য উচ্চারণ করিবার সময় আমরা যে যতি-স্বাধীনতা গ্রহণ করি, সেই একই স্বাধীনতা কবি এখানেও গ্রহণ করিলেন। এই ছন্দের কাঠামো পয়ারের অর্থাৎ সেই আট-ছয়ের সংযম। কিন্তু কবি পয়ারের ন্যায় একটি শ্লোকেই একটি ভাবকে আবদ্ধ না রাখিয়া দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা ততোধিক পংক্তিতে টানিয়া

লইয়া গেলেন। সুতরাং এই ছন্দের প্রধান গুণ এই যে, ইহাতে ভাব ছন্দকে অনুসরণ করে না, ছন্দই ভাবকে অনুসরণ করে—

হে সুন্দর,+বীর আসি, । কহ মোরে,+শুনি, ।—
কোন্ দুঃখে ভবসুখে । বিমুখ হইলা।
এ নবযৌবনে তুমি ?+ ॥ কোন অভিমানে।
রাজবেশ ত্যজি তুমি । উদাসীর বেশে ? ॥
হেমাঙ্গ মৈনাক সম,+ । হে তেজস্বি,+কহ, ।+
কার ভয়ে ভ্রম তুমি । এ বন-সাগরে।
একাকী,+আবরি' তেজঃ । ক্ষীণ, + ক্ষুণ্ণ খেদে ? ॥

এই পদ্যানুচ্ছেদে দ্বিদণ্ড চিহ্নিত তিনটি স্থানে তিনটি বাক্য শেষ হইয়াছে—কোনটাই পয়ারের ন্যায় একটি পংক্তিতে সমাপ্ত হইতেছে না—দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ পংক্তিতে বাক্যটি ভাবানুসারে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। একদণ্ড চিহ্নের দ্বারা আট-ছয়ের হিসাব রক্ষিত হইলেও যুক্ত চিহ্নের দ্বারা ভাব ও অর্থানুযায়ী আরো বহু যতি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং পয়ারের সহিত ইহার পার্থক্য হইল, এই ছন্দে ছন্দযতি ছাড়াও ভাবযতি পড়িবার পূর্ণ স্বাধীনতা রহিয়াছে। প্রচুর যতিপতন ও তজ্জাত পদ-সৃষ্টির ফলে প্রস্বর-লীলাও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। বাংলা ভাষায় ইংরেজির মত প্রবল accent নাই বটে, কিন্তু বাংলা শব্দের আদ্যধ্বনিতে (যথা, ম´াথা, মাথ´া নহে) একটু প্রস্বর পড়েই। এই প্রারম্ভিক প্রস্বরের জন্য বাংলা শব্দ শব্দশেষে দুর্ব্বল হইয়া স্বরান্তিকতাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। এইজন্যই আমাদের কথ্য বাচনভঙ্গীতে হসন্ত স্বরের প্রাদুর্ভাব।

প্রস্বর যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রাণস্বরূপ, তাহা রবীন্দ্রনাথের অমিল প্রবহমান পয়ারের সঙ্গে তুলনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। অমিত্রাক্ষর ছন্দের দুইটি গুণ, অমিত্রতা ও প্রবহমানতা, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু অমিত্রাক্ষরের প্রস্বর-প্রাধান্য যে উদাত্ত ধ্বনি-গৌরবের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার অভাবে

রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষর গীতিধর্ম্মী, সুরাশ্রয়ী হইয়া উঠিয়াছে। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরে পদভাগগুলি ক্ষুদ্র, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছন্দে সেগুলি বৃহত্তর—

> উদ্ধত অধীর রোষে ধনু-অগ্রভাগে
> করিনু তাড়না ;—সরল সুদীর্ঘ দেহ
> মুহূর্ত্তেই তীরবেগে উঠিল দাঁড়ায়ে
> সম্মুখে আমার,—ভস্ম-সুপ্ত অগ্নি যথা
> ঘৃতাহুতি পেয়ে শিখারূপে উঠে ঊর্দ্ধে
> চক্ষের নিমেষে।

জটিল কলামাত্রিক ছন্দেই পয়ার, ত্রিপদী অমিত্রাক্ষর প্রভৃতি ছন্দোবন্ধের সৃষ্টি হইয়াছে। বলাকার 'মুক্তক ছন্দ' এইরূপ আর একটি ছন্দোবন্ধ। মুক্তকের ন্যূনতম আয়তন দুই মাত্রা, বৃহত্তম আয়তনে আঠারো মাত্রা। পংক্তির এই আয়তন-স্বাধীনতায় কবি নূতন একটি কৌশল করিলেন—মুক্তকে মিলের নূপুর পরাইয়া দিলেন; ফলে, ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্যেও সঙ্গীত বাজিয়া উঠিল এবং ছন্দ রূপহীন না হইয়া রূপময় হইয়া উঠিল।

জটিল কলামাত্রিক ছন্দে দেখা গেল, ইহাতে শব্দমধ্যবর্ত্তী রুদ্ধদলের হসন্ত ধ্বনিকে শোষণ করিবার এই আশ্চর্য্য মাত্রিক গুণ রহিয়াছে। এই সাধুভাষারই আর একটি ছন্দে রুদ্ধদলের স্পর্শকাতরতা অতিশয় বিস্ময়কর। জটিল কলামাত্রিক শব্দান্তিক রুদ্ধদলের মূল্য দুই কলা, অন্যত্র এককলা, কিন্তু সরল কলামাত্রিকে শব্দান্তিক তো বটেই, শব্দমধ্য বা শব্দান্তের রুদ্ধদল—সর্ব্বত্রই দুই কলা মূল্যই বুঝিয়া লয়—

> ১১ ১   ১ ২   ১১   ১১ ২   ১১
> এলায়ে জটিল বক্র। নির্ঝরের বেণী
> ১ ১ ১ ১ ১১ ২   ২   ১ ১ ১ ১
> নীলাভ দিগন্তে ধায়। নীল গিরি শ্রেণী

স্পষ্টতঃই ইহা চৌদ্দকলার জটিল কলামাত্রিক পয়ার। শব্দমধ্য রুদ্ধদল 'নির্‌ঝ' এইখানে এক কলা, কিন্তু শব্দান্তিক রুদ্ধদল 'রের্‌' দুই কলা; আট মাত্রায় অর্দ্ধযতি।

সরল কলামাত্রিকের ছন্দের প্রধান গুণ ইহার ধ্বনিখণ্ড।* এই ছন্দ জটিল কলামাত্রিকের মত অবিচ্ছিন্ন নিস্তরঙ্গ স্বরের টানে চলে না। এই ছন্দে তরঙ্গ আছে, সেগুলি একের পরে এক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বহিয়া আসে :

এ কথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর শাজাহান

এই জটিল কলামাত্রিকের সহিত তুলনা করা যাক্

ঝরঝার। নির্ঝরে। অজিত। কায়

দ্বিতীয় উদাহরণে চারি কলা লইয়া এক একটি তরঙ্গ বা ধ্বনিখণ্ড রচিত হইয়াছে, পূর্ব্বেরটি ইহার তুলনায় মসৃণ, নিস্তরঙ্গ। এই ধ্বনিখণ্ডকে বলা হয় পদ (*Foot*)। এই ছন্দের এইরূপ সাবলীল পর্ব্বভাগ এবং তজ্জনিত নৃত্যচাপল্য দ্বারা ইহাকে অতি সহজেই চেনা যায়। এমন কি সেখানে যুগ্মধ্বনি নাই, রুদ্ধদলের হিসাব লইবার অবকাশ যেখানে নাই, সেখানেও এই পর্ব্বভাগের দ্বারাই ছন্দ বুঝিতে পারি :

দুয়ার বাহিরে। যেমনি চাহিরে।
মনে হোলো যেন। চিনি

জটিল কলামাত্রিকের প্রসঙ্গে পদের উল্লেখ করা হইয়াছে। পদ এবং পর্ব্ব দুইটিই ধ্বনিভাগ বটে, কিন্তু পদভাগের দ্বারা কাব্যপংক্তি আবৃত্তির সুবিধা মাত্র হয়, পরন্তু পর্ব্ব-স্পন্দন সৃষ্টি করে। পর্ব্ব লঘুপদবিক্ষেপে ছন্দকে দ্রুত চলিবার সুবিধা দেয়। এই অর্থে পদকে *Metrical Pause*, পর্ব্বকে *Rhythmical Pause* বলিতে পারি। এই যে এক একটি পর্ব্বে *rhythm* বা স্পন্দন সৃষ্টি, ইহার আসল কারণ যে, পর্ব্বের প্রথম দলে আরোপিত ঝোঁক, প্রস্বর বা *stress* তাহা একটু মনোযোগ করিলেই বুঝা যায়। অমিত্রাক্ষর ছন্দে যে প্রস্বর-ব্যবহারের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার পার্থক্য আছে। অমিত্রাক্ষর প্রস্বরের দ্বারা পর্ব্ব সৃষ্টি হয় না—অর্থাৎ ওই ছন্দের ধ্বনিখণ্ডের মাত্রা পর্ব্বের মত সমান নয়; বিশেষতঃ এই পদভাগের যতি সম্পূর্ণরূপে গদ্যবাক্যের উচ্চারণ

*ধ্বনিপ্রধান ছন্দ, বাংলা ছন্দের মূলসূত্র (৪র্থ সং) পৃ: ১০৩

অনুযায়ী হয়। পর্ব্বের যতি সেই হিসাবে কৃত্রিম, বাক্যচ্ছন্দ অনুসরণ করিয়া হয় না। এখানে ছন্দের একটি সুস্পষ্ট প্যাটার্ণ আছে। পদ ও পর্ব্বের মূল প্রভেদ এই যে, পর্ব্বের মাত্রা সুনির্দ্দিষ্ট এবং পর্ব্বের প্রারম্ভে প্রস্বর অতিশয় প্রকট।

বাংলা উচ্চারণ রীতিতে দীর্ঘস্বর নাই বলিয়া যুগ্মধ্বনি দুইকলা হইলেও অন্য উপায়, দীর্ঘ একস্বরযুক্ত মুক্তদলে দুইকলা প্রয়োগের পথ রুদ্ধ। বাংলা ভাষা দীর্ঘস্বরজাত উদাত্ত গাম্ভীর্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ভারতচন্দ্র অবশ্য সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে 'অন্নদামঙ্গলে' কয়েকটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। প্রাকৃত মাত্রাবৃত্তে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কবিতা লিখিয়াছেন, তাহাও স্মরণীয়। বিখ্যাত 'জনগণমন' এই রীতিতে রচিত। দীর্ঘ উচ্চারণ বাংলা ভাষা-রীতির বিরোধী বলিয়া তিনি এই পদ্ধতি সাধারণতঃ গানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। বিদ্যাপতির 'লাখ লাখ যুগ' এবং গোবিন্দচন্দ্র রায়ের 'নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা' কবিতাও এই মাত্রাবৃত্তে রচিত।

সরল কলামাত্রিক রীতির প্রকৃত উদ্ভাবন যেমন রবীন্দ্রনাথই করিযাছেন, তেমনই এই ছন্দের চারকলা, পাঁচকলা, ছয়কলা এবং সাতকলা—এই চারি প্রকারের পর্ব্ব রচনা করিয়া তিনি এই ছন্দের সূক্ষ্মতম বয়ন করিয়াছেন। এই ছন্দোরীতিতে তিনকলার পর্ব্ব স্বীকারের প্রয়োজন নাই, কারণ তিনের গুণিতক ছয় কলাতেই একটি খাটি পর্ব্ব গড়িয়া উঠে। তেমনি আবার আট কলাযুক্ত পর্ব্বের শ্রেণীভাগের প্রয়োজন নাই। কারণ চারের দ্বিগুণ করিলেই আট হয়। দুই বা তিন কলার পর্ব্ব স্বতন্ত্র স্বাধীনভাবে থাকিতে পারে না। যদি কোথাও তিনের ক্ষুদ্রতর পর্ব্বাভাস জাগিয়া উঠে, তবে তাহাকে উপপর্ব্বই বলিব।

জটিল ও সরল ভেদে কলামাত্রিক ছন্দের ভাষাকে যদি পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, তবে তাহাকে সাধু তৎসম পদের সংযত বিশুদ্ধ ব্যবহার অতি সহজেই লক্ষ্যগোচর হইবে। সাধুভাষাই যে আমাদের ঠিক মুখের ভাষা নয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের কথ্য ভাষার মধ্যে বেশ একটা দ্রুতগতি আছে, বাস্তবতার

ভাব আছে। কথ্যভাষার এই গতিবেগের মূলে আছে ইহার হলন্তধ্বনির প্রাবল্য। সাধুভাষায় আমরা যথাসম্ভব স্বরধ্বনি বজায় রাখিয়া শব্দোচ্চারণ করি, সেই তুলনায় কথ্যরীতিতে ব্যঞ্জনধ্বনির আধিপত্য বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয়। বাংলা ভাষার এই প্রাকৃত উচ্চারণ রীতিকে আশ্রয় করিয়া একটি ছন্দের জন্ম হইয়াছে, তাহার নাম দলমাত্রিক অথবা স্বরবৃত্ত। এই ছন্দে সরল কলামাত্রিকের মত পর্ব্ব আছে, কিন্তু কলাগণনাই ইহাতে প্রধান বিচার্য্য নয়। এই ছন্দে প্রতি পর্ব্বে কয়টি সিলেবল বা দল থাকে তাহাই বিবেচ্য।* এই ছন্দে চারিটি দল বা সিলেবলের উপস্থিতি পর্ব্ব গঠনের যোগ্যতারই মাপকাঠি।

মা কেঁদে কয়। মঞ্জুলী মোর। এই তো কচি। মেয়ে

হসন্ত ধ্বনিগুলিকে বাদ দিলে (অর্থাৎ কয়-য, মঞ্জুলী—ন্, ওই-ই) প্রতি পর্ব্বেই চারিটি করিয়া স্বরযুক্ত সিলেবল্ পাওয়া যাইবে। এই চারিটি স্বরই ইহার পর্ব্ব নির্ণয় করে বলিয়া ইহার নাম স্বরবৃত্ত ছন্দ। আবার স্বরকে শুধু গণনা না করিয়া যদি সিলেবল্ বা দলকেই গণনা করা যায়—

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
মা কেঁ দে কয়। মন্ জু লী মোর। ওই তো ক চি। মে য়ে

—তাহা হইলেও রুদ্ধদল ও মুক্তদলের হিসাব মিলাইয়া মোট চারটি করিয়া দল বা সিলেবল পাওয়া যায় বলিয়া ইহাকে দলবৃত্ত ছন্দও বলা যায়। উচ্চারণ রীতিতে সাধুভাষার কলামাত্রিক ছন্দের সহিত ইহার পার্থক্য ইতিপূর্ব্বেও উল্লেখ করা হইয়াছে। দলগণনাতেও ইহাদের পার্থক্য লক্ষ্য করা প্রয়োজন। জটিল কলামাত্রিকে কেবল শব্দমধ্যবর্ত্তী রুদ্ধদলের মাত্র এককলা গণনীয়। সরল কলামাত্রিকে সর্ব্বত্রই রুদ্ধদল দুই কলা, আর স্বরবৃত্তে রুদ্ধদলের কলামাত্রিকতা নাই। ইহার যে মাত্রা বা পরিমাণ, সে কেবল হলন্তধ্বনি বিযুক্ত স্বরগণনা দ্বারাই

* বাংলা ছন্দে তিনটি রীতির মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, অক্ষরবৃত্তে পদমধ্যে যুক্তাক্ষর সংশ্লিষ্ট [অর্থাৎ ১ মাত্রা] ও পদান্তে বিশ্লিষ্ট [অর্থাৎ ২ মাত্রা] এবং এইজন্য ইহা 'যৌগিক'; স্বরবৃত্তে সর্ব্বত্র যুক্তাক্ষর সংশ্লিষ্ট এবং মাত্রাবৃত্তে সর্ব্বত্র যুক্তাক্ষর বিশ্লিষ্ট।

ধরিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ উপরের দলবৃত্ত ছন্দের পংক্তিকে যদি জটিল কলামাত্রিকে রূপান্তরিত করি—

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২
মঞ্জুলিকা শিশু অতি। মা কাঁদিয়া কয়।

এই পয়ার-পংক্তির প্রথম শব্দের প্রারম্ভিক রুদ্ধদল (মন) এককলা, আবার শব্দান্তিক রুদ্ধদল (কয়্) দুইকলা। ইহাতে আটের পদভাগ আছে, কিন্তু পর্ব্বভাগ সরল কলামাত্রিকের মত অত সুস্পষ্ট নয়।

কমপক্ষে একটি হসন্ত ধ্বনি এই ছন্দের পক্ষে অপরিহার্য্য। তিনটি হসন্তধ্বনি থাকিলে ছন্দপতন হইবে; আবার যদি একটিও না থাকে তবে পড়িবার সময় একটু টানিয়া পড়িতে হয়—

মনে করো। যেন বিদেশ। ঘুরে
মাকে নিয়ে। যাচ্ছি অনেক। দূরে

প্রথম পর্ব্ব দুইটিতে হসন্ত নাই। এক্ষেত্রে পড়িবার সময সুরের আমেজ একটু আসিয়া পড়ে।

দলবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত ছন্দের লক্ষণগুলি তাহা হইলে এই: (১) এই ছন্দে কথ্য ভাষার ব্যবহার করা হয় (২) প্রবল প্রস্বর-বর্ষণে এই ছন্দে কলধ্বনি অতিশয় প্রকট (৩) প্রতি পর্ব্বে চারটি দল বা স্বর থাকে (৪) তাহার মধ্যে একটি বা দুইটি রুদ্ধ (৫) দল কদাচিৎ তিন হইলে তিনটিই রুদ্ধ (৬) প্রতি পর্ব্বেব ওজন ছয় কলা।

পূর্ব্বে স্বরবৃত্ত ছন্দ লোকসাহিত্যে, বিশেষ করিয়া, গানেই ব্যবহৃত হইত। মেয়েদের ছড়ায় এই ছন্দ এখনও লক্ষ্য করা যায়। 'খনার বচনে' এই ছন্দই তো প্রধান বাহন। এইজন্য অনেকে ইহাকে **ছড়ার ছন্দ** নামে অভিহিত করিযাছেন। রবীন্দ্রনাথ উহাকে বলিতেন, প্রাকৃত ছন্দ। মধ্যযুগে বৈষ্ণব কবি লোচনদাসের কাব্যে, শাক্তকবি রামপ্রসাদের গানে এই ছড়ার ছন্দ দেখিতে পাই। সেকালে ইহার নাম ছিল 'ধামালী'। প্রস্বর-প্রধান হসন্তধ্বনিবহুল এই ছন্দকে মার্জ্জিত

করিয়া ইহাকে রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যের রাজসভায় স্থান করিয়া দিয়াছেন। কেবল যে তিনি চরণের পর্ব্ব-সমাবেশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহাই নয়, অসম সংখ্যক পর্ব্ব-সমাবেশ করিয়া রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দেও মুক্ত ছন্দোবদ্ধ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার 'পলাতকা' কাব্যখানি স্বরবৃত্ত মুক্তকের সার্থক সৃষ্টি।

বাংলা কবিতা এই তিনটি রীতির উপর নির্ভর করিয়া আছে। পদ ও পর্ব্ব সমাবেশের বৈচিত্র্য সাধন করিয়া ছন্দে বিচিত্র সঙ্গীত বাজাইয়া তোলা যায়। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য ছন্দ-স্ফুলিঙ্গের দীপ্তিতে ঝলমল করিতেছে; রস ও শিল্পকলার পরিণয়ে রবীন্দ্র-কাব্য হরগৌরী মিলনের মত অপরূপ সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ নিছক ছন্দ-প্রবণতায় সংস্কৃত ইংরেজি ছন্দ লইয়া কিছু কিছু নূতনত্ব করিতে চাহিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে যেগুলি বাংলা ভাষার ছন্দ-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে, সেগুলি চলিয়া গিয়াছে। ছন্দের বৈচিত্র্য মোহিতলালের কাব্যেও প্রচুর, বিশেষতঃ ইংরেজি পদবন্ধ (*Stanza Form*) সার্থকভাবে তিনিই বাংলায় অনুসরণ করিয়াছেন। অতি-আধুনিক কবি-সম্প্রদায়েও ছন্দ লইয়া নানাদিক দিয়া পরীক্ষা চলিতেছে। এই সম্বন্ধে শেষ কথা বলিবার সময় সম্ভবতঃ এখনও আসে নাই।

২১

আর্ট ও নীতি

গ্রীক দার্শনিক Plato মনে করিতেন, আর্ট নীতি-বিগর্হিত সৃষ্টি—উহা-দ্বারা মানুষের মনে কোন নৈতিক বোধ সঞ্চারিত হয় না, সুতরাং তিনি উহাকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইংরেজী সাহিত্যেও দেখিতে পাই, পিউরিটান বা রুচিবাগীশগণ কাব্যের নৈতিক বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য তৎপর ছিলেন এবং ইহাদের অনেকেই কবিতা হিসাবে কবিতার মর্য্যাদা দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে ভিক্টোরিয়ার যুগের ইংরাজী সাহিত্যেও নৈতিক প্রাধান্য বড় হইয়া উঠে। ভিক্টোরিয়ান যুগের সাহিত্যে কার্লাইল টেনিসন প্রভৃতি নীতিকে কাব্য বা সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ করিয়া তুলিয়াছিলেন। Ruskin বলিয়াছিলেন—

'Art properly so called, is no recreation, it cannot be earned at spare moments, nor pursued when we have nothing better to do. It is no handiwork for drawing-room tables, no relief to the ennui of boudoirs ; it must be understood and taken seriously, or not at all'. (*Modern Painters, III*)

Matthew Arnold আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলেন—

'A poetry of revolt against moral ideas is a poetry of revolt against life ; a poetry of indifference to moral ideas is a poetry of indifference towards life' এবং তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, Tolstoyএর Anna Karenine নামক উপন্যাসখানা 'piece of life'' হইলেও 'work of art' হয় নাই। ফলে 'what the novel loses in art, it gains in reality'. কিন্তু কথা হইল যে, যে-উপন্যাসখানি জীবনসত্যের দিক দিয়া

ভাল হইয়াছে, তাহা শিল্পের দিক দিয়া ভাল হয় নাই, এরূপ ব'লিবার কারণ কি? ইহার একমাত্র কারণ আর্নল্ড নীতিকে জীবনসত্য অপেক্ষা বেশী মূল্য এইখানে দিয়াছেন। আমাদের দেশেও একদিন শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ চরিত্রহীন প্রভৃতি উপন্যাসকে অ-নৈতিক আখ্যা লাভ করিতে হইয়াছিল। কারণ যে বা যাঁহারা ইহাদের বিচার করেন, তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মসংস্কার বা মানস-সংস্কারে তাঁহারা এমনই আচ্ছন্ন ছিলেন যে, তাঁহারা সহজভাবে জীবনকে দেখিতে পাইয়া যেন চমকিত হইয়া গেলেন। নীতির দোহাই দিযা তাঁহারা জীবনকে চাপা দিতে গেলেন। ক্ষমাহীন কাল জীবনকে রক্ষা করিযাছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকে জীবনানুগ সমৃদ্ধ গরিমা দান করিয়াছে।

নীতিবোধ সাহিত্যে থাকিবে না, এমন কথা আমরা কখনো বলিব না। পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ লেখকের লেখায নীতি-বোধকে সাহিত্য গ্রহণ করা হইয়াছে। Æsychybus-এর Œdipus, সেক্সপীয়রের Hamlet বা Macbeth-এ নীতির প্রশ্ন আসিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু ঐ সকল নাটকে নীতি বড়ো হইয়া উঠে নাই। লেখক যে সহানুভূতি-সূচক দৃষ্টির আলোতে তাঁহার চরিত্রগুলিকে বিকশিত করিয়াছেন, তাহাতে নীতি-কথা যেন পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে—নৈতিক পতন বা স্খলন হইতে উত্থিত মানবাত্মার বিজয়-মহিমাই ঐ সকল নাটকে বড় হইয়া উঠিয়াছে। Œdipus ও তাহার মাতার ব্যাপারটি নাটকের বিষয়-বস্তু হইলেও, Œdipus-এর নৈতিক পতনের কথা আমরা ভাবিনা, আমরা ভাবি, নিয়তি-নিষ্পেষিত অসহায সন্তানের জীবনের অগ্নি-পরীক্ষার কথা; Hamlet এর মাতার চরিত্র নিন্দনীয ছিল, ইহাই নাটকে বড় কথা নয়। উহা অপেক্ষা হেমলেটের চরিত্রের দ্বন্দ্ব-সঙ্কুলতার—এক দিকে তাহার বিদ্যাবুদ্ধি, রুচি ও সংস্কার, অপরদিকে অজ্ঞান অন্ধকার ও নীচতার সহিত তাহার দ্বন্দ্ব—চিত্রই নিয়তি-নির্য্যাতিত ঘটনা-তাড়িত মানবাত্মার সংগ্রাম রূপে Hamlet-এ অধিকতর পরিস্ফুট। পণ্ডিতপ্রবর রামগতি ন্যায়রত্ন একদা দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী-নাটকটিকে নীতিহীন বলিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাও তাঁহার দৃষ্টি-বিভ্রম প্রসূত উক্তি। এই সম্বন্ধে ডাঃ সুশীল দে'র যথার্থ

শিল্পদৃষ্টি-প্রসূত উক্তি-ই স্মরণীয় —"কুরুচি এখানে নাটকের বিষয় বটে, কিন্তু শুধু কুরুচির জন্য কুরুচি চিত্রিত হয় নাই মনের কোন অনুচিত বিকার ঘটানো ইহার উদ্দেশ্য নয়"। সুতরাং সাহিত্যে ও শিল্পে দেখিবার ও দেখাইবার ভঙ্গী এবং শিল্পীর অভিপ্রায়ই প্রধান। একখণ্ড পাথর দেখিয়া কেহ হয়তো উপনিষৎ মনে করিয়া উহাতেই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করেন, কেহ উহাকে মাটির ঢেলা বলিয়া উপেক্ষা করেন ; কেহ বা উহাকে শালগ্রাম শিলা মনে করিয়া পূজা করেন। দোষ সৃষ্টিকর্ত্তার নয়, যিনি বা যাঁহারা দেখেন, তাঁহাদের মনের। কথিত আছে, Wordsworth লুভারের যাদুঘরে নিবিড় আলিঙ্গনবদ্ধ কামরতির মূর্ত্তি দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন, '*Damned*'!—সেই মূর্ত্তির মধ্যে যে মানব-সত্য অত্যন্ত সহজসুন্দরভাবে ধরা দিয়াছে, তাহাকে কবি তখন গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার রুগ্ন মন যেন উহা দেখিয়া সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল। কবির এই মনোভাবকে সমালোচক Huxley প্রশংসা করিতে পারেন নাই। ইহাতে আমরা এই বলিতে চাহিনা যে, সাহিত্যে নৈতিকতার দাবী উপেক্ষা করা যাইতে পারে। জীবন সুনীতি বা কুনীতির উর্দ্ধে, এইখানে আলো অন্ধকার পাপপুণ্য সকলই আছে। লেখক বা শিল্পীর সৃষ্টি সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবে আমাদের মনে যে total impression জাগ্রত করিবে, উহার সৌষম্যই শিল্পের নীতি। সাহিত্য বা কাব্যের এখানে ওখানে দুই একটি বা ততোধিক পংক্তি যদি শিল্পপ্রয়োজনে সার্থক হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহাকে অনৈতিক বলা চলে না। নীতিকে যেখানে সজ্ঞানে লঙ্ঘন করা হয়, উহাতে নূতনত্বের চমক থাকিতে পারে, কিন্তু সাহিত্য বা শিল্পের মূলগত নীতি যদি সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির পরিপন্থী হয়, তবে উহা জীবন-বিদ্রোহী, কাজেই সাহিত্যে উহার স্থান নাই।

সুতরাং দেখিতে হইবে যে, সৃষ্টি যেন জীবনসত্যের বিদ্রোহী না হয়। বলা বাহুল্য, অতিরিক্ত নীতিপরায়ণতাও আবার জীবনবিদ্রোহী এবং সাহিত্যরসের পরিপন্থী, এবং অনেক সময় হাস্যকর। এই কারণেই অনেক বড় লেখকের লেখায়ও নীতি সংযোজিত হইয়া লেখাটির কাব্য-মাধুর্য্য ম্লান করিয়াছে দেখিতে পাই। রবীন্দ্রনাথেরই একটি অনবদ্য কবিতা—বিজয়িনী—স্মরণ করুন। কবি

এইখানে শব্দচয়নশিল্পে, গীতিমাধুর্য্যে, ভাষা-চিত্র ও ব্যঞ্জনায় অপূর্ব্ব কোমলকান্তি নারীমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু কবি হয় তো ভাবিয়াছেন, এমন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা নীতির দিক হইতে বোধ হয় ভাল হয় নাই—কবির ব্যক্তিগত বা সমাজগত শুচিতা-বোধ তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছে। তাই তিনি মদনকে এই রূপের কাছে 'পূজারী' রূপে অঙ্কিত করিয়া 'নীতি'র মান রক্ষা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে Scott James এর নিম্নোদ্ধৃত অংশ প্রণিধানযোগ্য :—If you attempt to falsify your vision in order to present an object didactic to the people, you have been treacherous to your art. কবির পক্ষে 'সুনীতিসঙ্ঘের সভ্য' হওয়া অপেক্ষা কাব্য-কানন-কোকিল হওয়া অধিকতর বাঞ্ছনীয়, এই কথা বলাই বাহুল্য। বহির্গত, সমাজগত বা গোষ্ঠীগত কোন নীতি কাব্যকে পরিচালিত বা প্রভাবিত করিলে কাব্য বা সাহিত্যের রস ক্ষুণ্ণ হয়। কবিমানসের যে-নীতি কাব্যের সৌষম্যকে নিয়মিত করে, উহাই কাব্যের প্রধান নীতি।

এই জন্যই Sampson বলেন—Art has nothing to do with ethics, economics, or theology, because they are sciences and belong to a different sphere of human activity. Art is thé product of man's native energy, and has a 'morality' of its own, which consists in artistic sincerity and not in ethical purpose.

এই artistic sincerity' অথবা শিল্পী-সুলভ আন্তরিকতা বলেই কবি বা সাহিত্যিক সৃষ্টি করেন। এই সম্বন্ধে Scott James এর কথাই চূড়ান্ত মনে করা যাইতে পারে—It is the business of the scientist to learn, to know, and prove. It is the business of the rhetorician to persuade ; of the moralist, to teach. It is the business of the artist to show. 'Life ought to be like that', says the moralist; 'Life looks like that', says the artist.

২২

মহৎ কাব্য

মানুষের মধ্যে যেমন স্তরভেদ আছে, কাব্যেও তেমনটি আছে। কাব্যে বা সাহিত্যে এক কবির লেখা ভাল, আর এক কবির লেখা নিকৃষ্ট; একজন কবিত্ব ও শিল্প-সৌন্দর্য্যে একক, আর একজন দীনতম অনুকারক মাত্র। একই বিষয়বস্তু বা অনুরূপ বিষয়বস্তু লইয়া দুইজন কবি দুইটি কবিতা লিখিতে পারেন, কাহারও কবিতা পদ্যের চৌহদ্দী পার হইতে সাহস পায় না, আবার কাহারও কবিতা স্বতঃ-উৎসারিত প্রাণ-স্পন্দনে মূর্ত্ত হইয়া উঠে। এইখানেই কাব্যবিচারে ভালমন্দ কবিতার প্রশ্ন উঠে। মন্দ কবিতা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা আর বিশদ ভাবে বুঝাইতে হইবেনা, কারণ উহা কবিতা নামধেয় হইতে পারে, কবিতার চলনসই রূপও উহাতে থাকিতে পারে, থাকে না শুধু কাব্যত্ব। ভাল কবিতা বলিতে আমরা সেই শ্রেণীর কবিতাকে বুঝি, যেখানে বিষয়বস্তু অবশ্যম্ভাবী শব্দবিন্যাসের সাহায্যে ছন্দায়িত হইয়া কবিপ্রাণের অনুভূতিকে ভাষায় ছন্দে চিত্রে কবির অনুভূতিকে পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চার করিতে পারিয়াছে এবং তাহার সত্যতাবোধ পাঠকের মনে জাগ্রত করিয়াছে। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'পাখীসব করে রব' পদ্য হইয়াছে, কিন্তু ভাল কবিতা হয় নাই। যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের 'জন্মভূমি' বা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'ওহে মৃত্যু তুমি মোরে কি দেখাও ভয়' আরও একটু উচ্চ স্তরের কবিতা। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ঝর্ণা' ছন্দের ঝঙ্কারে নৃত্যচপল হইয়াছে সত্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' সেই তুলনায় অনেক ভাল কবিতা। সত্যেন্দ্রনাথ শব্দের লালিত্য ও ছন্দসুষমার সাহায্যে কাব্য-প্রসাধনকলার চর্চ্চা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের আত্মোপলব্ধি ছন্দ-মাধুর্য্য শব্দমাহাত্ম্য এবং চিত্রাত্মকতায় কবিতাটিতে অপূর্ব্বরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। করুণানিধানের 'মর্ম্মর স্বপ্ন' প্রায় ভাল কবিতা হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের 'শাজাহান'

মহৎ কবিতা হইয়াছে। 'প্রায় ভাল কবিতা' বলিলাম এই জন্ত যে, কবিতার প্রারম্ভেই কবি—

'বাঁশীর রাগিণী মূরছি রয়েছে মর্ম্মর রূপ ধরি'

বলিয়া ভাষাচিত্রের যে মর্ম্মর-মহিমা দান করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী অতীত-বিহারী স্তবকগুলিতে সেই সৌন্দর্য্যটি দানা বাঁধিয়া ওঠে নাই এবং সর্ব্বশেষে কবি জীবনমৃত্যু সম্বন্ধে তাঁহার কল্পনাকে ভাবানুগ ভাষায় পূর্ণ-মণ্ডল-কান্তি দান করিয়া উঠিতে পারে নাই। ইহার তুলনায় রবীন্দ্রনাথের 'শাজাহান' অধিকতর উৎকৃষ্ট হইয়াছে, সন্দেহ নাই। তাজমহলকে-

একবিন্দু নয়নের জল—
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল

বলিয়া কবি অদেহী একটি ভাব সত্যকে যে স্থাপত্য-মহিমা দান করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব। কবিতাটির মধ্যে 'ভুলি নাই ভুলি নাই ভুলি নাই প্রিয়া' যেন শাজাহানের প্রেমিকহৃদয়ের বেদনামথিত হৃদয়ের সকরুণ দীর্ঘনিশ্বাস রূপে উহার কাব্য-লাবণ্যকে আচ্ছন্ন করিয়া বিক্ষুব্ধ প্রেমের বিজয় ঘোষণা করিয়াছে। এইখানে কবিতাটি শেষ হইলে প্রেমের কবিতার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করিতে পারিত। কিন্তু 'কে বলে রে ভোলো নাই' বলিয়া রবীন্দ্রনাথ যে দার্শনিক তত্ত্বের ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাতে কবিতাটির পূর্ণ-মণ্ডল রূপ-মহিমা খণ্ডিত হইয়াছে। Keatsএর *Ode to a Nightingale* কবিতায় সৌন্দর্য্যগত প্রাণ Keats-এর রূপপিপাসা তাঁহার ব্যক্তিজীবনের দাবদাহকে ছাপাইয়া অপূর্ব্ব সুন্দর রোমান্স সৃষ্টি করিয়াছে—বেদনার সরোবরে কামনা যেন কাব্যানন্দে বিভোর হইয়া সুন্দরের আরতি করিয়াছে। Bridges এর *Nightingales* কবিতায় অতৃপ্ত কামনার মরীচিকা-বিমুগ্ধ নাইটিংগেলের কণ্ঠ-সঙ্গীতের স্তুতি করা হইয়াছে—কিন্তু যে পাখী বলিতে পারিয়াছে—

Our song is the voice of desire, that haunts our dreams

তাহার বেদনা-বোধ কবি পাঠকহৃদয়ে সুস্পষ্টভাবে সঞ্চারিত করিতে পারেন নাই। Bridges উৎকৃষ্ট, Keats মহৎ। রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ' কালবৈশাখী ঝড় অবলম্বনে কবিতা, Shelleyর *Ode to the West Wind* ও ঝড়ের কবিতা। উভয় কবিই একান্তভাবে ভাবপ্রবণ, আদর্শবাদী ও কল্পনাসর্ব্বস্ব। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ঝড়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে যে কয়েকটি স্তর নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা যথার্থই কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লব্ধ। বর্ণনা কুশলতায় রবীন্দ্রনাথ বাংলাকাব্যে অদ্বিতীয়। কিন্তু শেলীর কবিতায় ঝড়ের সূচনা এবং পৃথিবীতে আকাশে ও সাগরবক্ষে উহার প্রচণ্ড ব্যাপ্তি বর্ণনায় যে নিখিল বিশ্বময় শক্তিমত্ততার তাণ্ডব রচনা করিয়াছে, তাহার প্রত্যক্ষ বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের কবিতার বর্ণনা অপেক্ষা শক্তিশালী। রবীন্দ্র-নাথের কবিতায় বর্ষশেষ দিনে নববর্ষ আবাহনে যে মুগ্ধ-বিস্মিত-ভীত-শঙ্কিত স্তুতি উর্দ্ধায়িত হইয়াছে, তাহাতে রবীন্দ্র-সত্তা নববর্ষদিনের বিরাটের সহিত অভিন্নতা সৃষ্টি করিতে পারে নাই, শেলীর কবিতায় ঝড়ের প্রচণ্ড শক্তির সহিত কবির আত্মবিলুপ্তির কামনা চরমে উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্য্যন্ত শান্তরসে কবিতাটি শেষ করিয়াছেন—সেইখানে ঝড়ের গতি স্তিমিত, স্নিগ্ধ। প্রকৃতির বিক্ষোভ কবিতা-শেষে প্রশান্ত। শেলীর কবিতা যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানে বিদ্রোহী কবির ভাবতন্ময়তা আরও উদাত্তকণ্ঠে নির্ঘোষিত হইয়াছে—

If winter comes can spring be far behind ?

রবীন্দ্রনাথ যেন সহসা বিদ্রোহী-কল্পনায় উদ্দীপ্ত হইয়া স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছেন। ফলে, শেলীর কবিতায় যে সুষম শিল্পাবয়ব রচনা কৌশল (architectonic faculty) দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথে তাহা নাই। দুইটি কবিতাই দুই বিভিন্ন কবির হাতে শ্রেষ্ঠ রূপ লাভ করিয়াছে, কিন্তু তুলনা করিলে মনে হয়, শেলীর কাব্যকীর্ত্তি রবীন্দ্রনাথের কাব্যকীর্ত্তি অপেক্ষা অধিকতর সুবিন্যস্ত ও মণ্ডলায়িত সৌন্দর্য্যের কাব্যরূপ।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, একই বিষয়বস্তু সম্বন্ধে দুই বিভিন্ন কবির কবিতা তুল্য উৎকর্ষের দাবী করিতে পারে না। কোনটি ভাল হইতে পারে কোনটি আবার মহৎ হইতে পারে। এখন প্রশ্ন হইল, শ্রেষ্ঠ বা মহৎ

কবিতা বলিতে আমরা কি বুঝি? Walter Pater সৎ-শিল্প (Good art) এবং মহৎ শিল্প (G:eat art) আলোচনা প্রসঙ্গে সাহিত্যেও এই জাতীয় শ্রেণীবিভাগ চলিতে পারে মনে করিয়া বলিয়াছেন যে, এই বিভেদ মূলতঃ শিল্পের রূপ (form) অপেক্ষা বিষয়বস্তু বা সামগ্রীর (matter) উপর নির্ভর করে। তিনি বলেন—

It is on the quality of the matter it informs or controls its compass, its variety, its alliance to great ends or the depth of the note of revolt, or the largeness of hope in it, that the greatness of literary art depends.

অর্থাৎ যে সাহিত্য বিষয়বস্তুর ভাবগাম্ভীর্য্যে, ব্যাপকতায় ও বৈচিত্র্যে, শিল্পায়ন-দক্ষতায় জীবনের মহৎ চরিতার্থ বোধ-সঞ্চারে, বিদ্রোহের সুগভীর ব্যঞ্জনায়, অথবা মানবজীবনের প্রতি আশায় ও আশ্বাসে পাঠকের মন ভরিয়া দেয়, উহাই মহৎ সাহিত্য। বলা বাহুল্য, শ্রেষ্ঠ বা মহৎ সাহিত্যের বাণীভঙ্গি লেখকের সুগভীর ব্যক্তিত্বের দ্যোতক। এই বাণীভঙ্গি একদিকে যেমন কবি-কল্পনাকে সুবিহিত রূপ-সৌন্দর্য্য দান করিতে সাহায্য করে, তেমনি আবার কবিকল্পনার এমন একটি পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে যে উহা রেখায় শব্দে রূপে রঙে, এমন কি কবিমানসের সৃষ্টি-সুষমায় আমাদিগকে বিমুগ্ধ করে। এই দিক হইতে বিচার করিতে গেলে Danteর *The Divine Comedy*, মিল্টনের *Paradise Lost*, Shakespeare এর *King Lear* অথবা *The Holy Bible* মহৎ সৃষ্টি। পূর্ব্বোক্ত সমালোচক আরও বলেন যে, যে-সাহিত্য মানবের সুখ সংবর্দ্ধনে সাহায্য করে, নির্য্যাতীত মানবতার পরিত্রাণের সন্ধান দেয়, অথবা প্রাচীন বা আধুনিক কোন তত্ত্ব বা তথ্য যদি এমন ভাবে সাহিত্যে পরিবেশন করে, যাহার ফলে আমাদের মধ্যে মানব প্রীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বা আমাদের এই অশ্রু-সজল দুঃখকষ্টময় পৃথিবীর জীবনকে সুন্দর ও মধুর করিয়া তোলে বা আমাদের মধ্যে কখনো বা ভগবদ্‌প্রীতি সঞ্চার করে, তবে তাহাকে মহৎ সাহিত্য বলা হয়। সর্ব্বোপরি, মহৎ সাহিত্যের ভাবকল্পনা এমন একটি সুষম আনন্দনিকেতন সৃষ্টি করে, যেখানে মানবাত্মার স্পন্দন শুনিতে পাওয়া যায়।

Walter Pater বিষয়বস্তুর উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এই বিষয়বস্তুর বিস্তৃতি বা ব্যাপকতা বা বৈচিত্র্য যেমনই থাক না কেন, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক উহার সাহায্যে মানুষের জীবনের পরিপূর্ণ সত্যটি উদ্‌ঘাটিত করিবেন এবং এইজন্ত তাঁহাকে জীবনের কিছু পরিত্যাগ করিলে চলিবে না—জীবনের ভালমন্দ সৎ অসৎ সমস্ত কিছু তাহাকে একই সর্ব্বাশ্রয়ী কল্পনার পক্ষপুটে আশ্রয় দান করিতে হইবে। ইহার ফলে তাঁহার সাহিত্যে Pater যাহাকে form বলিয়াছেন, তাহার একটি Coherent unity of final impression or consistent shapeliness পাওয়া যাইবে। বিচিত্র জীবন প্রবাহ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের নিকট অখণ্ড বাণী-বিগ্রহ লাভ করে। যে সাহিত্যিক এই জাতীয় কাব্যকীর্ত্তির স্রষ্টা, তাঁহার কল্পনাও বিরাট, এবং সেইজন্ত কল্পনাকে লক্ষ্য করিয়াই হয়তো জনৈক সমালোচক উহাকে Esemplastic Imagination বা সমন্বয়ী কল্পনা নাম দিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের ধর্ম্ম এই, তাহা পাঠকের সুপ্ত কল্পনাকে জাগ্রত করিয়া দেয়, তাহার পরিপূর্ণ আত্মাকে "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত" মন্ত্রে দীক্ষিত করে। তাই উহা কেবল ইন্দ্রিয়কে সজাগ ও সতর্ক করে না, কল্পনাকে বিমোহিত করে না, অনুভূতিকে দ্রবীভূত করে না বা ভাবনা-চিন্তাকে উদ্দীপ্ত করে না— আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন মানবসত্তাকে উদ্বুদ্ধ করে। শ্রেষ্ঠ কাব্যে বা সাহিত্যে এমন একটি আবেদন থাকে, যাহার ফলে পাঠকের জগৎ ও জীবনের দিব্যদর্শন ঘটে, সে দেখে আর দেখে, তবু বলে—

নয়ন না তিরপিত ভেল—

সে অনুভব করে, আর বলে—

তার অন্ত নাই গো অন্ত নাই—

সে ভাবে, আর ভাবে, আর বলে—

Thou dost tease us out of thought.

এই জন্তই Ruskin বলিয়াছেন—

All great Art is the work of the whole living creature, body

and soul, and chiefly of the soul. But it is not only the work of the whole creature, it likewise addresses the whole creature.

পৃথিবীর অধিকাংশ মহাকাব্যগুলিই মহৎ আখ্যা লাভ করিবার উপযোগী। রামায়ণের ঐতিহাসিকতার প্রশ্ন বাদ দিলেও, এই কাব্যে ঘরের কথা যে ভাবে সর্ব্বকালের আদর্শের রূপ লাভ করিয়াছে, তাহাতেই রামায়ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইবে। মহাভারতও বিষয়বস্তুর ব্যাপকতায়, জীবন-জিজ্ঞাসায়, আদর্শ প্রতিষ্ঠায়, জীবনের বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে অপূর্ব্ব মহান্ সৃষ্টি। Danteর *Divine Comedy*র শ্রেষ্ঠত্ব উহার সুদূর-বিলাসী কল্পনার অপ্রমেয় গভীরতায়। মিল্টনের স্বর্গ-মর্ত্ত্য-প্রসারী-কল্পনা, অমিত্রচ্ছন্দের বারিধি-কল্লোলের উদাত্ত মহিমা, ও কাব্যের উদ্দেশ্য—

To justify the ways of God to man—

*Paradise Lost*কে মহৎ সৃষ্টিতে উন্নীত করিয়াছে। Hardy তাঁহার নাট্য-মহাকাব্য *The Dynasts*এ ইতিহাসের সুবিস্তীর্ণ পটভূমিকায় সমস্ত মানবভাগ্যকে যে ভাবে নিয়তি-নির্য্যাতিত রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বেদনাদায়ক হইলেও মহৎ —কারণ স্বেচ্ছাচারী নিয়তির সহিত দুর্ব্বল মানব-শিশুর দ্বন্দ্বই মানুষকে মহৎ মর্য্যাদায় অভিষিক্ত করিয়া তুলিয়াছে। Shakespeare এর Macbeth, Othello, Hamlet, King Lear, Antony & Cleopatra পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্যসাহিত্যের অন্যতম। প্রত্যেকটি ট্রাজেডিতে জীবন যুদ্ধে পরাভূত মানবাত্মা গ্রহবৈগুণ্য বা অবস্থাবিপর্য্যয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া শক্তিমত্তার এমন পরিচয় দিয়াছে, যেখানে তাহাদের দেখিয়া বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় অভিভূত হইতে হয়। Shakespeareএর জগতে পাপপুণ্য ভাল-মন্দ কামপ্রেম সকল কিছু অবারিত দাক্ষিণ্যে বিধৃত অখণ্ড নাট্য-মূর্ত্তিতে পরিবেশিত। শ্রীমধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্য' রামায়ণের কাহিনী হইতে কোন কোন স্থলে আদর্শচ্যুত হইলেও, কবি উহাতে রাবণের চরিত্রের মাধ্যমে নিয়তি-পীড়িত ক্রুশবিদ্ধ মানবাত্মার অপরাজেয় দুর্ব্বলতার মহিমা ঘোষণা করিয়া বাংলা সাহিত্যে মহৎ কাব্য রচনা করিয়াছেন।

এই কাব্যে Laocoon, সেক্সপীয়র, মিল্টন, ভার্জিল, দান্তের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও ইহা সম্পূর্ণ একক সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতা হইতে অসংখ্য মহান কবিতার নাম করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে 'যেতে নাহি দিব', শিবাজী-উৎসব, বসুন্ধরা, ভাষা ও ছন্দ, পুরস্কার, বলাকা অবিসংবাদীরূপে শ্রেষ্ঠ কবিতা। আধুনিক কালের যতীন সেনগুপ্তের 'কচি ডাব' কবিতাটি বিষয়বস্তুর মৌলিকতায় এবং তদুপযোগী ভাবকল্পনার পরিবেশনে মহৎ সৃষ্টি। দুঃখের মহাদেব মূর্ত্তি অঙ্কন করিয়া কবি দুঃখের মর্য্যাদা বাড়াইয়া দিয়াছেন। মোহিতলাল মজুমদারের কয়েকটি মহৎ কবিতা বাংলা কাব্য সাহিত্যে চিরদিনের হইয়া থাকিবে। তন্মধ্যে 'নারীস্তোত্র', 'পান্থ', 'পুরূরবা', 'নাদির শাহের জাগরণ' এই কয়েকটির নাম করা যাইতে পারে। কবিতাগুলির বিশেষত্ব এই যে, কবির কাব্যসাধনায় রোমাণ্টিক ও ক্ল্যাসিকাল দৃষ্টিভঙ্গী 'যুক্তবেণী' হইয়া উঠিয়াছে. ফলে, গীতিকবিতায় নাটকীয় ও মহাকাব্যোচিত গুণের মিলন হইয়াছে।

———

গ্রন্থ-পঞ্জী

Abercrombie : Principles of Literary Criticism.
The Theory of Poetry.
Romanticism
Arnold : Essays in Criticism.
Alexander : Beauty and other forms of Value.
Aristotle : Poetics (Butcher's Edition).
" (House's Edition)
Atkins : English Criticism.
Barrett : A Study of the Modern Drama
Bates : The Modern Short story.
Bell : Art.
Bowra : The Heritage of Symbolism
From Virgil to Milton
Bradley : Shakespearian Tragedy.
Oxford Lectures in Poetry.
Carritt : An Introduction to Aesthetics.
Theory of Beauty.
Clark : European Theories of the Drama.
Caudwell : Illusion and Reality.
Coleridge : Biographia Literaria.
Cowl : Theory of Poetry in Europe
Croce : Aesthetics.
Dobree : Modern Prose Style.
De : History of Sanskrit Poetics.
Dryden : Essays.
Eliot : Selected Essays.
Feilleman : In presence of Art.
Forster : Aspects of the Novel.
Fox : The Novel and the People.
Galsworthy : The Inn of Tranqullity.
Hudson : Introduction to the study of Literature.
Hegel : Theory of Tragedy.
Halliday : Shakespeare and his Critics.
Hughes : Imagism and Imagists.
Hulme : Speculations.
Jebb : A Primer of Greek literature.
Keith : Classical Sanskrit Literature.
Ker : Epic and Romance.
Lucas : Tragedy, Style.
M. Krieger : The New Apologists for Poetry.
Maugham : The Summing Up.
Meredith : Essay on Comedy.
Murry : The problem of style.
Nicoll : The Theory of Drama.
Nietzsche : The Birth of Tragedy.
O. U. P. : Critical Essays (sixteenth to twentieth century).
Pater : Appreciations.

Plato : Dialogues.
Read : The Meaning of Art.
Richards : Principles of Literary Criticism.
Schopenhauer : Essays.
Saintsbury : Loci Critici.
Scott James : The Making of Literature.
Personality in Literature.
Seal : New Essays in Criticism.
Solve : Shelley : his theory of poetry.
Symons : The Symbolist Movement in literature.
Sen Gupta : Shakespearean Comedy,
Thouless : Modern Poetic Drama.
Tolstoy : What is Art ?
Upham : Typical forms in English Literature.
Underhill : The Elements of Mysticism.
Vaughan : English Literary Criticism.
Wilde : Intentions, The Critic as 'Artist.
Wilkins : Roman Literature.
Woolf : Common Reader (2 *Vols*)
Worsfold : Principles of Criticism.
Yeats : Ideas of Good and Evil

বিশ্বনাথ : সাহিত্য-দর্পণ (হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ সম্পাদিত)

বঙ্কিমচন্দ্র : বিবিধ প্রবন্ধ

অতুলচন্দ্র গুপ্ত : কাব্য-জিজ্ঞাসা

মোহিতলাল মজুমদার : আধুনিক বাংলা সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ : সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, ছন্দ

লালমোহন বিদ্যানিধি : কাব্যনির্ণয়

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

নন্দলাল বসু : শিল্প-কথা

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য : সাহিত্য মীমাংসা

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : কাব্য-বিচার

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় : বাংলা ছন্দের মূলসূত্র

কালিদাস রায় : প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য, সাহিত্য-প্রসঙ্গ

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা

প্রবোধচন্দ্র সেন : ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ

শশাঙ্ক সেন : বাণীমন্দির, বঙ্গবাণী

সুধীরকুমার দাশগুপ্ত : কাব্যালোক

সাহিত্য-সন্দর্শন সম্বন্ধে অভিমত—

১। **The Modern Review** বলেন—

It is a nice handbook on principles of Literary Criticism

২। **মোহিতলাল মজুমদার বলেন—**

'আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, এই গ্রন্থ যেমন এক হিসাবে বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ নূতন, তেমনই বাঙালী পাঠক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার ছাত্রগণের ইহাতে যথেষ্ট উপকার হইবে।'

৩। **ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—**

'বাংলা সাহিত্যে এইরূপ একটি গ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল, তুমি সেই অভাব পূরণ করিয়াছ দেখিয়া তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি।'

৪। **ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন—**

'সাহিত্য সম্বন্ধে যে আপনার নিজস্ব চিন্তা এবং তত্ত্ব-দৃষ্টি রহিয়াছে, তাহার প্রমাণ আপনার লেখায় সর্ব্বত্রই ছাপ রহিয়াছে।'

৫। **ডাঃ সুকুমার সেন বলেন—**

It is really a very good book, very useful for the students. It should be prescribed for the M.A. Examination......

6. This fully revised and enlarged edition of Prof. Das's Sahityasandarsan will, we are sure, be welcomed by all serious students of literature as well as the public interested in literary studies. The book is a pioneer work in Bengali but it is by no means tentative. The author has drawn upon different critical theories, Eastern and Western, and formulated principles of criticism by which all forms of literature are to be assessed. The manner in which the topics bearing on literary criticism have been discussed shows a deep insight and a subtle analytical power. Illustrations are copious, classification accurate, judgment sober and style commendably lucid.

It would not be much of an exaggeration to say that this work has earned Prof. Das a place in Bengali critical literature comparable to that of Hudson or Worsfold......

The Amrita Bazar Patrika, (6.10.57)

৭। এই গ্রন্থে অধ্যাপক দাশ সাহিত্য-বিচারের মূলতত্ত্বগুলি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যাচার্যদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে উপস্থাপিত করিলেও অধিকাংশ স্থলেই স্বকীয় যুক্তিসিদ্ধ মতানুসরণে প্রতিপাদ্য বিষয়ের গৌরব বর্ধিত করিয়াছেন। অধ্যাপক দাশ শুধু সাহিত্যের কৃতী অধ্যাপকই নহেন; সাহিত্য-বিচার সম্বন্ধে তিনি যে বইখানা বাংলায় ছাত্রসমাজ ও বিদ্বজ্জন সমীপে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নাম বাংলা সমালোচনা-শাস্ত্রে স্থায়ী হইয়া থাকিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বইখানা মুখ্যতঃ বাংলা অনার্স ও এম-এ, এবং ইংরেজির এম-এ ক্লাশের উপযোগী করিয়া লিখিত হইলেও, ইহা দ্বারা সাহিত্যরসিকগণ বিশেষ উপকৃত হইবেন। এই গ্রন্থখানা বাংলা সমালোচনাশাস্ত্রে একক এবং ইহা সাহিত্য বুঝিবার ও উহা হইতে আনন্দ পাইবার জন্য ছাত্র-ছাত্রী ও রসিকজনের পক্ষে অপরিহার্য গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্যতা রাখে।

—যুগান্তর (১৫।১২।৫৭)।

৮। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এখন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ও ব্যক্তি-বিলাসের যুগ চলিতেছে। সমালোচনা সাহিত্যের, বিশেষ করিয়া বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের রচনার তাৎপর্য ও মূল্য নিরূপণ করিবার সহায়ক গ্রন্থের বিশেষ অভাব। সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ ও রীতি, তার গঠনশৈলী ও সাহিত্য স্রষ্টার মানস দৃষ্টিভঙ্গি বিচারের সাহায্যার্থে এই গ্রন্থখানা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। গ্রন্থকার সাহিত্য-বিচারে সর্বকালীন সাহিত্যিক রুচিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। যেখানে তাঁহাকে ব্যক্তিগত মতামত দিতে হইয়াছে, সেইখানে তিনি বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়াছেন। লেখকের সাহিত্য-বিচার কোন সাহিত্যগোষ্ঠী বা ব্যক্তিগত অহমিকা প্রভাবিত নয়। সাহিত্যকে তিনি ভাবালুতা দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া দেখেন নাই। বিষয়বস্তু পরিবেশনে লেখক যে ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাও সমালোচনা সাহিত্যের বিশেষ গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

আমরা আশা করি, সুরসিক বিদ্বজ্জন সমাজ বইখানিকে সাদরে গ্রহণ করিবেন। —আনন্দবাজার (৮।১২।৫৭)।

৯। গ্রন্থখানিকে বাংলা ভাষার "সাহিত্য দর্পণ" আখ্যা দিতে সহজেই পারা যায়। যাহারা সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ 'সাহিত্য দর্পণ' অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বাংলা ভাষায় অনুরূপ একটি গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেন।

—হাওড়া বার্তা (২৮।২।৫৮)।